সংশয়
SHONGSHOY.COM
প্রকাশনা
Dhrubok
যে ঈশ্বর ঘৃণা করে
ওয়াফা সুলতান
অনুবাদ
শ্রীজীব বিশ্বাস

যে ঈশ্বর ঘৃণা করে

ওয়াফা সুলতান

অনুবাদ

শ্রীজীব বিশ্বাস

একটি সংশয় ইবুক
www.shongshoy.com

যে ঈশ্বর ঘৃণা করে

ওয়াফা সুলতান

অনুবাদ

শ্রীজীব বিশ্বাস

প্রথম ইবুক প্রকাশ: জানুয়ারী, ২০২০

সংশয় ইবুক

প্রকাশক

সংশয়
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: ধ্রুবক

ইবুক তৈরি
ধ্রুবক

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

A God Who Hates, by Wafa Sultan

Translated by Srijib Biswas

Shongshoy eBook
First eBook Published in **January, 2020**
Created by: Dhrubok

প্রশংসা

"**ওয়াফা সুলতান** সিরিয়ার মুসলমান সমাজের একটি জ্বালাধরানো, অবিস্মরণীয় প্রতিকৃতি চিত্রিত করেছেন, বিশেষত সেখানকার নারীদের অপমানজনক দুর্দশা, এবং কাব্যিক প্রশংসা করেছেন তাঁর স্বেচ্ছা-নির্বাসিত দেশ আমেরিকার, যাকে তিনি বলেছেন 'স্বপ্নের দেশ'। কিন্তু তিনি উদ্বিগ্ন কারণ মধ্য প্রাচ্যের রীতিনীতি পাশ্চাত্যকে গ্রাস করছে। তিনি আবেগঘনভাবে লিখেছেন একটা ভয়ঙ্কর বিপদের বিরুদ্ধে আমেরিকাবাসীদের জাগাতে, যে বিপদকে তারা প্রায় চেনেই না বা অতি সামান্য ভয় করে"। --------**ড্যানিয়েল পাইপস, ডিরেক্টর, মিডল ইস্ট ফোরাম**

"আরও হাজার মানুষের মত, আমি **ওয়াফা সুলতানকে** প্রথম দেখি একটি আশ্চর্যজনক ইউ টিউব ভিডিওতে। আল-জাজীরা টিভিতে একজন মহিলা বাগ্মীতা এবং সাহসিকতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং যুক্তির স্বপক্ষে এবং চরমপন্থী ইসলামের বর্বরতা ও অতীন্দ্রিয়বাদের বিরুদ্ধে বলছেন। তাঁর বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধকর। তিনি সুবিন্যস্ত, আত্মিবিশ্বাসী, এবং স্পষ্টবক্তা। তিনি দর্শকদের, সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী, এবং করুণভাবে পরাজিত ইমামকে–যিনি তাঁর বিরোধিতা করছিলেন, একেবারে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিলেন। এবার ওয়াফা সুলতান তাঁর জীবনের কথা লিখেছেন এই শক্তিশালী বইটিতে। তিনি মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম সমাজের কুৎসিৎ রূপকে উন্মোচন করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে পশ্চিমের মূল্যবোধের পক্ষে বলেছেন যা তিনি গ্রহণ করেছেন ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে। যদি আপনি এই সাহসী নারীকে বুঝতে চান, যিনি মৃত্যুভয় সত্ত্বেও তাঁর বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধ করে চলেছেন এবং জানতে চান ইসলাম ও পশ্চিমের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তাহলে এই বই অবশ্যপাঠ্য"। -------**ইয়ারোন ব্রুক, পি এইচ. ডি., প্রেসিডেন্ট এবং কার্যনির্বাহী পরিচালক, আঈন রাণ্ড ইনস্টিটিউট**
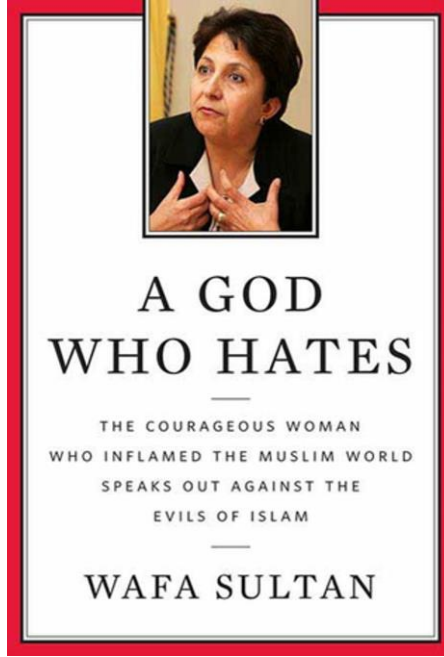
ওয়াফা সুলতান

যে সাহসী নারী মুসলিম জগতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন, তার চোখে ইসলামের কুৎসিৎ দিক

লেখকের কথা

এটি একটি সত্য কাহিনী, যদিও কিছু নাম পরিবর্তিত।

উৎসর্গ

আমার প্রিয় স্বামী এবং সন্তানদের উদ্দেশে, যাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসা
আমাকে আশ্রয় দিয়েছে যখন কোন জায়গাই
আমার পক্ষে নিরাপদ ছিল না।

সবশেষে, আমার প্রিয় ভাগ্নী ‘মায়াদা’র স্মৃতিতে, যে তার জীবনকে সংক্ষিপ্ত করেছিল আত্মহত্যা করে, ইসলামি শরীয়া আইন অনুযায়ী যার উপরে নারকীয় বিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটা থেকে বাঁচতে। তার বিষাদময় কাহিনী শাশ্বত অনুপ্রেরণা হোক তাদের সবার, যারা মুক্ত সমাজে বাঁচার সুযোগ পেয়েছে। তার কাহিনী সাহস দিক তাদের যারা অত্যাচারের শিকার হয়েছে—বিশেষত মেয়েরা—প্রকৃত তথ্য জানতে এবং ভয় ও শঙ্কাকে অতিক্রম করার চেষ্ট করতে। যাদের সাহস ন্যায়ের আদর্শ এবং বাকস্বাধীনতাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে—মায়াদার কাহিনী, এবং এমনি আরো হাজার কাহিনী, যাদের কথা কখনো বলা হয়নি, মুসলিম বিশ্বে নারীর প্রতি যে অন্যায় এবং অনৈতিক আচরণ করা হয় তার বিরুদ্ধে সরব হতে তাদেরকে সাহসী করে তুলুক।

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একটি আরবি প্রবাদ আছে: "একক ফুল সমস্ত জমিকে লাবণ্যময় করতে পারে না"। তেমনি আমার বহু নিবেদিতপ্রাণ এবং সমর্থক বন্ধু ব্যতীত আমি এই বইকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হতাম না। আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে আমি তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। আমার বিশ্বাস, তারা জানে তারা কে; তাই তাদের নাম উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়। আমি চাই না তাদের জীবন বিপদগ্রস্ত হোক যেমনটা আমার জীবনে ঘটেছে।

আল জাজীরা সংবাদ মাধ্যম আমাকে তিনটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে ডেকেছিলেন তাদের বিখ্যাত অনুষ্ঠানমালা, "আল ইতজাহ আল মৌয়াকেস" (বিপরীত দিক)-এর জন্য। তৃতীয় অনুষ্ঠানের পর মাধ্যমটি আরব দুনিয়ার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে আমাকে "ইসলামকে অবমাননা" করার সুযোগ দেওয়ার কারণে। এবং তারই ফলশ্রুতিতে অনুষ্ঠানটির পুনঃসম্প্রচার বাতিল করে। তৎসত্ত্বেও, আল জাজীরাতে আমার তিনটি সাক্ষাৎকার আমাকে পরিচিতি দেয় এবং আমার বক্তব্য লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছায়। সে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে আল জাজীরার প্রতি কৃতজ্ঞ।

মধ্য প্রাচ্য সংবাদমাধ্যম গবেষণা সংস্থাও (Middle East Media Research Institute – MEMRI) আমার বক্তব্য প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেজন্য আমি তাদের প্রতি প্রশংসা জানাই। MEMRI-র সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ভাষাগত বাধা দূর করতে যাতে ঐ অঞ্চলের তথ্য নিখুঁত রূপে প্রকাশ পায়। এবং

সেটা করতে গিয়ে তাঁরা পক্ষপাতহীন সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়েছেন যাতে বাকী বিশ্ব মধ্য প্রাচ্যের বিপজ্জনক পরিস্থিতির সঠিক রূপ অনুধাবন করতে পারে।

সবশেষে, আরব জগতের সকল পাঠককে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যাদের প্রতিক্রিয়া, স্বপক্ষে বা বিপক্ষে, আমাকে উৎসাহিত করেছে আরও প্রয়াসী হতে এবং গভীরবাধা অতিক্রম করতে, যে বাধার সম্মুখীন হতে হয় ঘৃণা এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে।

অনুবাদকের অনুভূতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ এর ভয়ঙ্কর ঘটনা কিংবা ভারতে ২৬/১১ এর নির্বিচার হত্যালীলা অথবা শ্রীলঙ্কা, দেশ হিসাবে যার সাথে কোনো দেশের ঘোষিত শত্রুতা নেই, সেখানেও গণহত্যার কারন কী, মনের গহীনে লালন করা কোন অন্ধবিশ্বাস, ঘৃণা ও সীমাহীন বিদ্বেষ এর জন্য দায়ী, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই প্রচেষ্টা।

ওয়াফা সুলতান তাঁর নিরীক্ষাধর্মী চোখ দিয়ে তাঁর মাতৃভূমি সিরিয়াকে যেমন দেখেছেন তারই অবিকল প্রতিফলন এই বই। স্বাভাবিক ভাবেই একথা বলা যায় সকল ইসলামি দেশের চিত্রও সিরিয়ারই অনুরূপ। অর্থাৎ এই হানাহানির প্রকৃত উৎস ইসলাম অনুসারী মানুষ নয়, ইসলাম নিজেই সেই উৎস। ওয়াফা সুলতান বিভিন্ন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে সেই ঘটনার কারণ হিসেবে শনাক্ত করেছেন ইসলামকে।

একজনের ধর্মবিশ্বাস কখনো অন্যের অধিকার হরণ করতে পারে না। ইসলাম অনুসারী মানুষ যতদিন না এই সত্য উপলব্ধি করবেন বা জীবনে প্রয়োগ করবেন ততদিন এ হানাহানি চলতেই থাকবে। এর শিকার শুধু অন্যেরা নয়, মুসলমানরা নিজেরাই তার প্রকৃত শিকার। একবিংশ শতকে পৌঁছে একথা ভাবার সময় এসেছে কি লাভ এই নিরীহ মানুষ হত্যায়? যে মানুষটির ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতির সাথে কোন যোগ নেই, সেই মানুষটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছিন্নভিন্ন হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। এমনকি যে শিশু প্রতি মূহুর্তে অবাক বিস্ময়ে এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধকে চিনতে চায় সে তার চেনাকে অসমাপ্ত রেখে কোন এক অজ্ঞাত ঘাতকের আঘাতে চলে যায় চিরঘুমের দেশে। এই কি মানবিকতা?

যে মানুষ নিজের বুকে বোমা বেঁধে কিছু অচেনা, অজানা মানুষকে হত্যা করতে যায়; সেই মূহুর্তে সে কি মানুষ থাকে? সে তো মস্তিস্কে প্রোগ্রামিং করা একটা রোবটমাত্র। কোন অনুভূতি নেই, বিচারবোধ নেই, এই যন্ত্রদানবরা পৃথিবীর কোন উপকার করবে?

আর একটা বিশেষ বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বের দাবী রাখে। পৃথিবী কি শুধু পুরুষের? নারী কি মানুষ নয়? সে কি ভোগের মাংসপিণ্ড মাত্র? তারও মস্তিস্ক, চোখ, কান, বুদ্ধি, সর্বোপরি হৃদয় আছে। তার অস্তিত্ব শুধু হাঁটুসন্ধি থেকে নাভিতে সীমাবদ্ধ নয়। এই সত্য পুরুষ প্রজাতি যতদিন অস্বীকার করবে ততদিন পুরুষ অর্ধমানুষ হয়েই থাকবে। পৃথিবীর শতকোটি মানুষের একজনও কি একজন নারীর অস্তিত্ব ছাড়া পৃথিবীর আলো দেখেছে? সে কি স্বয়ম্ভু? তাহলে কেন কোন ধর্মগ্রন্থে লেখা থাকবে "নারীর জন্ম অমঙ্গল, কুলক্ষণ। নারীর কোন আত্মা নেই!" সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বর তাহলে কেন এই অমঙ্গলের সৃষ্টি করলেন? তাহলে সেই অমঙ্গল সৃষ্টিকারী ঈশ্বর কি ধিক্কার যোগ্য নন? ঘৃণা নয়, নারীর প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সমঅধিকার। পুরুষ যতদিন তা না দেবে ততদিন নিজেকেই অপমান করতে থাকবে, তার পরিচয় হবে শিশ্নসর্বস্ব এক বিকৃত জন্তু।

মানুষ যেদিন একটা প্রাণীমাত্র না হয়ে মানবিক আত্মবিশ্বাসী মানুষ হয়ে উঠবে সেদিন কোনো কল্পিত জান্নাত-এর প্রয়োজন হবে না, আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীই জান্নাত হয়ে উঠবে।

আমার এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে যে মানুষটির কথা উল্লেখ না করলে আমি নিজেকে অকৃতজ্ঞ প্রমাণ করব, তিনি মাওলানা মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসুদ। তার নিরন্তর সহায়তা, পরামর্শ, উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় একাজ সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রকৃত অর্থে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা বলার থেকে 'চাপ' বলাই সঙ্গত। আমি শুধু ভাষান্তর করেছি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন মুফতি মাসুদ স্বয়ং। মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসুদ আমার দেখা এক অনন্য চরিত্র। তিনি ইসলামি শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে শিক্ষিত। বাংলাদেশে নিশ্চিন্ত জীবন, নিশ্চিত আয়, নিবিড় সংসার, পরিবার ছেড়ে

কপর্দকশূন্য অবস্থায় শুধু প্রাণটুকু সাথে নিয়ে অনিশ্চিত অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ ঘটাতে। তার কাছে ইসলামের অনেক কিছু জেনেছি, শিখেছি। স্নেহাস্পদ মুফতি মাসুদের জন্য অকৃত্রিম ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতা।

আমার এই চেষ্টা যদি একজন মানুষকেও আলোকের পরশ দেয় নিজেকে সার্থক মনে করব।

শুভেচ্ছান্তে

শ্রীজীব বিশ্বাস

জানুয়ারী, ২০২০

যে ঈশ্বর ঘৃণা করে

অধিকাংশ মুসলমান, হয়ত সকলেই নয়, আমার মৃত্যু কামনা করবে যখন এই বই তারা পড়বে। তারা হয়ত পড়বেও না। শুধুমাত্র শিরোনাম দেখেই আমার মৃত্যু চাইবে। এটাই তাদের স্বভাব। তারা পড়ে না, যদি পড়েও, তারা তা গ্রহণ করে না। তারা পারস্পরিক সমঝোতার চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহী বিরোধিতা করতে এবং সর্বোপরি তারা অতিরিক্ত রকমের আগ্রহী যাদের সাথে তারা সহমত পোষণ করে না, তাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে। এমনকি শুধুমাত্র এই বই পড়ার কারণে তারা আপনাকে মৃত্যু হুমকি দিতে পারে। কারণ তারা তাদের নিষ্ঠুরতা দিয়ে জেনেছে কিভাবে অন্যকে দমন করা যায়: কোন মানুষকে তার নিজের অন্তরের ভীতির দাস বানানোর চেয়ে অন্য কোন কিছুই তার মনুষ্যত্বকে বেশী অত্যাচার করতে পারে না। যদিও আমি তাতে আর ভীত নই। কারণ? আপনাদেরকে একটা গল্প বলি যা থেকে বোঝা যাবে কেমন করে ইসলামের মৌলবাদী মোল্লাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস আমি অর্জন করেছিলাম।

এক বলবান এবং অনুসন্ধিৎসু যুবক ভ্রমণ করতে ভালবাসত। তার জ্ঞানতৃষ্ণার কারণে সে এক দেশ থেকে অন্য দেশে, শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াত জ্ঞান আহরণে আর যা কিছু ঘটত, সব কিছু গেঁথে রাখত তার মনে।

ঘটনাক্রমে, একদিন সে এসে পৌঁছল ছোট ছোট সবুজ পাহাড়ে ঘেরা এক সুউচ্চ পর্বতের পাদদেশে শায়িত এক সুন্দর গ্রামে যেখানে মাঝে মাঝে মৃদু বাতাস বয়ে যায় মনকে প্রফুল্ল আর হৃদয়কে সতেজ করে। কিন্তু সে বিস্মিত হয়ে গেল দেখে যে এমন সুন্দর গ্রামের সকল মানুষ সবাই খুব বিষণ্ণ। তারা শ্লথগতিতে হাঁটে, যেন পা টেনে টেনে চলছে। তার মনে হল যেন এরা সবাই অশরীরী, দেহ নেই মনও নেই। এই অশরীরীদের দেখে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। সে স্থির করল কি কারণে এই

মানুষগুলি এমন কুঁকড়ে আছে তা খুঁজে বের করবে। সে দেখা করল একজন জ্ঞানী মানুষের সাথে যিনি বাস করতেন গ্রাম এবং গ্রামবাসীদের থেকে দূরে এক কুঁড়েঘরে।

যখন সে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির দেখা পেল, তাঁর কাছে জানতে চাইল এই ভয়ঙ্কর অবস্থার কারণ কি। সে জিজ্ঞাসা করল কেন এই মানুষেরা এমন ভীত এবং সঙ্কুচিত যেখানে সামগ্রিক পরিবেশ এমন যে তাদের সুখ এবং সমৃদ্ধিতে ভরে থাকা উচিৎ। সেই সন্ন্যাসীপ্রতিম মানুষটি তাঁর কুটির থেকে বাইরে এলেন এবং সেই উচ্চ পর্বতের চূড়ার দিকে নির্দেশ করে বললেন, "ঐ পর্বতের চূড়ার দিকে দেখ। ওখানে এক ভয়ঙ্কর দৈত্য বাস করে। সে ওখান থেকে মাঝে মাঝেই হিংস্রভাবে চিৎকার করে মানুষকে তীব্র ভয় দেখায় এই বলে যে যদি তারা ঘরের বাইরে যায় বা কোন কাজ করার চেষ্টা করে তবে সে তাদের গিলে খেয়ে ফেলবে। এই চিৎকারে সন্ত্রস্ত মানুষ তাই কোনক্রমে লুকিয়ে বেঁচে থাকে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য ওরা লুকিয়ে চলাফেরা করে। দেহ আর প্রাণ একসাথে রাখার তাগিদে ওরা ইঁদুরের মত লুকিয়ে বাইরে যায়। তারা কোনক্রমে একটা একটা করে দিন পার করে আর অধৈর্য্য হয়ে মৃত্যুমূহুর্ত্তের অপেক্ষা করে। এই দৈত্যের ভয় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, শারীরিক শক্তি নিঃশেষ করে ঠেলে দিয়েছে গভীর হতাশার অন্ধকারে।

যুবক এক মূহুর্ত্ত চিন্তা করে বলল, "আমি ঐ পাহাড়ের চূড়ায় যাব। দৈত্যের সাথে কথা বলব এবং জিজ্ঞাসা করব কেন সে এই মানুষগুলিকে এমন ভীত সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। আমি জানত চাইব কেন সে এদেরকে নিরাপদে এবং শান্তিতে বাঁচতে দিচ্ছে না"।

"ঐ পাহাড়ের চূড়ায় যেতে চাও? কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ঐ দৈত্যের সাথে দেখা করে নিজের জীবন বিপন্ন করতে সাহস করবে না। বাবা, আমি তোমার জীবনের কথা ভেবে নিষেধ করছি যেতে"। কিন্তু যুবককে নিরস্ত করা গেল না। সে দৃঢ় সংকল্প সেই কাজ করতে যা সে কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে। সে চূড়ায় উঠতে শুরু করল।

যখন সেই যুবক চূড়ায় পৌঁছল, সে দেখল সত্যিই সেই দৈত্য বিশালাকার; কিন্তু সে খুব আশ্চর্য হল দেখে যে, সে যতই দৈত্যের নিকটবর্তী হচ্ছে ততই দৈত্য ছোট

হয়ে যাচ্ছে। যখন সে দৈত্যের একেবারে কাছে পৌঁছল তখন দেখে সেই বিশাল দৈত্য, যে সকলকে ভয়ে সঙ্কুচিত করে রেখেছিল, তার ছোট আঙুলের থেকেও ছোট। যুবক তার হাত বাড়িয়ে তালু প্রসারিত করল আর সেই ছোট্ট দৈত্য লাফ দিয়ে সেখানে উঠে বসল।

"তুমি কে?" যুবক জিজ্ঞাসা করল।

"আমি ভয়," দৈত্য উত্তর দিল।

"কিসের ভয়?" যুবক জিজ্ঞাসা করল।

"সেটা নির্ভর করছে, তুমি কে তার উপর। কেউ আমাকে কিভাবে দেখবে সেটা তার নিজের কল্পনার উপর নির্ভর করে। কিছু মানুষ অসুখকে ভয় পায়, তারা আমাকে দেখে রোগ হিসেবে। কেউ দারিদ্রকে ভয় পায় সুতরাং তারা আমার মধ্যে দারিদ্রকে দেখে। যারা ক্ষমতাকে ভয় করে, তারা আমার মধ্যে ক্ষমতাকে দেখে। কেউ বিচারকে ভয় করে, কেউবা বন্য প্রাণীকে আবার কেউবা ঝড়ঝঞ্ঝাকে; আমি তাদের কাছে সেই রূপে দেখা দিই। যে জলকে ভয় করে তার কাছে আমি প্রবল জলস্রোত আবার যে যুদ্ধকে ভয় পায় আমি তার সম্মুখে অস্ত্রসজ্জিত এক বিশাল সৈন্যদল।

"কিন্তু তুমি আসলে যা তার থেকে অনেক বড় দেখে কেন তারা?"

"প্রতিটি মানুষের যে পরিমাণ ভয় সে আমাকে তত বড় দেখে। যতদিন না তারা আমার কাছাকাছি এসে আমার সম্মুখীন হয় ততদিন পর্যন্ত তারা আমার প্রকৃত আকার জানতে পারে না"।

আমার নিজেকে ঐ যুবকের মত মনে হয়, যে তার সমসাময়িক জ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করে। যুবকটি যে গ্রাম দেখেছিল ঠিক তেমনই একটা গ্রামে আমি এক সময় বাস করতাম প্রায় তিরিশ বছর ধরে। গ্রামটিকে আমি এত ভালবাসতাম যে তাকে ছেড়ে যাওয়ার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই আমার ছিল না। অমনই এক দৈত্য কিছুদিনের জন্য আমাকে ভীত করে রেখেছিল কিন্তু দীর্ঘ সময় ভীত রাখতে পারেনি। দৈত্যের মত আমার নিজের ভয়ের দাস হয়ে বেঁচে থাকা আমার জীবনে কঠিন যন্ত্রণার মত ছিল। কিন্তু সেজন্য আমার কোন দুঃখ নেই। আমি মনে করি সবকিছুই

ঘটে কোন একটা উদ্দেশ্যে। ঐ অভিজ্ঞতা আমাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। আমি অকারণে ঐ গ্রামে জন্মাইনি এবং অকারণে তাকে ছেড়েও যাইনি। আমি ঐ যুবকের মতই একটা উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়েছিলাম। প্রায়ই আমার মনে হয় আমি ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে পর্বতচূড়ায় বারবার উঠব এবং দৈত্যের মুখোমুখি দাঁড়াব যে দৈত্য হল মৌলবাদী ইসলামের ভয়। আমি গ্রামের মানুষদেরকে দেখাতে চাই যে দৈত্য প্রকৃতই কত ক্ষুদ্র এবং কাপুরুষ। আমি জীবনে কখনও দেখিনি মুসলমানরা মতানৈক্য ছাড়া কথা বলে। হয়ত আমি একাই এটা ভাবি আবার এও মনে হয় যে হয়ত অন্যরাও এমনই ভাবে। যদি কেউ বলে “সুপ্রভাত” অন্যজন প্রত্যুত্তরে বলবে “কিন্তু এখন তো রাত্রি”। তাদের এই তর্ক করার প্রবণতা তাদেরকে রক্ষণাত্মক ভূমিকায় নিয়ে আসে এবং প্রথানুসারে তারা মনে করে আক্রমণই আত্মরক্ষার সব থেকে ভাল উপায় কারণ এতে তারা তীব্র চিৎকার চেঁচামেচি করার সুযোগ পায়। যখন তারা কারো সাথে কথা বলে যার সাথে মতের মিল নেই তখন চিৎকারই তাদের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য। চিৎকার ব্যতীত তাদের নিজের মূল্য এবং অস্তিত্বের কোন বোধই নেই। এমন কি এছাড়া তারা যে বেঁচে আছে এমন অনুভূতিও তারা বোধ করে না।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যে যুক্তিগুলি অনেক কাছাকাছি সেগুলিকে সংযুক্ত করার চেষ্টা না করে তারা মতবিরোধ সৃষ্টির জন্য যুক্তিকে বিকৃত করে এবং সেটাকেই সাগ্রহে বেছে নেয়। কেন? মতবিরোধ এবং বিষয়কে গুলিয়ে দেওয়ার কারণে দৈত্য বিশাল ও ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। ঢাকা পড়ে তার প্রকৃত ক্ষুদ্র চেহারা। অতি উচ্চ গলায় তারা আলোচনা করে। চিৎকার করাকে তারা অভ্যাসে পরিণত করেছে এবং তারা নিজের চিৎকার নিজে শুনে আনন্দ পায়। বিশ্বাস করে, যত জোরে তারা চিৎকার করবে ততই প্রমাণিত হবে যে তারাই ঠিক। তাদের আলোচনা বলতে শুধুই চিৎকার, কথা কর্কশ শব্দমাত্র এবং তারা বিশ্বাস করে যে সর্বোচ্চ গলায় চিৎকার করতে পারে সেই সবচেয়ে শক্তিমান। তারা মিথ্যা যুক্তির জাল বোনে যাতে

তীব্র চিৎকারের সুযোগ পাওয়া যায়। তারা বিরুদ্ধ যুক্তি খোঁজে যাতে তারা চিৎকার করতে পারে।

আমি প্রায়শই ভাবি এই চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়েছিল কিভাবে আর সেটা বুঝতে আমাকে ইসলাম পত্তনের গোড়ায় ভাবতে হয়েছে। যদি আপনি মরুভূমিতে হারিয়ে যান যেখানে উত্তর বা দক্ষিণ দিকনির্ণয় অসম্ভব; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপে জীবন হারানোর সমূহ সম্ভাবনা, চারপাশে দিগন্তবিস্তৃত বালিয়াড়ী, কোম মানুষ চোখে পড়ে না যে আপনাকে উদ্ধার করতে পারে—সেই মূহুর্তে একমাত্র চিৎকার করেই আপনি অনুভব করতে পারেন যে আপনি বেঁচে আছেন। আপনি চিৎকার করেন এই আশায় যে কোন পথিক হয়ত শুনতে পাবে।

আরবে বহু ইতিহাস বইতে অনেক গল্প আছে যা থেকে মানুষের আতঙ্ক এবং নিশ্চিহ্ন হওয়ার কথা আমরা জানতে পারি। এমনই একটি গল্প, আমার মনে হয়, যেটি বাস্তব অবস্থার ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে। এক বেদুইনের পুত্র অসুস্থ হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। ছেলেটির বাবা পুত্রের জন্য দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে রাত্রিবেলা চিকিৎসকের সন্ধানে বের হয়। গভীর মরুভূমিতে সে পথ হারায়, বুঝতেও পারে না কোথায় সে যাচ্ছে। দীর্ঘ সময় পরে সে দূরে একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পায়। দৌড়ে সেখানে গিয়ে সে তার তাঁবু দেখতে পায় যেখান থেকে সে বার হয়েছিল। যেখানে তার পুত্র পড়ে আছে যার প্রাণ তাকে ছেড়ে গেছে বহুক্ষণ আগে।

এ গল্পের মত আরবি সাহিত্যে আরও অনেক গল্প আছে যেগুলি থেকে আমরা পরিচয় পাই ঐ নিষ্ঠুর পরিবেশের যেখানে ইসলামের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। এ এক শুষ্ক প্রাণহীন জায়গা যেখানে সর্বক্ষণই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যুর ভয়, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ্ করা এক ভয়ঙ্কর বিষয়। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ কোন পথ খুঁজে পায় না এবং এই নৃশংস ভয়কে পেরোতে তার হাতে থাকে শুধু চিৎকার। চিৎকার করার ক্ষমতা বেদুইনের মনের অবচেতনে গভীরভাবে গেঁথে গেছে অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান উপায় হিসেবে। ইসলাম মুসলমানদের এই মরুস্বভাবকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে আর সেই সময় থেকে আজ অবধি অন্যদের সাথে কথা বলার অন্য উপায়

তারা খুঁজে পায়নি। তবু আমি বিস্মিত বোধ করি, কেন এই চিৎকার-চেঁচামেচি আজ অবধি চলছে?

যখন কোন মানুষ একটা বিশেষ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন অন্যদেরকে লক্ষ্য করে দেখে তার আচরণ কতটা তারা মেনে নিচ্ছে। যদি তারা তাকে উৎসাহিত করে বা অন্তত কোন আপত্তি না জানায়, সে সেটাই চালিয়ে যেতে থাকে। যেভাবে সারা জগৎ পশ্চাদপসরণ করেছে এবং এখনও করছে মুসলমানদের চিৎকারের সামনে, সেটাই তাদের এই আচরণ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে। যখন অন্যেরা চুপ করে থাকে বা আরও খারাপ, পিছিয়ে যায় মুসলমানরা ভাবে তারাই ঠিক। ওদের চিৎকার আর আমাকে বিচলিত করে না, আমি ওদের কথা শুনিই না। যদি ওদের কেউ আমার সাথে কথা বলতে চায়—এবং আমি বিশ্বাস করি অতি সামান্য হলেও কিছু মানুষ আছে যুক্তিবোধসম্পন্ন—তারা দেখবে যে আমি প্রকৃতই খোলামনে কথা বলি; যদিও এখনও পর্যন্ত একজনও আসেনি চিৎকার ব্যতীত যুক্তিনির্ভর আলোচনা করতে।

আমার মনে হয় যদি কেউ কোন উত্তরাধিকার না নিয়ে পৃথিবীতে আসে সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করেই পৃথিবী ত্যাগ করে। আমার গ্রামের সেই শিশুবেলা এবং আমেরিকা যাত্রার দিকে চেয়ে আমি খুঁজতে চেষ্টা করি কেন আমি পৃথিবীতে এসেছি। প্রতিটি মানুষই পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম এবং প্রতিটি পরিবর্তনই পার্থক্য এনে দিতে পারে। এ পৃথিবী যেন একটা ছবি, প্রতিটি মানুষই তাকে প্রভাবিত করে এবং নিজে প্রভাবিত হয় আর পরিশেষে সেখানে একটা নতুন চিহ্ন আঁকে যা ছবিটিকে নতুন রূপ দেয়। যারা খারাপ কাজ করে তারা ছবিটিকে বিকৃত করে। আমার আশা, আমি ভাল কাজ করার জন্য এবং ছবিটিকে সুন্দর করার জন্য এসেছি।

ভাল আর মন্দের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে যতদিন পৃথিবী বেঁচে আছে। আমি বিশ্বাস করি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভালটাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেটাই চিরকাল ঘটবে। শয়তান পৃথিবী শাসন করবে এমন চিন্তা একবিংশ শতাব্দী বিশ্বাস করে না। যদিও কোন কিছুই সত্য থেকে দূরে থাকতে পারে না তবুও এমন ভাবনা চিরকালই

সর্বত্র চালু আছে। শয়তান বেশী শক্তিশালী এমন তত্ত্ব যদিও ভিত্তিহীন আমি বুঝি কেন অনেকে এমন ভাবে। শয়তান তীব্র চিৎকার করে, অপরপক্ষে শুভবোধ পৃথিবীকে ঢেকে রাখে নীরবতায়। ভাল অপেক্ষা মন্দকে দেখা অনেক সহজ। আমি বিশ্বাস করি শুভবুদ্ধিই পৃথিবীকে চালনা করেছে সৃষ্টির শুরু থেকে। শুভবোধকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করা প্রয়োজন, কারণ সে শয়তানের কাছে পরাজিত হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। যে যুগে আমরা বেঁচে আছি সেই সময়ের বাস্তববোধ আমাকে নিষেধ করেছে এ বই লিখতে এবং সাবধান করেছে যে এজন্য আমাকে জীবন হারাতে হতে পারে, তবু আমি বেপরোয়া। শেষবিচারে শুভ অশুভকে পরাজিত করবে এই বিশ্বাসই আমাকে আমার কথা বলতে সাহস দিয়েছে।

৯/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলার পর আমেরিকানরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করেছে:

"কেন ওরা আমাদের ঘৃণা করে?"

আমার উত্তর হল: "কারণ মুসলমানরা তাদের নারীকে ঘৃণা করে এবং যে জাতি তাদের নারীকে ঘৃণা করে তারা কাউকে ভালবাসতে পারে না"।

লোকে জিজ্ঞাসা করে: "কিন্তু কেন মুসলমানরা নারীকে ঘৃণা করে?"

উত্তরে আমি শুধু বলতে পারি: "কারণ তাদের ঈশ্বর নারীকে ঘৃণা করে"।

এমনকি আমার পরিবারের মানুষরাই তাদের নারীদের জীবনে যন্ত্রণা ঘটিয়েছে। কতদিন আমি ভেবেছি, কবর খুঁড়ে আমার ঠাকুরদার কঙ্কাল টেনে বার করব আর আমার ঠাকুরমার জীবনে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি তিনি করেছিলেন তার জন্য তাকে বিচারের কাঠগড়ায় তুলব। অসংখ্যবার এমন ভাবনা আমার এসেছে। কিন্তু আমি যথার্থ প্রতিশোধ নিতে পারব না আমার ঠাকুরমার জন্য, সুহার জন্য, সামাইরার জন্য, আমালের জন্য, ফতিমার জন্য, আরও লক্ষ নারীর জন্য, যারা পড়ে আছে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিশোধপরায়ণ কোন ঈশ্বরের কবলে যতদিন না আমি পর্বতচূড়ায় বসে থাকা জন্তুর প্রকৃত রূপ প্রকাশ করতে পারব।

যখন কোন নারী—হাড়ে-মজ্জায় নিপীড়িত, ভীত-সন্ত্রস্ত তার গ্রামজীবনের বন্দীদশায় যে জেলখানা সূঁচের ছিদ্রের থেকেও সঙ্কীর্ণ—অবশেষে এক বিমানে উঠে বসে এবং দৈত্যের থাবা থেকে মুক্তি পায়। সে তার তিন সন্তানকে নিয়ে এসে পৌঁছায় পৃথিবীর সবথেকে বড় শহরগুলির একটিতে। সঙ্গে মাত্র একশ ডলার আর মনে হাজার বছরের দুঃখ নিয়ে। সেই নারী স্থানীয় ভাষা বলতে পারে না এবং স্থানীয় রীতি-পদ্ধতি কিছুই জানে না। তার আছে শুধু একরাশ তিক্ত অভিজ্ঞতা যা পরিমাপ করতে দৃঢ় সাহসের প্রয়োজন। একদিন আমিই ছিলাম ঐ নারী।

যখন আমি লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দরে পা রাখলাম, আমি কেবলমাত্র আমার নিজের পরিবারের কথাই ভাবিনি, আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল সেই মানুষগুলির কথা ভেবে যাদের আমি আমার গ্রামে ফেলে এলাম। লস এঞ্জেলেসে আমার প্রথম চাকরী ছিল গ্যাস স্টেশনে গ্যাস পাম্প করা। আমি সেইদিনই কাজে যোগ দিলাম। আমি আমার প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলাম যাতে আমি প্রশ্ন করার সাহস দেখিয়েছিলাম এবং চিৎকারসর্বস্ব মোল্লাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলাম। আমি দুটি বিষয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবদ্ধ করলাম-প্রথমটি হল আমার পরিবারের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য যতটা সম্ভব বেশী আয় করা আর অন্যটি হল আমার মনের পাহাড়ী পথে ঘুরে দৈত্যের মুখোমুখি হয়ে আমার পরিবারকে তার আতঙ্কের কবলমুক্ত করা। দুটো বিষয়ের মধ্যে কত তফাৎ! প্রথমটি আইন এবং নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত, যত কঠিনই হোক সেটি করা সম্ভব বলে বোধ হয়। অন্যটি জঙ্গলের আইনে নিয়ন্ত্রিত যা থেকে ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের মত জায়গাতেও।

আমার যত দুর্বলতাই থাক শুধুমাত্র সাহস আমাকে ঐ পাহাড়ী পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে একই উদ্দীপনার সাথে যার ফলে সমাজে আমি পথ করে নিতে পারি যে সমাজ আমাকে সম্মান করে। একজন নারী হিসেবে, যেটুকু জ্ঞান আমি লাভ করেছি তা সম্ভব হয়েছে আমেরিকাতে বাস করার কারণে। যে দেশ আমার তীব্র জ্ঞানপিপাসাকে সার্থক করেছে সেইসঙ্গে আমাকে মুক্ত করেছে ভয় আর দুর্বলতা থেকে। আমি নিজেকে এবং আমার পরিবারকে উন্নত করার চেষ্টায় আমার চারিদিকে

বইবেষ্টিত হয়ে থাকতাম। বই, যা থেকে আমার সংস্কৃতিতে নারীরা বঞ্চিত, আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। যদি আপনি নিজেকে বইয়ের শক্তিতে শক্তিমান করতে পারেন আপনি বুলডোজারের মত শক্তিশালী হয়ে উঠবেন, যত দীর্ঘ আর দুর্গম পথই হোক আপনি অতিক্রম করতে পারবেন। কোন কিছুই আর অসম্ভব মনে হবে না।

সতের বছর আমেরিকাবাসের পরে নতুন দেশে যেখানে আমি পৌঁছাতে চেয়েছিলাম তা অর্জন করতে পেরেছি। আমার গ্রামে যে ঈশ্বরকে আমি জানতাম তার থেকে ভিন্ন এক ঈশ্বরের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দরে যে ভদ্রমহিলা আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে যেন আমি এখনও দেখতে পাই। কত বছর আগে আমি আমেরিকার মাটিতে পা রেখেছিলাম আর সেই অল্পবয়সী ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে আমাকে বললেন, "আমেরিকাতে স্বাগত!" সেই মিষ্টি হাসি আজও আমার মনে উষ্ণতা বুলিয়ে দেয়। এর আগে কেউ আমাকে এভাবে অভ্যর্থনা জানায় নি। সেই দৈত্য, যে পুরানো ঈশ্বরকে আমি জানতাম, আমাকে এমন কথা শোনার অধিকার থেকেই শুধু বঞ্চিত করেনি, সে এটাও আমাকে বোঝাতে পেরেছিল যে তেমন সমাজে বাঁচার যোগ্যই আমি নই; যে সমাজ আমাকে অভ্যর্থনা করে বরণ করে নেয় এবং প্রথমবারের মত আমাকে দেখায় যে সে অধিকার আমার আছে।

সেদিন আমি লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েছিলাম এক নতুন চেতনা নিয়ে, যা হয়ত সবাই জানে, যে চেতনাকে মাত্র সেই মূহুর্তে আমি জানলাম এক নারীর দয়ার কারণে যে নারীকে আগে আমি কখনও দেখিনি। সকল সমাজে মানুষ নিজের প্রতিকৃতিকেই পূজা করে। সেই দয়ালু নারী যিনি আমাকে লস এঞ্জেলেসে অভ্যর্থনা করেছিলেন তিনি নিজেই কি সেই ঈশ্বর নন যাকে তিনি পূজা করেন? সেই মূহুর্তে আমি কত যে চেয়েছিলাম তার সেই অভ্যর্থনাকারী ঈশ্বরের সাথে আমার দৈত্যকে বদলে নিতে! আমি সেই মূহুর্তে বুঝেছিলাম ঈশ্বর মানুষের সাথে সামঞ্জস্য পান ঠিক যেমন তালা পায় তার চাবির সাথে। যদি কোন সমাজে গভীর ভ্রান্তি থাকে তবে তালা এবং চাবি দুটোই সারানো প্রয়োজন। কোন একটাকে সারালে কিছুই হবে না। যে আমেরিকাতে আমি এখন বাস করি সেখানকার মত আমার

গ্রামের একজন মানুষও নিজেই সেই ঈশ্বর যাকে সে পূজা করে। সে সেই ঈশ্বরকে তার আদর্শ বলে মনে করে। চেতনে অবচেতনে সে চেষ্টা করে সেই আদর্শের কাছাকাছি হতে যতক্ষণ না সে নিজেই সেই ঈশ্বর হয়ে ওঠে।

লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দরে সেই নারী আমাকে এই আশা যুগিয়েছিলেন যে মানুষ পরিবর্তিত হতে পারে। একজন মানুষের পরিবর্তন ঘটানোর আগে সেই ঈশ্বরকে নতুন রূপ দিতে হবে যাকে সে পূজা করে। আমি বিরক্ত বোধ করি যখন চারপাশে মানব জীবনের অপচয় দেখি। আমি আতঙ্কিত হই একজন মুসলিম যুবকের জীবনের অপচয় দেখে যে এক ঝাঁক স্কুলছাত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে বোমায় উড়িয়ে দেয়। সে আঠাশটি প্রাণ এবং নিজেকে ধ্বংস করে কারণ্ সে সম্পূর্ণভাবে এক মিথ্যায় অভিভূত। যে মিথ্যা তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে তার ঈশ্বর। যে মিথ্যা তাকে জানায় এতগুলি শিশুর প্রাণের বিনিময়ে সে বেহেস্তে যাবে আর হুর পাবে। সেই যুবক কি নিজেকে সেই দৈত্যের সাথে মিলিয়ে ফেলছে না? সেই দৈত্য, যে ঈশ্বররূপে ঘৃণা করে, যে বিষাদমাখা গ্রামের পর্বতচূড়ায় বসে থাকে? সে কি ভয়ের দ্বারা সবাইকে বশ্যতা স্বীকার করানোর আশা করছে না? আমরা যদি ঐ হতভাগ্য আত্মঘাতী মুসলিম যুবকের মত অন্য মানুষদেরকে পরিবর্তন করতে চাই এবং আমাদের এই পৃথিবীকে বাঁচাতে চাই, তবে সর্বপ্রথম তাদেরকে ঐ দৈত্যকে চেনাতে হবে। আর শেখাতে হবে কিভাবে ঘৃণাকারী ঈশ্বরের সাথে বদলে নেওয়া যায় ভালবাসার ঈশ্বরকে।

ইসলামে নারী

লোকে আমায় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে এই নাটকীয় পরিবর্তনের কারণ কি, যা আমার জীবনের দিশা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমার মনে হয় আমার জীবন প্রকৃত অর্থে শুরু হয়েছিল যখন আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি এবং পড়তে শিখি। তখন থেকেই বইয়ের প্রতি আমার তৃপ্তিহীন ক্ষুধা সৃষ্টি হয়েছিল। যে বইই আমি পেতাম সেটাই পড়তাম। আমি চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলাম। আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম The hunchback of notre Dame, Gone with the wind আর আগাথা ক্রিস্টির রহস্য রাজ্যে। অতি অল্প বয়সে বই পড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে আমার শিক্ষক, পরিবার, পারিবারিক শুভানুধ্যায়ীরা উদার যত্ন নিয়ে আমাকে দেখতেন যেন আমি এক দৈবী আশীর্বাদ পাওয়া শিশু।

সেই সময়েই আমি কথা বলতে ভালবাসতাম। আমার মনে হয় আমার আরবি সাহিত্যের শিক্ষকের একটি মন্তব্য আমাকে লিখতে এবং জনসমক্ষে কথা বলার ক্ষমতা ও সাহস দিয়েছিল। একদিন আমার খাতায় তিনি লিখে দিয়েছিলেন, "তোমার সাধারণ অনুভূতি ও বিচারবোধ আমার ভাল লাগে। তোমার প্রতিভা আছে, তার পূর্ণবিকাশ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাকে পড়াশোনার মাধ্যমে লালন কর। পথ বড় দীর্ঘ, তবে ক্যাকটাসের ফল কাঁটার মাঝে বেড়ে ওঠে বলেই খুব মিষ্টি"। তাঁরই উৎসাহে আমি কাঁটার উপহার "ক্যাকটাসের ফল" হয়ে উঠলাম। তাঁর সেই কথা গুলি ছিল আমার লেখা শুরুর অনুপ্রেরণা। জ্ঞানার্জনের জন্য বাকী শক্তিটুকু আমি পেয়েছিলাম আমার পরিবার থেকে কারণ তারা সেইভাবেই আমার সম্পর্কে কথা বলত। যখন সন্ধ্যায় বাবা তাঁর বন্ধুদের কাছে আমার বিষয়ে বলতেন মনে হত যেন

তিনি অলৌকিক মেধাসম্পন্ন কারো কথা বলছেন। আমার সম্পর্কে এভাবে তাঁকে বলতে শুনে আমি লজ্জা বোধ করতাম। তাঁর সেই অত্যধিক প্রশংসা আমার উপর বিশাল এক দায়িত্বভার দিয়েছিল। আর তখন থেকেই আমি কখনও তাঁকে হতাশ করতে চাইনি।

আমার দিদিমা ছিলেন আমার আদর্শ, আমার জীবনে তাঁর বিশাল ভূমিকা। তাঁর স্মৃতির মহার্ঘ রত্নগুলি হল তাঁর বলা গল্পগুলি। যখন আমরা ছোটরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁকে ঘিরে বসতাম তখন তিনি গল্পগুলি বলতেন। তিনি আমাকে নারীর মূল্য কি তা শিখিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে বুঝিয়েছিলেন মুসলিম জগতে নারীরা কিভাবে তাদের স্বামীর দ্বারা পদপিষ্ট হয়। তিনি ছিলেন এক কঠিন নারী এবং আমি যে সুযোগ পেয়েছিলাম তা যদি তিনি পেতেন তবে হয়ত আরবের মার্গারেট থ্যাচার হতে পারতেন। তিনি এক দুঃখী নারী ছিলেন তবে হয়ত একটু কড়া প্রকৃতির। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর চোখে যে গভীর বেদনা লুকিয়ে ছিল আমি তার রহস্য বুঝিনি। যখন তাঁর বয়স কুড়ির একটু বেশী তখনই তাঁর তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে। একবার তাঁদের গ্রামে গুটিবসন্ত মহামারীর আকারে দেখা দেয়, গ্রামের বহু মানুষ মারা যায়। তাঁর বাড়ীতেও রোগের পা পড়ে আর শুধু মেয়ে দুটি রেখে নিয়ে যায় তিন ছেলেকে। আমার দাদু রাত্রে জেগে উঠতেন আর কাতর হয়ে পড়তেন; দুঃখে নয়, লজ্জায়। কারণ তিনি হয়ে গিয়েছিলেন "কন্যার পিতা" এবং অবশ্যই তা আমার দিদিমার জন্য, কারণ তিনিই কন্যাদের জন্ম দিয়েছিলেন।

আমার দাদু ছিলেন স্থানীয় মুখতার—অর্থাৎ গ্রামপ্রধান। তার পদমর্যাদায় পুত্রসন্তান না থাকা খুবই অসম্মানের। যেহেতু দাদু তার এই অসম্মানজনক অবস্থার জন্য দিদিমাকে দায়ী করতেন তাই ছেলেদের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি দিদিমাকে বাধ্য করেছিলেন গ্রামের সুপরিচিত এক পরিবারকে বলতে যেন তারা তাদের সুন্দরী কন্যাকে তাঁর স্বামীর সাথে বিয়ে দেন। দিদিমার মতে তিনি খুব সুন্দর করে দাদুর গুণাবলীর বর্ণনা করে তাকে এক বিশিষ্ট মানুষ প্রতিপন্ন করে সেই পরিবারের সম্মতি আদায় করে বাড়ী ফিরেছিলেন।

প্রথানুযায়ী বিয়ের কনে ঘোড়ায় চড়ে বরের বাড়ীতে আসে, সঙ্গে থাকে তার পরিবারের একজন মানুষ। তাকে অভ্যর্থনা জানাবে বরের পরিবারের কোন মহিলা যিনি মাথায় ধূনার পাত্র নিয়ে কনের শোভাযাত্রার সামনে নেচে অভ্যর্থনা করবেন। কনে তাকে পুরস্কার হিসেবে সেই পাত্রে কয়েকটি মুদ্রা দেবে। দিদিমার মনের কথা একটুও না ভেবে দাদু জোর করে দিদিমাকে বাধ্য করেন ধূনার পাত্র নিয়ে নাচতে। যে মানুষ তার পাঁচ সন্তানের জন্মদাত্রী তাকে গ্রামের মানুষের সামনে জোর করে অসম্মানিত করেছিলেন শুধু সামান্য একটা স্বার্থসর্বস্ব কারণে, সেটি হল তিনি চাননি কনে যে মুদ্রাকটি ধূনার পাত্রে ফেলবে তা যেন পরিবারের বাইরের কারো হাতে যায়।

আমার দিদিমা তাঁর আত্মসম্মান ভুলে মনের দুঃখ লুকিয়ে নেচেছিলেন। যদিও দিদিমা তাঁর স্বামীকে হারালেন তা সত্ত্বেও বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে তিনি একটু খুশী হয়েছিলেন একটি অটোমান স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে। তাঁর সেই তুচ্ছ খুশী দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রথম দিন ভোরে তিনি ঘরের দরজায় মৃদু শব্দ শুনতে পেলেন এবং দরজার ফাঁক দিয়ে দাদুকে দেখে তিনি যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন। খুব মৃদুস্বরে দাদু দিদিমাকে বললেন, “আমার নতুন বৌ এখনও ঘুমিয়ে আছে। তাই আমি ঐ সোনার মুদ্রাটা ধার নিতে এসেছি। আমি কথা দিচ্ছি মরসুমের শেষে ফসল উঠলে ওটা ফিরিয়ে দেব”।

মনের কষ্ট ছাড়া আর সবকিছু হারিয়ে আমার দিদিমা মুদ্রাটা দিয়ে বিছানায় ফিরে গেলেন। বিয়ের পরে আমার দিদিমা তাঁর নিজের বাড়ীতেই চাকরানী হয়ে গেলেন। তিনি সেবা করতেন দাদুকে, তার স্ত্রীকে, আর দশজন পুত্রের, যাদেরকে সেই স্ত্রী উপহার দিয়েছিলেন দাদুকে। আমার দিদিমা এই হীনতা মেনে নিয়েছিলেন, অপমান হজম করেছিলেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ীতে আর মাঠে কাজ করেছেন শুধু তাঁর মেয়েদের কথা ভেবে। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর দাদু মারা যান দিদিমাকে সেই মুদ্রাটি ফিরিয়ে না দিয়ে। এর প্রায় পনের বছর পর দিদিমা মারা যান। একজন নিষ্ঠাবতী মুসলিম নারী যেমন বলে তেমনই তখনও তিনি জোরের সাথে বলতেন তাঁর স্বামী একজন বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন। দাদু যখন জোর করে তাঁকে

অন্য এক যুবতীর সাথে বিয়ের জন্য কথা বলতে পাঠিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করেছিলেন সেই কারণেই।

একজন মুসলিম নারীর সচরাচর নিজের জীবনের জন্য কিছু করার অধিকার থাকে না কিন্তু বিরল ক্ষেত্রে যদি তিনি করেন সেই নারী একমূহুর্ত্ত দ্বিধা করেন না যা তার প্রয়োজন তাকে গ্রহণ করতে। এর জন্য যদি তাকে কঠিন মূল্য দিতে হয় তবুও। আমার মায়ের বিয়ের পর দিদিমা স্থির করেন দাদুর সাথে ঐ নারকীয় জীবন থেকে সরে যাবেন এবং তাঁর ভাই-এর পরিবারে চলে যান। যদিও ভাই-এর পরিবারে তাঁর অবস্থার সামান্যই উন্নতি হয়, তবু তিনি মনে করতেন বাড়ী ত্যাগ করে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ করতে পেরেছেন। মায়ের বিয়ের পর তিনি মুরগীর মত বাচ্চা জন্ম দিতে থাকলেন। আমার বাবার প্রথম স্ত্রী থেকে পাওয়া পাঁচ সন্তান আমাদের সাথে থাকত। আমার মায়ের আট সন্তানের মধ্যে আমি ছিলাম চতুর্থ। আমি যখন পৃথিবীতে আসি তখন সেই বাচ্চাপূর্ণ বাড়ীতে একটু পা রাখার জন্য রীতিমত প্রতিযোগীতা করতে হত। মায়ের বিয়ের বেশ কিছু বছর পরে আমার বাবা দিদিমাকে আমাদের সাথে এসে থাকতে বলেন যাতে তিনি বাড়ীর কাজে এবং বাচ্চাদের পালনে সাহায্য করতে পারেন। আরব অঞ্চলে কোন নারীর পক্ষে তাঁর জামাতার বাড়ীতে বাস করা খুব স্বাভাবিক নয়, তবু বাবার অনুরোধে তিনি রাজী হয়েছিলেন কেবলমাত্র ভাইকে বোঝাতে যে তাঁর পছন্দেরও মূল্য আছে, যেমন বুঝিয়েছিলেন দাদুকে। আমাদের বাড়ীতে দিদিমার জীবন একটু অন্যরকম ছিল। আমার বাবা দিদিমাকে সম্মান করতেন এবং তাঁর কঠোর পরিশ্রম আর বাচ্চা পালনে সাহায্যের প্রশংসা করার সামান্য সুযোগও ছাড়তেন না। এই বাড়ীতে দিদিমা স্বাধীনতার শুদ্ধ হাওয়ায় শ্বাস নিতে পারতেন আর আমাদেরকে ভালবাসা ও কমনীয়তায় ভিজিয়ে দিতেন।

আমার মা ছিলেন অন্যরকম। অতীতকে ঝেড়ে ফেলার যে ক্ষমতা দিদিমার ছিল তা মা পাননি এবং সবসময়েই দুঃখী, রাগী আর জেদী হয়ে থাকতেন। একটা শিশু যেমন খেলনা নিয়ে মোহিত হয়ে থাকে তেমনি বাবাও আমার মায়ের

যৌবনসমৃদ্ধ রূপে মোহিত ছিলেন। তিনি আমার মায়ের থেকে বয়সে অন্তত পঁচিশ বছরের বড় ছিলেন। বাবার বড় মেয়ের থেকেও মা বয়সে ছোট ছিলেন। তিনি মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন, কিন্তু তাতে মায়ের মুখে কখনও হাসি ছিল না। তাদের বয়সের ব্যবধান ছিল খুবই বেশী এবং তাঁদের এই বিয়ে মায়ের একেবারেই পছন্দ ছিল না।

আমার বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী আর আমরা যে শহরে থাকতাম সেখানে তিনি ছিলেন সম্মানিত এবং বেশ পরিচিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন শস্য ব্যবসায়ী। পূর্ব সিরিয়াতে উৎপন্ন ফসল তিনি বিক্রি করতেন উপকূলবর্তী অঞ্চলে। আমাদের এলাকায় তিনি আমাদেরকে যে মানের জীবন দিতে পেরেছিলেন, তেমনটা অন্যেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। তাঁর দিন শুরু হত ভোর চারটায়। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে সকালের কফি বানাতেন। কয়েক মূহুর্ত্তে তুরস্কের কফির সুগন্ধে সারা বাড়ী ভরে যেত। আধঘুমে আমি দেখতে পেতাম বাবা মায়ের বিছানার কাছে গিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলছেন, "কফি তৈরী, জানেমন"। কিন্তু মা ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিতেন আর বাবা বারান্দায় তাঁর চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে কফি খেতেন, প্রায়সঃই একা।

বাবাকে ঘিরে আমার একটি সুখস্মৃতি হল যখন তিনি ব্যবসায়িক দীর্ঘ যাত্রাশেষে বাড়ী ফিরতেন, সাধারণতঃ খুব ভোরে, আর দৌড়তে দৌড়তে চেঁচিয়ে সবাইকে ডেকে তুলতেন। "সবাই বেরিয়ে এস, আর ব্যাগ গুলি নিয়ে এস"! আমরা পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করে বেরিয়ে বাড়ী ঢোকার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকা শস্যের গাড়ীর কাছে যেতাম। চালক আমাদের সাহায্য করতেন মিষ্টি, ফল, সব্জীভরা ব্যাগগুলি ভিতরে নিয়ে আসতে। তরমুজ আর খরমুজের মরশুমে আমরা প্রতিযোগীতা করতাম কে কত বেশী আনতে পারে।

খুব অল্পসময় বাবা বাড়ী থাকতেন। ভোরে সূর্য ওঠার আগে বেরিয়ে যেতেন আর ফিরতেন সন্ধ্যার পর। তাঁর অনুপস্থিতিতে দিদিমা দাপটে রাজত্ব করতেন। আমাদের শহরে স্কুলের বেশ অভাব ছিল। এই সমস্যার কারণে প্রতিটা স্কুলে দুটো

ভাগে ক্লাস হত। শনি, রবি, এবং সোমবারে মেয়েরা ক্লাস করত সকাল সাতটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত। ছেলেদের স্কুল শুরু হত সাড়ে বারোটায়, চলত বিকাল পাঁচটা অবধি। বাকী তিন দিন, মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতি; এই ব্যবস্থা উল্টো হয়ে যেত। তখন ছেলেদের স্কুল শুরু হত সকালে, মেয়েরা পড়ত বিকালে। যে দিনগুলিতে আমার বিকালে স্কুল থাকত সেই দিনগুলিতে সকালে আমি দিদিমার সাথে স্থানীয় বাজারে যেতাম প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে।

আমার দিদিমার গ্রাম ছিল আমরা যে শহরে থাকতাম তার থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে, যে গ্রামে তিনি বাস করেছিলেন তাঁর ভাই-এর বাড়ী থেকে আমার বাবার বাড়ীতে আসার দিনপর্যন্ত। যে দিন তিনি গ্রাম ছেড়েছিলেন সেদিন থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি আর সেখানে পা রাখেননি। আমার মনে আছে কুড়ি বছর পরে আবার তিনি সেখানে গিয়েছিলেন তাঁর এক বোনের অন্ত্যেষ্টিতে। আমার দিদিমা যেখানে বড় হয়েছিলেন সেই গ্রামটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন কিন্তু তাঁর অনুভূতি গোপন করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কখনও কখনও আমি সেই আবেগের ঝলক দেখতে পেতাম যখন তাঁর সাথে সকালের বাজার অভিযানে যেতাম।

বাজারের কাছে বাস এবং ট্যাক্সির একটা স্ট্যাণ্ড ছিল যেখানে বহু লোক আসত আশেপাশের গ্রামে যাওয়ার জন্য। এককোণে একটি দোকান ছিল যেখানে বিক্রি হত 'ফালাফেল স্যাণ্ডউইচ', 'হুমুস' আর 'ফাভা বিন'। সেই দোকানের মালিক ছিলেন আমার দিদিমার আত্মীয়, তিনিও ছিলেন দিদিমার গ্রামের মানুষ। দিদিমা ফালাফেল খুব ভালবাসতেন আর প্রত্যেকদিন সোজা গিয়ে হাজির হতেন সেই দোকানে। তারপর ফালাফেল বিক্রেতা সেই আত্মীয় মুহম্মদের সাথে লম্বা গল্প জুড়ে দিতেন। সেই ভদ্রলোক তাদের গ্রামের ছোট বড় সব ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতেন। যে সময়ে দিদিমা মুহম্মদের সাথে গল্প করতেন সেই সময়টুকু ছিল আমার কাছে খুব মূল্যবান।

মুহম্মদের দোকানের পিছনে রাখা ময়লার পাত্রটি ছিল আমার প্রথম বিদ্যালয় যেখান থেকে আমি অনেককিছু শিখেছিলাম। মুহম্মদ ফালাফেল মুড়ে দিত বিভিন্ন

পত্রিকা, বই, খবরের কাগজ থেকে ছেঁড়া কাগজে যেগুলি সে খুব অল্প দামে কিনত যারা ওগুলি পড়েছে তাদের কাছ থেকে। দোকানের পিছনে একটা বড় ড্রামের নিচের অংশ ময়লা ফেলার জন্য রাখা থাকত। খাওয়া শেষে মুহম্মদের খদ্দেররা স্যাণ্ডউইচের মোড়ক সেটাতে ফেলে দিত।

যখন দিদিমা গল্পে মেতে থাকতেন আমি চুপিচুপি সেই ড্রামের কাছে গিয়ে পাশের পাথরের দেয়ালে উঠে পড়তাম। তারপর আমার ক্ষীণ দেহ বাঁকিয়ে নীচে ঝুঁকে পড়তাম যতক্ষণ না ভিতরের কাগজগুলি হাতে পেতাম। কাগজে লেগে থাকা আঠালো জিনিস মুছে সেগুলিকে সমান করে নিতাম আর পেটে বা জ্যাকেটের নীচে লুকিয়ে রাখতাম পরে পড়ার জন্য। আমি ঐ মূল্যবান কাগজ সংগ্রহ করতে থাকতাম যতক্ষণ না দিদিমার গলা শুনতে পেতাম, "কোথায় গিয়েছিলি ক্ষুদে হনুমান? ময়লা নিয়ে খেলছিস? কি নোংরা মেয়ে!"তারপর তিনি স্যাণ্ডউইচের একটা অংশ আমাকে দিতেন আর আমি পকেটের কাগজগুলি পাওয়ার আনন্দে গোগ্রাসে খেয়ে নিতাম। মুহম্মদের ফালাফেলের দোকানে যাওয়ার সুবাদে প্রথম আমি লেবানন সংবাদ সংস্থার লেখাগুলির স্বাদ পাই। ফলস্বরূপ ইউরোপীয় এবং ফরাসী সংবাদপত্রের লেখারও, যেগুলি এখানে পুনর্মুদ্রিত হত। ১৯৬০ সালের শেষদিকে যখন আমি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিলাম তখন আরবের সংবাদ পত্রের বাজারে প্রাধান্য করত স্বাধীন লেবানন সংবাদ সংস্থা। সিরিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বিশেষভাবে সত্যি ছিল। ঐ সংস্থার স্বাধীনতা দেখে আমি উৎসাহ বোধ করতাম। খবরের কাগজের যে পাতাগুলি আমি মুহম্মদের ময়লার পাত্র থেকে সংগ্রহ করতাম, তাতে থাকত চিন্তার স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতার কথা, যা ছিল আরব দুনিয়ায় সম্পূর্ণ অজানা। আর সেগুলি আমাকে সাহসী করে তুলেছিল, সর্বত্র সত্যকে খুঁজতে শিখিয়েছিল।

শুক্রবার আমাদের ছুটি। দিনের বেশীরভাগ সময় ধরে আমি কুড়িয়ে আনা কাগজগুলির লেখা একটা বিশেষ খাতায় লিখে রাখতাম, তারপর ময়লা কাগজগুলি ফেলে দিতাম। এমন একটা সপ্তাহও যায়নি যখন কোন না কোন খবরের কাগজ থেকে নতুন কিছু পাইনি। Reader's Digest-এর আরবি সংস্করণ Al-Mukhtar

ছিল আমার প্রধান অনুসন্ধানের জিনিস। মুহম্মদের সেই ড্রামে আমি কখনো তা খুঁজে পাইনি। দুর্ভাগ্যক্রমে এর ছোট পৃষ্ঠাগুলি দিয়ে স্যাণ্ডুয়িচ ভালভাবে মোড়া যেত না। ফলে, প্রত্যেকমাসে আমার দু'সপ্তাহের হাত খরচের টাকা নিঃশেষ হত Reader's Digest কিনতে, কিন্তু আমার কিছু মনে হত না। সেখানে আমি যা পেতাম তা আমার টাকার থেকে অনেক দামী।

Reader's Digest-এর মাধ্যমে আমি আঙ্কল স্যামের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কথা জেনেছিলাম। তখনো পর্যন্ত আমি ভাবতাম যুক্তরাষ্ট্র বোধহয় আমি যে পৃথিবীতে বাস করি সেখানে নয় অন্য কোন গ্রহে অবস্থিত। এর পাতাতেই প্রথম আমি Statue of Liberty-র (স্বাধীনতার বিগ্রহ) বিষয়ে জানতে পারি। আর সেই বয়সে আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করতে চেষ্টা করতাম। আমি কল্পনা করতাম, আমি যদি ঐ নারী হতাম তাহলে সর্বপ্রথম আমি আমার দিদিমার মুখে একটু হাসি এনে দিতাম আর দাদুকে একটা ভয়ানক চিঠি লিখে কঠিন ধমক দিয়ে জানতে চাইতাম কেন তিনি আমার দিদিমার সাথে অমন ঘৃণ্য আচরণ করেছিলেন। যদিও আমি অস্বীকার করব না যে ঐ মূর্ত্তির প্রতি আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল ঈর্ষার অনুভূতি। ঐ নারী এক হাতে আলোকবর্ত্তিকা, অন্য হাতে বই নিয়ে ভয়-সঙ্কোচহীনভাবে জনসমক্ষে অত্যন্ত গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছেন; আমি কেন তা করতে পারি না? আমার সারা জীবন, সেই সময়ের এবং বর্তমানের, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার এক প্রচেষ্টা।

আমার প্রতিদ্বন্দী ঐ নারী যাঁর বইএর প্রতি ভালবাসা আমারই মত, তাঁর মূর্ত্তিকে আমি প্রথম দেখেছিলাম প্যান আমেরিকান বিমানের জানালা দিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আসার সময় নিউ ইয়র্কের আকাশে, সেদিন ডিসেম্বর ২৫, ১৯৮৮ । আমার হৃদয় যেন তাঁকে দেখে আনন্দে নেচে উঠল এবং আমার ঈর্ষা এক মূহুর্ত্তে উবে গেল। আমি জানিনা কোথা থেকে সেখানে চলে এল নিরাপত্তা আর জয়ের অনুভূতি। লস এঞ্জেলেস এর বিমানে ওঠার আগে আমাকে নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরে ছ'ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। আমার স্বামী অপেক্ষা করবেন লস এঞ্জেলেসে। নিউ ইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলেস যাওয়ার পথে বিমানে বসে আমি দাদুকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, যিনি

তখন কবরে, যেখানে আমি আমার সমস্ত রাগ উগরে দিয়েছিলাম। যখন লস এঞ্জেলেস এর মাটিতে পা রাখলাম অনুভব করলাম আমার মনের ভার অনেক হাল্কা হয়েছে যদিও তখনো পর্যন্ত আমি আমার দিদিমার মুখে হাসি ফোটাতে পারিনি।

আমার দেশের মতো দেশে নিপীড়ীত মানুষে ভাবে ভাগ্য তাদের বিরুদ্ধে। শুধুমাত্র পুরুষরাই আমার মা, দিদিমা এবং আমার দেশের প্রতিটি নারীর শত্রু নয়; নারীরাও তাঁদের দুর্দশার জন্য ভাগ্যকে দায়ী করে। জুন ১৪, ১৯৬৭—সিরিয়া-ইজরায়েল ছ'দিনের যুদ্ধের যুদ্ধবিরতির দশম দিন—দুর্ভাগ্য আমাদের বাড়ীতে পা রাখল। আমার বাবা পূর্ব সিরিয়া গিয়েছিলেন এক গাড়ী শস্য আনতে আর কখনো বাড়ী ফেরেননি। রাত্রিবেলা রাস্তায় বেশী গাড়ী ছিল না। আমি আজও জানি না ছ'শ মাইল পথে কি কারণে তাঁর গাড়ীটি মধ্য সিরিয়া এবং উপকূল অঞ্চলের মাঝামাঝি পাহাড়ের এক গভীর খাদে পড়ে যায়। বহুক্ষণ ধরে বাবার রক্তক্ষরণ হয়। সেনাবাহিনীর একটি গাড়ী একজন সিরিয় সৈনিকের দেহ তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেই পাহাড়ী পথে আসছিল। সেই গাড়ীর চালক বাবার গাড়ীটিকে খাদে পড়ে থাকতে দেখেন এবং গাড়ী থামান। তিনি আমার বাবা এবং তাঁর ড্রাইভারকে কাছের শহরের হাসপাতালে নিয়ে যান। ড্রাইভার বেঁচে যান কিন্তু আমার বাবা আভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণে মারা যান।

বাবার মৃত্যু আমাদের জীবনকে একেবারে ওলোট-পালোট করে দিল। আমার মায়ের বয়স তখন তিরিশের একটু বেশী। কি ঘটেছে তা বোঝার সামান্য বোধটুকুও তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমার সৎভাই, বাবার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র পুত্র এগিয়ে এসে বাবার জায়গা নিলেন। তিনি ছিলেন স্নেহপ্রবণ, উষ্ণহৃদয় এবং দয়ালু। তিনি বাবার ব্যবসার দায়িত্ব নিলেন এবং আমাদের ও তাঁর নিজের পরিবারের জীবনযাত্রার মান অক্ষুণ্ণ রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা শুরু করলেন। তিনি তখনই ছয় সন্তানের পিতা।

তাঁর বাড়ীতে বাস করার অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস গঠনের সূচনা করে। আমার ভাই ছিলেন সিরিয়ার জাতীয় দলের (Syrian National Party)

সদস্য, সেকারণে তিনি ইসলাম বিষয়ে নিতান্ত উদাসী ছিলেন। তিনি এর বিরোধী ছিলেন না, আবার পক্ষেও ছিলেন না। দলের কার্যক্রমের একটি ছিল আরব ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করা এবং ধর্মীয় আনুগত্য নিরপেক্ষ একক আরব জাতির সৃষ্টি। ইসলামপন্থীরা একে ইসলামের শঙ্কার কারণ বলে মনে করত। তারা চেষ্টা করত ইসলামের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে আরব এবং অনারব সমস্ত মুসলিমদের নিয়ে একটি জাতি গঠন করতে। এই দুই বিরোধী শিবিরের অদৃশ্য যুদ্ধের কারণে জাতীয় দলের সমর্থকরা গোপনে ধর্মের প্রতি, বিশেষত ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করত, এতে তারা ইসলামি শিক্ষার কঠোর আইন-কানুন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পেরেছিল।

আমার ভাই কখনও ইসলামপন্থীদের প্রতি তাঁর অপছন্দের মনোভাব প্রকাশ করেনি কিন্তু আমি বুঝতাম তিনি তাদের পরোয়াও করতেন না। তিনি ভালই জানতেন আরবি-ভাষী দেশগুলির উন্নতির পথে ইসলাম কবরখানা সদৃশ। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান তাঁর চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছিল এবং বোন ও একজন নারী হিসেবে আমার প্রতি তাঁর ব্যবহারের উপর প্রভাব ফেলেছিল। প্রথম থেকেই তিনি আমার চিন্তাভাবনাকে সম্মান করতেন এবং আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যা ঐ অঞ্চলে অধিকাংশ মুসলিম নারী স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।

আশ্চর্যজনকভাবে আমার দিদিমা—যাঁকে আমি আদর্শ ভাবতাম, তিনি প্রচণ্ড চেষ্টা করতেন আমাকে নারীর চিরায়ত চরিত্রের স্বরূপ বোঝাতে অর্থাৎ নারীরা তাদের নিজের ভালমন্দের দায়িত্ব নিতে পারে না। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমার ভাইয়েরা আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত এবং আমার পুরুষ রক্ষক বলে নিজেদেরকে মনে করত। কিন্তু প্রায়শই আমার সৎভাইয়ের ইচ্ছার সাথে তাদের মতবিরোধ হত। তিনি চাইতেন আমি যেন তুলনামূলক ভাবে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করি। যেহেতু তিনি সবার বড় ছিলেন, অন্য ভাইদের মতামত চাপা পড়ে যেত। তাদের আগ্রাসী মনোভাব এবং আমার উপর মাতব্বরী করার চেষ্টা থেকে বাঁচাতে তিনি প্রায়ই এগিয়ে আসতেন।

বাবার মৃত্যু এবং আমার স্কুল পরীক্ষাপাশের মধ্যবর্তী সময়কালে আমি যথেষ্ট স্বাধীন ছিলাম। আমি সিনেমা দেখতে যেতাম। মিশরীয় ছবি দেখতাম যা তখন আরবি সিনেমা শিল্পে খুব প্রভাবশালী ছিল। আমার অনুমতি ছিল সব ধরণের বই, পত্রিকা এবং সংবাদপত্র পড়ার। আমার মনে আছে বহুবার কোন না কোন কারণে ভাইদের মধ্যে কারো সাথে আমার ঝগড়া লেগে যেত, আর সে আমাকে যথেচ্ছ কিল ঘুষি মারত। আমার চিৎকার—বেদুইনদের মত—ছিল আমার একমাত্র আত্মরক্ষার অবলম্বন। করণ আমার তীব্র চিৎকার আমার ছোট্ট দেহের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল।

আমার দিদিমা সেই চেঁচানি এড়ানোর জন্য সাথে সাথে কানে আঙুল দিয়ে বলতেন, "আল্লাহ, ওর চিৎকার থামাও! এই বেহায়া মেয়ে! তোর ভাই তোর মুখে একটা চড় মেরেছে—তাতে হয়েছেটা কি? সে তো তোকে সহবৎ শেখাচ্ছিল। তাতে কি কাবা* ধ্বসে পড়েছে?"

"কাবা কি ধ্বসে পড়েছে?"এ প্রশ্ন এখনও আমার মনে অনুরণিত হয়। যদিও আমি তাঁকে সম্মান করতাম তবু বহুবার দিদিমার মুখের উপর চিৎকার করে বলতে চেয়েছি, "চুপ! নির্বোধ মহিলা! তুমি দাদুকে তোমায় মারতে দিয়েছ, কিন্তু আমি কাউকে আমার গায়ে হাত দিতে দেব না। কেউ আমাকে মারবে সেটা কাবা ধ্বসে পড়ার থেকে অনেক বেশী ভয়ানক ব্যাপার"। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার গভীর ভালবাসা আর সম্মানবোধ সেইসঙ্গে আমাদের চিরায়ত রীতি আমাকে বাধা দিয়েছে।

আমি স্কুল পরীক্ষায় সম্মানজনক ফল করায় ডাক্তারি পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলাম। আমার ডাক্তার হওয়ার কোন উচ্চাশা ছিল না এবং ডাক্তারিকে পেশা হিসেবে নিতেও চাইনি। আমি চেয়েছিলাম আরবি সাহিত্য নিয়ে পড়তে যাতে আমি নির্ভুল আরবি লিখতে পারি। কিন্তু আমার ফল বেশী ভাল হয়েছিল গণিত, জীবনবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যায় এবং অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়গুলিতে। ডাক্তারি না পড়লে আমার পরিবার খুবই হতাশ হত। আমার কৃতিত্বে আমার ভাইয়ের গর্ববোধের সম্মানে

আমি রাজী হয়ে গেলাম এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে ভাইয়ের ইচ্ছানুযায়ী ডাক্তারিতে ভর্তি হলাম।

আমি বানিয়াস থেকে আলেপ্পো চলে গেলাম আলেপ্পো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য। রাজধানী দামাস্কাসের পরেই দ্বিতীয় নগরী আলেপ্পোর জীবন অতিরিক্ত কোলাহলপূর্ণ এবং বানিয়াসের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বানিয়াস যেন ভূমধ্যসাগরের কোলে ঘুমিয়ে থাকা এক ছোট্ট শান্ত শহর। আলেপ্পোতে আমার নিজেকে খুব একা মনে হত। আমি যেখানে জন্মেছি এবং বড় হয়েছি সেখানকার থেকে এর সমাজ সম্পূর্ণ আলাদা। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের কাছে বানিয়াস অনেক সুগম ছিল, ফলে তুলনামূলকভাবে ইসলামি আইনকানুনের কঠোরতা এখানে ছিল না। যেসব আইন আলেপ্পোর অধিবাসীদের জীবনকে বন্দী করে রাখত।

আলেপ্পোতে আমি স্থানীয় এক মুসলিম পরিবারে অতিথি হিসেবে ছিলাম। ঐ পরিবারের স্বামী আহমদের সাথে আমার ভাইয়ের কর্মসূত্রে আলাপ ও বন্ধুত্ব। আমার বয়স কম, সে কারণে আমি একা থাকতে পারব না বিবেচনায় আহমদ আমার ভাইকে জোরের সাথে বলেছিল যেন আমি তাদের সাথে থাকি, ভাই সে কথায় রাজী হয়েছিলেন। আহমদের স্ত্রীর বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। তার কাছে আমি যেন স্বর্গচ্যুত কোন আশ্চর্য বস্তু। কারণ সে এর আগে কোন মুসলমান নারীকে মাথা না ঢাকা অবস্থায় দেখেনি এবং যার পরিবার বাড়ী থেকে দূরে অপরিচিত শহরে থাকতে অনুমতি দিয়েছে। তাদের দু'টো ছোট শিশু ছিল কিন্তু সেই দম্পতি আমার বিষয়ে বেশী কৌতুহলী ছিল।

তাদের সাথে থাকার কারণে আমি জীবনের অন্য এক ধারা দেখেছিলাম যা আগে আমি জানতাম না। সেই পরিবারে সমস্ত বিষয়ে ইসলামের শিক্ষাই ছিল শেষ কথা। অচিরেই আমি বুঝলাম আমার দিদিমা কত ভাগ্যবতী ছিলেন, এমনকি দাদুর সাথে অমন বিভীষিকাময় বিয়ে সত্ত্বেও, যখন এই যুবতী মেয়েটির জীবন ও স্বামীর সাথে সম্পর্কের তুলনা করতাম। তার স্বামী ছিল বেঁটে, টাকমাথা, কর্কশ স্বভাবের

মানুষ, হাত-পা কাঠির মত আর বেঢপ পেট। মেয়েটি ছিল বেশ সুন্দরী; সবুজ দীঘল চোখ, ফর্সা গোলাপী ত্বক, দীর্ঘ সোনালী চুল।

একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তুমি ওকে পছন্দ করলে কিভাবে?"

সে হেসে উঠে বলল, "ওকে পছন্দ করেছি? আমি? তুমি কোথা থেকে এসেছ— সুইজারল্যাণ্ড?"

সত্যিই সে আমাকে অন্য গ্রহের মানুষ হিসেবে দেখত। তার নাম ছিল হুদা। যখন তার বয়স ষোল, তখন এক মহিলা ওদের বাড়ীতে আসে বিয়ের বয়সোপযোগী মেয়ে খুঁজতে। হুদার প্রতি চোখ পড়তেই তিনি তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন এবং তৎক্ষণাৎ হুদার মার কাছে তার ছেলের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। আহমদের পরিবারের সাথে পরিচিত হয়ে হুদার বাবা ধনী মানুষের সাথে মেয়ের বিয়ের সুযোগ ছাড়লেন না, যদিও বরের বয়স মেয়ের বয়সের থেকে চৌদ্দ বছর বেশী।

বিয়ের রাত্রির আগে সে তার বরকে কখনও দেখেনি। যখন সে ঘরে এল তখন হুদা কাঁপছে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে কুমারীত্বের প্রমাণের জন্য। তার স্বামী বন্য জন্তুর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কয়েকমিনিট পর তার রক্তমাখা একটুকরো কাপড় নিয়ে বেরিয়ে গেল। পরিবারের মহিলারা আনন্দে চিৎকার করে নেচে উঠল।

একাধিকবার সে আমার কাছে স্বীকার করেছে যে সে তার স্বামীকে ভালবাসে না। প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ভয় পায়, কিন্তু তার কোন উপায় নেই। স্বামীর সঙ্গে ছাড়া সে কখনও বাড়ীর বাইরে যায়নি। পুরনো যুগের একটা বাড়ীতে ওরা থাকত যে বাড়ীর বাসিন্দারা সবসময়েই বন্ধ দরজার পিছনে থাকত। যতদিন আমি ওদের সাথে ছিলাম আশেপাশের কোন বাড়ীর একটা জানালাও খোলা দেখিনি।

আহমদ অতি সামান্য কারণে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করত, কখনও বা কোন কারণ ছাড়াই। যখন তার স্বামী রেগে যেত হুদা প্রাণপণে চেষ্টা করত একটা শব্দও না বলতে। যা কিছু সে বলবে সেটাই পরে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। প্রায়ই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে হুদার পক্ষ নিয়ে কথা বলতাম। যখন আমরা তর্ক করতাম তখন

আহমদ কোরআন বা নবীর বাণী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তার আচরণের সাফাই দিত এবং স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করত। কিন্তু আমি তাকে বাধ্য করতাম আমাকে সম্মান করতে এবং সে আমার তীক্ষ্ণ কথাকে ভয় করত। সে তর্কের সময় ভয়ঙ্করভাবে নিজের বক্তব্যে অনড় থাকত কিন্তু আমি যেভাবে স্টিম রোলার চালাতাম (হ্যাঁ, আমি জানি আমি সেটাই করি...) তাতে সে বিষয়টাকে হাল্কা করে দিত। কিছুটা ঠাট্টা, কিছুটা গম্ভীরভাবে সে বলত, “তুমি জাহান্নামে যাবে, কারণ তুমি ইসলামের শিক্ষা মানো না”।

তাদের দুই ছেলের মধ্যে বড়টির বয়স ছিল পাঁচ, তার ভাই ছিল এক বছরের ছোট। তবু স্বামীটি তাদেরকে স্ত্রীর উপর চরবৃত্তি করার কাজে ব্যবহার করত। বড়টি বাবা-মার সম্পর্ক কেমন তা পরিষ্কার বুঝত এবং নিজের সুবিধার্থে নিপুণভাবে দুজনের উপরেই ব্যবহার করত। ঘর থেকে মাঝে মাঝেই শুনতাম তার মা আমাকে ডাকছে, “ওয়াফা, তোমার সাহায্য চাই—এখানে এস আর আমার হয়ে সাক্ষী দিও”। ঘর থেকে বেরিয়ে আমি দেখতাম বড় ছেলেটি তার মাকে শাসাচ্ছে এই বলে যে; সে যা চাইছে তার মা যদি তা না করে, তবে সে তার বাবাকে বলবে যে তার মা ফোনে একজন লোকের সাথে কথা বলেছে, কারো জন্য দরজা খুলে দিয়েছে বা বাড়ীর বাইরে গিয়েছিল।

আমি তাদের সাথে ছিলাম পুরো এক বছর। দ্বিতীয় বছরে আর এই পারিবারিক যন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে থাকতে পারলাম না। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনে চলে গেলাম এবং পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। হুদা এবং তার পরিবারের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল কারণ আমি তার জন্য দুঃখ বোধ করতাম। সপ্তাহে কমপক্ষে দু’দিন তার সাথে দেখা করতে যেতাম। ঐ বছরগুলিতে আমি মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ সরাসরি দেখেছি, পুরুষ ও নারী উভয়ের বিরুদ্ধেই। আহমদ আর হুদার বাড়ীতে সেটাই ঘটত। যা থেকে আলেপ্পোর মানুষদের জীবন কেমন ছিল তার পরিচয় পাওয়া যেত। ইসলামের শিক্ষা সেখানকার পুরুষ ও নারী

সকলের জীবন পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং একবিন্দু মানবিক আচরণ করতেও অক্ষম করে ফেলেছিল।

আহমদ স্ত্রীর প্রতি হিংস্র এবং নিষ্ঠুর আচরণের প্রেক্ষিতে আমার দাদুরই সমগোত্রীয় ছিল। আমি তাকে ঘৃণা করতাম। যেসব বিষয়কে আমি সর্বদা নিশ্চিতরূপে দেখতাম সে বিষয়ে প্রশ্ন করা শুরু করলাম। বানিয়াসে থাকার সময়ে জগৎ সম্পর্কে আমার যে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছিল তা যেন মুছে যেতে শুরু করল যতই ইসলাম এবং তার শিক্ষার বিরুদ্ধে আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হয়ে উঠছিল। যে সময়টুকু আমি আলেপ্পোতে ছিলাম, এবং বিশেষভাবে আহমদের পরিবারে আমার অভিজ্ঞতা, আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল যা পরবর্তী জীবনে ইসলামের পরিপ্রেক্ষিতে দৃঢ়মত এবং সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

*কাবা: মক্কায় পবিত্র একটি স্থান যার দিকে মুখ করে মুসলিমরা প্রার্থনা করে।

ইসলামি পুরুষদের জন্য আশার সন্ধান

১৯৭৭ এর গ্রীষ্মে আহমদের মাধ্যমে একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে আমার পরিচয় হয়। যখন এই ডাক্তার ভদ্রলোক জানলেন আমি ডাক্তারি বিদ্যার চতুর্থ বৎসরের ছাত্রী, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমি প্রতিদিন কয়েক ঘন্টার জন্য তার ডাক্তারখানায় কাজ করতে ইচ্ছুক কিনা। ডাক্তারখানাটি ছিল জনবহুল শহরতলী এলাকায়। প্রস্তাবটি আমার খুবই ভাল লাগল এবং আমি কাজে যোগ দিলাম। তার ডাক্তারখানায় আমি নিজের চোখে এমন বহু কিছু দেখেছি যা আহমদের বাড়ীতে এবং প্রতিবেশী মানুষদের বন্ধ দরজা জানালার পিছনে লুকানো থাকে। আমার কাজ অল্প কয়েকটি বিষয়ে নির্দিষ্ট ছিল। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অল্পবয়সী মেয়েদেরকে পরীক্ষা করা তারা গর্ভবতী কিনা এবং কুমারীত্ব অক্ষত থাকার শংসা দেওয়া। অধিকাংশ মেয়েই অবিবাহিতা এবং তারা তাদের মা কিংবা ঠাকুমার সাথে আসত যারা নিশ্চিত হতে আসতেন তাদের মেয়ে বা নাতনীর কুমারীত্ব অটুট। কখনওবা তারা নিজেরাই গর্ভবতী কিনা জানতে আসতেন। ডাক্তারের কাজ ছিল গর্ভপাত করা আর যারা কুমারীত্ব হারিয়েছে তা ঠিক করে দেওয়া।

রোগী এবং তার সঙ্গী এমনভাবে সর্বাঙ্গ বোরখায় মুড়ে আসত যেন হাত ছাড়া আর কিছু দেখা না যায়। অন্যে চিনে ফেলুক এই ঝুঁকি কেউ নিত না। পরীক্ষা ঘরে, যেখানে সেই মহিলা এবং তার মেয়ে অথবা নাতনি ডাক্তারের সাথে কথা বলত, সেখানে সব কাহিনীই ছিল এক। “ডাক্তারবাবু, আমার মেয়ে যখন ছোট ছিল তখন একবার পড়ে যায় এবং বেশ রক্তপাত হয়। এখন আমরা এসেছি নিশ্চিত হতে যে ও এখনও কুমারী, কারণ ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে”।

যখন ডাক্তার পরীক্ষা করে বলতেন যে মেয়েটির কুমারীত্বই শুধু যায়নি, সে এখন গর্ভবতী; তখন তারা কাঁদতে শুরু করত আর ডাক্তারকে করুণ অনুরোধ করত যেন তিনি এর সমাধান করে দেন।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অনেক জিজ্ঞাসার পরে অল্পবয়সী মেয়েটি স্বীকার করত যে শিশু বয়স থেকেই বহু বছর ধরে তার বাবা অথবা ভাই অথবা অন্য কোন পুরুষ আত্মীয় তাকে যৌন অত্যাচার করেছে। অধিকাংশ মেয়েরই সবে ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে আর প্রথম স্রাবের অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হয়েছে। কেউ ভাবতে পারেন যে, কোন অল্পবয়সী বিপদগ্রস্ত মেয়ের প্রতি একজন ডাক্তারের মনোভাব যত্ন এবং সহানুভূতিপূর্ণ হবে। এই অসুস্থ সমাজে নর-নারীর মধ্যে কোন সম্পর্কই নিপীড়ণ আর শোষণহীন হতে পারে না, এমনকি একজন পুরুষ ডাক্তার এবং মহিলা রোগীর মধ্যেও। প্রায়শঃই ডাক্তার এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিতেন এবং বিশাল অঙ্কের টাকা দাবী করতেন। মহিলা দু'জন পরদিন সেই টাকা নিয়ে আসত, হয়ত তাদের গয়না বিক্রি করে সেই টাকা তারা সংগ্রহ করেছে। এই নারীদের তাদের পুরুষ আত্মীয়দের হাতে যৌন এবং অন্য ধরণের লাঞ্ছনা সেইসাথে ডাক্তারের আচরণের নোংরা নাটক দেখে আমি অসুস্থ বোধ করতাম।

ডাক্তারখানার বাইরের পরিস্থিতিও মেয়েদের পক্ষে কোনভাবেই ভাল ছিল না। আমি নিজেও এই ধরণের লাঞ্ছনার শিকার হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল শহরের বাইরে। সাপ্তাহিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য প্রত্যেক ছাত্রীকে সপ্তাহে অন্তত দু'বার শহরে যেতে হত। একজন ছাত্রীর পক্ষে আবাসন থেকে শহরে যাওয়া ছিল অতি দুরূহ কাজ।

বাসে শহরে যেতে সময় লাগত প্রায় এক ঘন্টা আর সেই সময়টুকু ছিল অতি নিষ্ঠুর। বাস বেশ জনবহুল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেত আর দশ মিনিটের মধ্যেই সার্ডিন মাছের স্তূপের মত যাত্রীঠাসা হয়ে যেত। বাসে বেশীরভাগ মহিলা যাত্রী ছিল ছাত্রী, যারা মোট যাত্রীর সিকিভাগও নয়, তাদের নড়াচড়া ছিল হিংস্র বিড়ালের সামনে থেকে পালানো ইঁদুরের মত। কোন লোক কোন মহিলার গায়ের সাথে চেপে যাওয়ার

সুযোগ পাওয়ামাত্র তার যৌনাঙ্গ লোহার মত মেয়েটির পশ্চাৎদেশে চেপে ধরতো। প্রতিবাদের স্বর কখনো বা শোনা গেলেও দুঃখের বিষয় হচ্ছে শহরের বাসিন্দারা ছাত্রীদেরকে বেশ্যা মনে করত, সরল সোজা ব্যাপার।

বাস থেকে পথে নামলেও পরিস্থিতি সেই একই। আমাদের প্রতি ঘৃণা বিরামহীন। আপনি একজন নারী হলে সপ্তাহের যে কোন দিনই খোলা জায়গায় আপনার স্নায়ুতন্ত্র নিষ্পেশিত হবে, মানসিকভাবে আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবেন। বিশেষত শুক্রবার ছিল সবথেকে ভয়ঙ্কর দিন এবং ঐদিন আমরা বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতাম। সমস্ত বাস এবং রাস্তা থাকত মসজিদগামী পুরুষমানুষে পূর্ণ। এদের মধ্যে কোন একজন যদি তার সৌভাগ্যে কোন নারীর শরীরের সাথে নিজের শরীর চেপে দিতে পারত, কয়েক মূহুর্তের জন্য হলেও, সেইটুকু সময়ই যথেষ্ট তার বীর্যপাত ঘটার পক্ষে যার ফলে সে শান্ত মনে মসজিদে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারে।

শুক্রবারে আমি সাধারণতঃ আহমদ, হুদা এবং তার পরিবারের সাথে দুপুরের খাবার খেতাম এবং দিনের বাকী সময়টুকু ওদের বাড়ীতেই থাকতাম। প্রায়ই স্থানীয় মানুষদের এভাবে পিছিয়ে থাকা বিষয়ে ওদের সাথে তুমুল তর্ক বাধত। হুদা সাধারণত নিশ্চুপ থাকত আর আহমদ তার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে কোরাণ থেকে একটার পর একটা আয়াৎ বলে যেত বা নবীর বিভিন্ন বাণীর উদ্ধৃতি দিত। আর আমার মত যেসব মেয়েরা পরিবার ছেড়ে বাইরে থাকে তাদের নৈতিকতাকে অত্যন্ত ছোট করতে চেষ্টা করত। আমি কোনক্রমেই হার স্বীকার করতাম না তবে সেই সময় থেকেই আমি কঠিন এবং দৃঢ়চিত্তে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে শিখেছিলাম। সেই সময়ে এটাও আবিষ্কার করেছিলাম আমার সমাজের মানুষেরা কতটা নির্লজ্জ এবং তারা কত সহজে পরাজিত হতে পারে।

আহমদ এবং তার পরিবারের সঙ্গে আমি বেশ কয়েকটি বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। খুশী হওয়ার বদলে আমি আরও গভীরভাবে সমাজকে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল আমাদের সমাজ তার হাড়ে-মজ্জায় অসুস্থ।

বিয়েবাড়ীতে অভ্যাগতরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে থাকত; ছেলেরা একঘরে আর মেয়েরা অন্যঘরে। দুই দলই তাদের মত করে আনন্দ করত। মেয়েরা অত্যন্ত চোখধাঁধাঁনো পোষাক আর জমকালো গয়না পরত। তাদের পোষাক-আষাকই শুধু চমকে দেওয়ার মত ছিল না, সাধারণভাবে বলতে গেলে তারা যেন যৌনক্ষুধার্থ। আমি আমার জীবনে এমনটা কখনও দেখিনি। মহিলারা একে অপরের কাছে গিয়ে অস্বাভাবিক ভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করত। যেমন কারো পশ্চাতে বা বুকে চিমটি দিল বা দুই উরুর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। কেউই এমন আচরণে অবাক হত না বা এর প্রতিবাদও করত না। অনুষ্ঠানের শেষদিকে ঘোষণা করা হত যে বর এবার তার বধূকে আনতে যাচ্ছে। এটা শোনামাত্র মহিলারা তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় তুলে নিত এবং নিমেষের মধ্যে বড় রাস্তার ধারে সাজিয়ে রাখা ময়লার পাত্রর মত সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে যেত, কাউকে কারো সাথে আলাদা করা যেত না। কয়েক মূহুর্ত্তে তারা নিজেদেরকে সুন্দরী শাহজাদী থেকে কুৎসিৎ বস্তুতে পরিণত করে ফেলত যাকে মানুষরূপী ময়লার পাত্র ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। একটা অসুস্থ সমাজে প্রশিক্ষিত হয়ে তারা তাদের দেহ এমনভাবে ঢাকত যাতে পুরুষদেরকে লোলুপ করে তোলা যায়।

আমার দামাস্কাস ভ্রমণ ইসলামের পুরুষদের জন্য একটু আশার আলো দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বছরে এক গুড ফ্রাইডেতে আমার রুমমেট সিহাম তার এবং কৃষিবিদ্যার কিছু ছাত্রের সাথে দামাস্কাস যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। আমি আমার ছোট সৎবোনের বাড়ীতে থাকব বললাম। আমার বোন রাজধানীতে থাকত, তার স্বামী ছিল সিরিয় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার। আমরা পৌঁছলাম রাত্রিবেলা। আমাদের ব্যবস্থাপক আমাদের সাথে এক যুবককে পাঠালেন যাতে আমরা নিরাপদে আমার বোনের বাড়ী পৌঁছতে পারি। আমার বোন, তার স্বামী এবং তাদের সন্তানেরা খাবার টেবিলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমার ভগ্নীপতি দরজা খুলে আমাদেরকে আহ্বান জানালেন এবং আমাদের সঙ্গীকেও ভিতরে আসতে বললেন এবং একসঙ্গে খেতে অনুরোধ করলেন।

যুবকটির সাথে আমার ভগ্নীপতির রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সে চলে যাওয়ার পর ভগ্নীপতি বললেন, “ছেলেটি যথেষ্ট শিক্ষিত এবং রাজনীতি বিষয়ে ওর জ্ঞান, বয়স এবং অভিজ্ঞতার তুলনায় আশাতীত”। আমি এই কথা বা যুবকটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাবিনি।

দামাস্কাস একটি সুন্দর এবং প্রাচীন নগরী। এর বিভিন্ন দৃশ্য আমাকে বিমোহিত করছিল, সেজন্য অন্য ছাত্রছাত্রীদের হট্টগোলে যোগ না দিয়ে বাসের জানালা দিয়ে দু'পাশের দৃশ্য দেখছিলাম। সেই অপরিচিত যুবকটি, যে আমার বোনের বাড়ীতে আমাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করেছিল, আমার আশেপাশেই ঘুরছিল। মুসলিম পুরুষদের সম্বন্ধে আমার ধারণা সত্ত্বেও আমি আমাদের দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বাড়াতে পারছিলাম না।

সপ্তাহান্তিক ছুটি শেষ হতেই আমরা আলেপ্পো ফিরে আসি এবং সিহাম তার গ্রামের বাড়ীতে পরিবারের কাছে গেল। আমি ঘরে একা বসেছিলাম, এমন সময় বেল বাজল। আমি তাড়াতাড়ি একতলায় নেমে এসে দেখি সেই ছেলেটি যে দামাস্কাস ভ্রমণে সমস্ত সময় আমার কাছাকাছি থাকত। অবাক হয়ে ভাবলাম, “ও কি আমাকে অনুসরণ করছে?” আমি অভ্যর্থনা জানাতেই সে তার তোলা আমাদের বেড়ানোর কয়েকটা ছবি দেখাল। ও ঠিক কি চাইছে তা না বুঝে অত্যন্ত দ্বিধাশঙ্কিত মনে প্রায় তোতলাতে তোতলাতে আমি বললাম, “সিহাম তো এখানে নেই, তবে ও ফিরলে আমি ছবিগুলি ওকে দিয়ে দেব”। সে বলল, “আমি সিহামের সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আর এই ছবিগুলি তোমার জন্য উপহার হিসাবে এনেছি কারণ তুমি এর অনেকগুলিতে আছ”।

হঠাৎই আমার মধ্যে কি ঘটে গেল জানিনা। তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি যেন একটা ধাক্কা অনুভব করলাম, সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। একজন মুসলিম নারী হিসেবে এই প্রথম আমি একাকী কোন যুবকের সাথে কথা বললাম। আমি হতবুদ্ধি মানুষের মত তাকে আমার সাথে ছাত্রদের জন্য রেস্তোঁরায় আসতে অনুরোধ করলাম যেখানে আমরা চা খেতে পারি।

আমি যতদিন বাঁচব সেই সাক্ষাতের কথা কখনো ভুলব না। তার নাম মোরাদ, আমার স্বামী এবং সন্তানদের পিতা। আমরা প্রথা উপেক্ষা করে দেখা করেছিলাম যে প্রথা একটি যুবতী মেয়েকে অচেনা কোন যুবকের সাথে খোলা যায়গায় কথা বলার অনুমতি দেয় না। সেই কয়েকটা মিনিটে আমি অনুভব করছিলাম আমি প্রথাবিরোধী কাজ করছি। যে প্রথা ভাঙছে সে যেন নিজেকেই ছাপিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবনা আমার মনে একটা সূক্ষ্ম পাপবোধ সৃষ্টি করল। কিন্তু চা খেতে খেতে তার সঙ্গে কথা বলা, ছবি দেখা যেন আশ্চর্য আনন্দদায়ক অনুভূতি। আমরা এরপর থেকে আরও বেশী সময় একসঙ্গে কাটাতে থাকলাম। আমরা সবসময়েই খোলা জায়গায় দেখা করতাম। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্তোঁরায়, অথবা বাসে যে বাস আমাদের আবাসন থেকে শহরের মধ্যে যাতায়াত করত। মোরাদের সাথে সম্পর্ক আমার আলেপ্পোর জীবনটাকেই বদলে দিল। এটা আমার জীবনে এতটাই বড় হয়ে উঠল যে এ ঘটনা আহমদ, হুদা ও তাদের পরিবারের কাছে গোপন রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। আর সেখানেই আমরা সবথেকে বড় বাধার সম্মুখীন হলাম। কারণ যে মূহুর্তে তারা আমার আর মোরাদের সম্পর্কের কথা জেনেছিল তখন থেকেই তারা আমার সমস্ত বিষয়ে নাক গলাতে শুরু করল। তারা ভয় দেখাতে শুরু করল যে আমার ভাই এবং পরিবারকে বলে দেবে, আর আমি আমার স্বাভাবিক বেপরোয়া ভঙ্গীতে তাদের এই ভয় দেখানোকে উপেক্ষা করলাম।

যদিও মোরাদ সারাজীবন আলেপ্পোতে কাটিয়েছে তবু সে যেন শহর জীবন থেকে দূরে একক জীবনের মানুষ ছিল। যখন সিরিয়া ফরাসীদের অধীনে ছিল তখন তার বাবা ছিলেন ফরাসী সেনাবাহিনীর সৈনিক। ১৯৪৭ সালে ফরাসী বাহিনী সিরিয়া ছেড়ে চলে গেলে নবগঠিত সিরিয় জাতীয় বাহিনী ফরাসী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহু সৈন্যকে রেখে দিল কিন্তু যারা বয়স্ক তাদেরকে চাকরী থেকে অব্যাহতি দিল যাদের মধ্যে তার বাবাও ছিলেন। মোরাদের জন্ম ১৯৫৩ সালে। তখন তার বাবার বয়স চল্লিশের কিছু বেশী। তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন দুই কন্যার পর পুত্রের জন্ম হওয়াতে। তার বাবার জর্জ নামে এক বন্ধু ছিলেন যিনি শহর থেকে একটু দূরে বাস করতেন। তিনি ছিলেন

খ্রীষ্টান। জর্জ একটা ব্যবসা শুরু করেছিলেন আর সেখানে আমার স্বামীর পিতাকে বিক্রির কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সম্মানের মধ্য দিয়ে দু'জনের ভিতর গাঢ় বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। আমার স্বামী আজও জানে না কিভাবে যেন তার বাবা বুঝেছিলেন তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসছে আর সেকারণেই তিনি জর্জকে বলেছিলেন যদি তাঁর কিছু ঘটে যায় তিনি যেন তাঁর ছেলেটিকে দেখেন।

তার বাবার ধারণা আশ্চর্যভাবে সত্যি হয়ে দেখা দিল: তিনি হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মারা যান **১৯৫৬** সালে যখন আমার স্বামীর বয়স তিন বছর। তার বড় বোনের বিয়ে হয় তেরো বছর বয়সে, বাবার মৃত্যুর কয়েকমাস আগে; আর তার একবছর পর তার ছোট বোনের বিয়ে হয় যখন তার বয়স এগারো। ফলে আমার স্বামী তার তিন বছর বয়স থেকে মায়ের সাথে একা থাকতে বাধ্য হয়।

আমার স্বামীর বর্ণনা অনুযায়ী তার মা ছিলেন একজন পাগলাটে মহিলা। তার ভাষা ছিল তীব্র। সম্পূর্ণ ভারসাম্যহীন মানুষ। তিনি জর্জের সাথে ঝগড়া করতেন তাকে জোচ্চোর এবং লোভী বলে অভিযোগ করে। তা সত্ত্বেও জর্জ চেষ্টা করতেন আমার স্বামীর বাবা যে অনুরোধ করেছিলেন তা রক্ষা করতে এবং একজন পিতার ভূমিকা পালন করতে। মোরাদের মায়ের আচরণজনিত প্রচুর সমস্যা সত্ত্বেও। তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে দু'দিন দেখতে আসতেন কিছু উপহার নিয়ে। আমার স্বামীর ছোটবেলার বাড়ীর চারপাশে সবাই ছিল মুসলমান আর তার মধ্যে জর্জের স্যুট, টাই আর ছোট পশমী টুপি পরা চেহারা দেখে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে খ্রীষ্টান বলে বোঝা যেত। বাচ্চা ছেলে হিসেবে আমার স্বামী জর্জের এই আসায় খুশী হত এবং উপভোগ করত। কিন্তু সেইসঙ্গে এই আসা তার কাছে লজ্জা আর বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়াত। সব স্থানীয় বালকই ছিল মুসলিম, তারা তাদের বাড়ীতে যা শুনত সেই কথাগুলি নির্দয়ভাবে তাকে বারবার বলত। বালক হিসেবে আমার স্বামী তাদের বিরামহীন প্রশ্ন সহ্য করতে পারত না: "ঐ খ্রীষ্টান লোকটা কে?" "তোমরা ওকে বাড়ীতে আসতে দাও কেন?" "তোমাদের ভয় করে না যে ও তোমাদেরকে খ্রীষ্টান বানিয়ে ফেলবে?"

খ্রীষ্টানদের প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের ঘৃণা আর জর্জের প্রতি আকর্ষণ আমার স্বামীর শিশুমনে একই সাথে সক্রিয় ছিল, তার মা তার মনের এই ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করে তার অনিষ্ট করত যা একজন নিষ্ঠুর মায়ের পক্ষেই সম্ভব। যে সমাজ নারীকে শিকার হিসেবে দেখে, একজন অল্পবয়সী বিধবা হয়ে সেই সমাজে বেঁচে থাকার ক্ষমতা যার খুবই সীমিত, তিনি আমার স্বামীর লজ্জার পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিতেন। যখন তার বাবা মারা যান, তখন তারা বাস করত শহর থেকে বেশ দূরে ফরাসী বাহিনীর ফেলে যাওয়া কাঠ আর ধাতু দিয়ে তৈরী একটা ঘরে। ফরাসীরা চলে যাওয়ার পর সিরিয় জাতীয় বাহিনী সৈন্যাবাসের দখল নেয়। বাড়ীগুলির বাসিন্দারা ঘর ছেড়ে চলে যায়, যে ঘরগুলি সময়ের সাথে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের ঘরটি দাঁড়িয়ে ছিল জনবসতি এলাকা থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে জনমানবশূন্য মিলিটারী এলাকায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। বিধবা হওয়ার পর আমার স্বামীর মা একটি তামাকের কারখানায় কাজ করতেন। তিনি ভোরে বেরুতেন আর ফিরতেন সন্ধ্যার পর। ফেরার পরই তার মারমুখী কথা আমার স্বামীকে ধ্বংস করা শুরু করে দিত। অজস্র অভিশাপ দিতেন আর কিছু কিছু কাজ না করে রাখার কারণে শাস্তি হিসেবে প্রচণ্ড মারতেন। ছেলের যন্ত্রণাদীর্ণ মনের প্রতি দৃকপাত না করে তাকে ব্যবহার করতেন শুধুমাত্র পেটানোর জন্য।

অধিকাংশ শহরের মত, আমরা এখন যাকে বলি "gentrification" (শহরের উপকণ্ঠে বাস করা দরিদ্র মানুষদেরকে সরিয়ে মধ্যবিত্ত ও ধনী মানুষদের বসতি স্থাপন) এর ঘটনা শুরু হল আর আলেপ্পোর ধনী বাসিন্দারা অপেক্ষাকৃত জনবিরল জায়গা খোঁজা শুরু করল ও দ্রুত আমার স্বামীর বাড়ীর আশেপাশে বসবাস শুরু করল। তাদের বাড়ীর সব থেকে কাছের স্কুলটি ভরে গেল অত্যন্ত ধনী পরিবারের বালক বালিকাতে আর সে সেখানে রয়ে গেল দুষ্ট ক্ষতের মত। এই শ্রেণী বৈষম্য যেন তাকে পিষে দিল। তার মনে পড়ে ওর মা বলত, "ওই বাড়ীগুলো আমাদের দিকে ঠেলে আসবে যতদিন না আমরা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই"। আজ পর্যন্ত

যখনই সে কোন গৃহহীন মানুষকে দেখে, হাত দিয়ে মুখ ঢাকে যাতে ঐ লোকটার জায়গায় নিজেকে ভাবতে না হয়।

মায়ের ছুটির দিনে সে মায়ের সাথে স্থানীয় বাজারে যেত। তার মা তার প্রতি যত নিষ্ঠুরই হোন, তার মায়ের সাথে দোকনদাররা যে ব্যবহার করত তাতে তার মনে খুব লাগত। তারা তার মায়ের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিত, সত্য এই যে, পুরুষ অধ্যুষিত পরিবেশে তিনি একজন নারী। তারা বেশী দাম নিত আর তিনি যখন তাদের সাথে দরদাম করতেন আর ঠকানোর অভিযোগ করতেন, তখন তারা যে ভাষায় গালি দিত তা আমার স্বামী সেই অল্প বয়সে সহ্য করতে পারত না। যেন তারা চিৎকার করে বলত, "বাড়ী গিয়ে ঘরের ভিতরে লুকিয়ে থাক বেহায়া মাগী! তোর স্বামী কোথায়? সে তোকে ব্যাটাছেলেদের মাঝে আসতে দিয়েছে কেন?" মোরাদ অল্প বয়সেই তার জগতের সত্যি চেহারাটা চিনেছিল এবং কোনদিনই নিজেকে সেই জগতের সাথে মেলাতে পারেনি। যে নিষ্ঠুর মহিলা তার মনটাকে দূষিত করে দিয়েছিল, সেই মায়ের প্রতি তার সহানুভূতিই ছিল, এবং সে তাকে স্পষ্টভাবে মুসলমান সমাজের অসহায় শিকার বলে মনে করত।

হাই স্কুলে পড়ার সময়ে সে বাথ পার্টিতে যোগ দেয়। তখন ঐ দলটি যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব হাই স্কুলের ছাত্রদের সংগ্রহ করছিল। দরিদ্র পরিবার থেকে আসা ছেলেরাই যোগ দিতে বেশী আগ্রহী ছিল। সে এই দলের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিল কারণ দলটি ছিল অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান—অন্তত বাহ্যিকভাবে—ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন। দলটির বক্তব্য তাদেরকে উন্নততর জীবন ও সমান সুযোগের মরীচিকা দেখিয়েছিল। সেই কৈশোর বয়সেই সে আপাদমস্তক পার্টির রাজনৈতিক কার্যকলাপে ডুবে যায় এবং অন্য সদস্যদের সাথে কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে নিজেকে চিনতে শুরু করে। স্কুলের পর সে সোজা চলে যেত সদস্যদের মিটিং-এ। বুঝতে পারছিল মায়ের সাথে তার জীবন এতদিন কোন বিষয় থেকে তাকে দূরে রেখেছিল। সে এমনকিছু খুঁজে পেয়েছিল যার জন্য বেঁচে থাকা যায়। দলের বক্তব্য এবং কর্মসূচী তাকে তীব্র ইহুদী-বিরোধী করে তোলে এবং ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।

যে অসুস্থ সংস্কৃতিতে সে গিয়ে পড়েছিল তার দ্বারা মগজধোলাই হয়ে সে বিশ্বাস করতে শুরু করে, ইহুদী-নিধন এবং তাদেরকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা তার বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ।

সে মায়ের সাথেই থাকত কিন্তু বাস করত সম্পূর্ণ নিজের জগতে, স্বপ্ন দেখত সে জগতে তার নিজের জীবন চালানোর মত একট চাকরী থাকবে; ডিম-রুটি নিয়ে মায়ের ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। হাই স্কুল পাশ করে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা নিয়ে ভর্তি হয়। ঐ সময়ে একটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকের সহকারী হিসেবে সে কাজ পায়। কিন্তু তার শিক্ষক হওয়ার আনন্দ ম্লান হয়ে যায় একটি কারণে: প্রতিদিন কমপক্ষে একঘন্টা তাকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতে হত।

ক্লাস চলাকালীন যখন সে খ্রীষ্টান ছাত্রদেরকে ক্লাসের বাইরে যেতে বলত, তার মনে হত সে যেন তার মনুষ্যত্বকে বরবাদ করে ফেলছে। ধর্মীয় শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে তার খামতি নিয়ে বহু অভিভাবক তার বিরুদ্ধে স্কুল প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করত। কিন্তু সে তাতে কর্ণপাত করত না কারণ্ সে জানত বাথ পার্টির সদস্যপদের কারণে সে শক্ত জায়গায় আছে। এইসব অভিযোগের জন্য তাকে একদিনের জন্যও কাজ হারাতে হয়নি। সেই সময়ে ইসলাম বাথ পার্টির তুলনায় দ্বিতীয় স্থানে নেমে গিয়েছিল। ১৯৬০ এর দশকের শেষ থেকে ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সিরিয়া এমন একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায় যখন ইসলাম সম্পূর্ণভাবে তার প্রভাব হারায়, অন্তত স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সৌদি অক্টোপাশ ধীরে ধীরে সিরিয় জনজীবনে তার থাবা বাড়াতে থাকে, যা আজ অবধি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘটিয়ে চলেছে।

মোরাদের জীবন ছিল খুবই কঠিন আর আমি জানতাম সবচাইতে যে ভালটুকু আমি তার জন্য করতে পারি সেটা হল যখনই সে তার যন্ত্রণাক্ত স্মৃতি কারও কাছে বলতে চাইবে তা যত্নসহকারে মন দিয়ে শোনা। একদিন সে আমাকে বলল, "শোন ওয়াফা! একজন নারী—আমার মা—আমাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে; আর আজ আমি অন্য এক নারীকে খুঁজছি—আমার স্ত্রী—যে সেই টুকরো গুলোকে

আবার নতুন করে জুড়ে দিতে পারবে! আমার মা আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে, আমি বিশ্বাস করি তুমি আমাকে পুনর্জীবন দিতে পার"। আমি আজও তাকে পুনর্গঠিত করে চলেছি। আমি জানি বহু নোংরামনের মহিলা এ নিয়ে বিদ্রূপ করে, কিন্তু আমি সত্যিই মায়ের দ্বারা নিঃশেষিত এক মানুষকে বিয়ে করেছিলাম। আমি আজও তাকে নতুন করে গড়ার চেষ্টা করে চলেছি। মোরাদের মায়ের বিরুদ্ধে আমার সামান্য অভিযোগও নেই, কারণ আমি মনে করি, মোরাদের যন্ত্রণার জন্য তিনি কোনভাবেই দায়ী নন। তিনি ছিলেন তাঁর সমাজ এবং সেই সমাজের বিশ্বাসের শিকার মাত্র। আর আমার স্বামী ছিল সেই শিকারের নিজের শিকার।

অন্য এক ঈশ্বরের খোঁজে

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পঞ্চম বছরে, ১৯৭৯ সালে, কিছু ঘটনা ঘটে যা আমার জীবনকে বদলে দেয়। সেই বছরে এক ভয়ানক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধে সিরিয় প্রশাসন অর্থাৎ শাসক পরিবার ও পরিবারের সদস্যরা, এবং সিরিয়ার মুসলিম ব্রাদারহুডের সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে। সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি আলাওয়াইট মুসলিম গোষ্ঠীর মানুষ। একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যার নামকরণ হয়েছে আলির নামে। আলি ছিলেন নবী মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নবীর মৃত্যুর পর চতুর্থ খলিফা। সিরিয়ার মোট জনসংখ্যার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছিল আলাওয়াইট, দেশের সুন্নী জনগোষ্ঠীর পরই বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায়। আলাওয়াইট হাফেজ আল-আসাদ সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে আলাওয়াইটরা ছিল সিরিয়ার দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী। সিরিয়াতে অটোমান অধিগ্রহণের আগে বেশীরভাগ আলাওয়াইটরা বাস করত আলেপ্পোতে। আমি ডাক্তারিবিদ্যার ছাত্রী হিসেবে যে শহরে থাকতাম সেই আলেপ্পো ছিল দেশের উত্তরদিকে তুরস্ক সীমান্তের কাছে। যখন অটোমান সৈন্যরা সিরিয়ার উত্তর সীমান্ত দিয়ে ঢোকে তখন তারা আলাওয়াইট গোষ্ঠীর বেশীর ভাগ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। যারা পালিয়ে বাঁচতে পেরেছিল তারা উপকূল অঞ্চলের দিকে চলে যায় এবং মধ্য সিরিয়ার পার্বত্য এলাকা আর সমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গায় বসতি স্থাপন করে। রুক্ষ পার্বত্য গভীর খাদে প্যাঁচানো ভুখণ্ড অবশিষ্ট ছন্নছাড়া পলাতক আলাওয়াইটদের আশ্রয় দিল। তারা গুহায় লুকিয়ে থাকত। নতুন আবাসস্থলে

আলাওয়াইটরা শিকার হয়েছিল তীব্র দারিদ্রের, অবহেলার এবং হামলাকারী অটোমান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী উভয়ের অত্যাচারের। ফরাসী শাসনাধীনে তারা অনেক স্বাধীনভাবে বাঁচত, কারণ তারা স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিয়েছিল।

১৯৪৬ সালে যখন ফরাসী সৈন্যরা চলে গেল তখন আলাওয়াইটরা অটোমান শাসনের থেকেও খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। ১৯৪৬ এ সিরিয়া স্বাধীন হয়। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৩, এই সময়ে বাথ পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে আলাওয়াইটরা ভয়ঙ্কর কষ্ট আর নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকার হয়। পাহাড়ী গুহায় অবরুদ্ধ হয়ে প্রায় প্রস্তর যুগের মানুষের মত আদিম জীবন যাপন করত। সিরিয়ার উপকূলবর্ত্তী শহরগুলিতে যাওয়ার কোন রাস্তা ছিল না। নিহত হওয়ার ভয়, নারীদের ধর্ষিত হওয়ার ভয় এবং তাদের পশু ও শস্যদ্রব্য লুঠ হওয়ার ভয় তাদের আবদ্ধ রাখত সেই পার্বত্য দুর্গে।

বাথ পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় কিছু সিরিয়ার মানুষের দ্বারা, প্রধানত খ্রীষ্টান এবং আলাওয়াইট, যারা দেশের শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়। প্রকৃতপক্ষে পার্টির জন্ম হয় সুন্নী সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে সিরিয়ার সংখ্যালঘু মানুষের উপর ধর্মীয় ও সামাজিক অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। আর প্রধানত মুসলিম এবং অমুসলিম সংখ্যালঘুরাই এর সুফল লাভ করে। ১৯৬৩ সালে এরা ক্ষমতায় আসার পর বেশ কিছুদিন বাথ পার্টির লোকেরা একটা সৎ প্রচেষ্টা নিয়েছিল বহু মানুষকে পক্ষপাতশূন্যভাবে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিকবৈষম্য ও শ্রেণীবৈষম্য থেকে সিরিয়াকে মুক্ত করার। পার্টির মূল লক্ষ্য ছিল সিরিয়াকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠা করা আর তাদের বাণী ছিল, "ধর্ম ঈশ্বরের জন্য আর দেশ সবার জন্য"। অচিরেই আলাওয়াইট যুবকরা বিপুল সংখ্যায় পার্টিতে যোগ দিল কারণ তারা অনুভব করল, তীব্র কষ্ট আর দারিদ্র থেকে মুক্তির একমাত্র অবলম্বন হল বাথ পার্টি। ভাগ্যবলে কয়েকজন উচ্চ পদে আসীন হয়। হাফেজ আল-আসাদ এদেরই একজন, যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৬৩ সালে বাথ পার্টির ক্ষমতালাভ থেকে সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে আলাওয়াইটদের যথেষ্ট উন্নতি হয়, তাদের এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধারও উন্নতি হয়। আলাওয়াইট গোত্রের মানুষেরা দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে থাকে এবং দেশের সব থেকে শিক্ষিত গোষ্ঠী হয়ে ওঠে। কিন্তু হাফেজ আল-আসাদের ক্ষমতা অধিগ্রহণে এ সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে যায়। তিনি নিজে যে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষ তাদের উপর অত্যাচার তাকে শঙ্কিত করে তোলে। তিনি তার নিজের গোত্রের বাইরের কাউকে বিশ্বাস করতেন না। নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি তার গোত্রের দিকে নজর দিলেন। তিনি আলাওয়াইটদের উৎসাহ দিলেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে। এতে তারা জীবনযাত্রার এমন মাত্রায় পৌঁছল যা তারা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেনি।

হাফেজ আল-আসাদের ভাই রিফাত দাদার সিংহাসন রক্ষার জন্য একটি বিশেষ সেনাগোষ্ঠী তৈরী করে যার নাম ছিল 'প্রতিরক্ষা দল'(Defense Companies)। একই সময়ে আলি হায়দার নামে অন্য এক আলাওয়াইট অফিসার 'বিশিষ্ট শক্তি'(Special Foces) নামে আর একটি সেনাগোষ্ঠী তৈরী করে। উভয়েই উদীয়মান আলাওয়াইট প্রজন্মকে উচ্চপদের প্রলোভন দিয়ে আকর্ষণ করার চেষ্টা শুরু করলেন। এই নতুন প্রজন্মের কাছে শিক্ষার চেয়ে সুযোগের প্রলোভন অনেক বেশী আকর্ষনীয় মনে হল। তারা বিপুল সংখ্যায় দুই গোষ্ঠীতে যোগ দিল যাদের কাজ হল হাফেজ আল-আসাদের সিংহাসন ও শাসন ক্ষমতা রক্ষা করা।

যে আলাওয়াইট গোত্র সব থেকে শিক্ষিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে গিয়েছিল এবং সিরিয়ার মানুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ সমাজ সচেতন হয়ে উঠছিল, হাফেজ আল-আসাদের অধীনে তারা যুদ্ধপ্রিয় হয়ে উঠল। নব প্রজন্ম যুদ্ধবাজ হয়ে ওঠায়, বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষিত শ্রেণী যারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত এবং অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত যুদ্ধবাজ শ্রেণীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হল। নতুন এক যুদ্ধ শুরু হল এই দুই শ্রেণীর মধ্যে। হাফেজ আল-আসাদ শিক্ষিত শ্রেণীর বহু মানুষকে ধরে কারাগারে ভরলেন।

আর একবার শিক্ষিত শ্রেণী নিজেদেরকে অবহেলিত এবং নিপীড়িত হতে দেখলেন আর যারা কোনক্রমে জেলে যাওয়া থেকে বাঁচলেন তারা হয় দেশত্যাগ করলেন অথবা রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ সরে গেলেন। তার অনুসারী আলাওয়াইটদের কাছ থেকে হাফেজ আল-আসাদ চাইতেন অন্ধ আনুগত্য আর যারা তাকে অমান্য করল তাদের জন্য রইল শানিত অস্ত্র। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপেক্ষা কোন অংশে কম ভয়ঙ্কর ছিল না, যে মুসলিম ব্রাদারহুড আসাদের শাসনের প্রথম দিন থেকেই ওত পেতে ছিল।

আসাদ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নীদেরকে তোষণ করা শুরু করলেন যাতে তারা তাকে ত্যাগ না করে। তিনি সুন্নী মৌলবী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের সমর্থন পেতে চেষ্টা করলেন। সিরিয়ার মুফতি* এবং অন্য সুন্নী মৌলবীরা আসাদের ঘনিষ্ঠ সহচর হয়ে উঠল। সেইসঙ্গে ছিল তার শাসনাধীনে থাকা সবচেয়ে ভাল বক্তারা। মুসলিম ব্রাদারহুড ছিল একটা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী মুসলমানরা একে পরিত্যাগ করে। অবশ্য আসাদের শাসনে সমাজজীবনের সর্বস্তরে যে কুৎসিৎ দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল ব্রাদারহুড তার পূর্ণ সুযোগ নিল। দুর্নীতি ক্রমাগত বেড়েই চলছিল আর আসাদ সেটাকেই আলাওয়াইটদের অনুগ্রহ পেতে প্রধান অস্ত্র করে তুলল। সরকারী মন্ত্রণালয়ে ঘুষের ব্যাপক প্রসার ঘটল, অধিকাংশ সিরিয়দের জীবনযাত্রার মান নেমে গেল আর সম্পদ কেন্দ্রীভূত হল শাসক পরিবারের সদস্য ও তাদের ঘনিষ্ঠদের হাতে। যদিও এই অল্প সংখ্যক ধনীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ ছিল তবে সিংহভাগই ছিল আলাওয়াইট।

অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও বাথ পার্টি মুসলিম ব্রাদারহুডের সন্ত্রাসের আগুন অনেকটা স্তিমিত করতে সফল হয়েছিল, ঠিক তখনই সত্তর দশকের মাঝামাঝি সৌদি আরবের টাকা বৃষ্টির মত এসে সেই আগুনকে নতুন করে উসকে দেয়। আমার বেশ মনে আছে আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি, ১৯৬৮ সালে বাথ পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে কোন ভূমিকা নেবে না

যেমন নেয় গণিত বা বিজ্ঞানশিক্ষা। যদিও পার্টি ধর্মীয় শিক্ষাকে একেবারে দূর করতে পারেনি কিন্তু তার গুরুত্ব খর্ব করতে পেরেছিল, আর সেটাই ছিল পাঠ্যসূচি থেকে ধর্মীয় শিক্ষাকে তুলে দেওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাথ পার্টি যখন ইসলামের প্রসাররোধে প্রথম পদক্ষেপ নিল ঠিক তখনই হাফেজ আল-আসাদ ক্ষমতায় আসে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ার কারণে তিনি এ রকম পদক্ষেপ আর নিতে পারেননি; বরং, যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নীরা মুসলিম ব্রাদারহুডের জন্মদাতা তদের ভয়ে সৌদি সাহায্যপুষ্ট ইসলামের প্রসারে চোখ বন্ধ করে রইলেন। একটা প্রচ্ছন্ন চুক্তি হল: "তুমি আমার দিকে চোখ বন্ধ রাখ, আমিও তোমার দিকে চোখ বন্ধ রাখব"।

দুর্নীতি যেমন শাসক অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল তেমনি সৌদি ওয়াহাবিজম সুন্নী জনগণের মধ্যে দাঙ্গা বাধাল। উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল যে কোন পক্ষই তাদের নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবল না। সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি আর তার পারিষদবর্গ যখন কোটি কোটি ডলার দেশের বাইরে পাচার করছিল এবং নির্লজ্জ সম্পদের জীবন ভোগ করছিল তখন সর্বস্তরের সিরিয়াবাসী বীভৎস দারিদ্রে ডুবে ছিল।

সুন্নীরা বুঝল তারা প্রতারিত হয়েছে এবং মুসলিম ব্রাদারহুডকে বরণ করে আনল, যে মুসলিম ব্রাদারহুড বিপুল সৌদি অর্থানুকূল্যে ইসলামি শিক্ষা গিলে বদহজমে পৌঁছে গিয়েছে। এমন আশা করে নয় যে তারা তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাবে বরং এই আশাতে যে, যারা তাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। সমগ্র আলাওয়াইট গোষ্ঠী বলির পাঁঠা হয়ে গেল। আর শিক্ষিত শ্রেণী যাদের বেশীর ভাগকে আসাদ জেলে ভরেছিলেন তাকে অমান্য করার কারণে, তারা হয়ে গেল ইসলামি সন্ত্রাসের সহজ শিকার। এই শ্রেণীর মানুষদের আত্মরক্ষার কোন উপায়ই রইল না, মুসলিম ব্রাদারহুডের গোপন সশস্ত্র বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক, বিচারকদের খুঁজে বের করে একের পর এক নির্দয়ভাবে খুন করল যখন আসাদ-প্রশাসন নীরব হয়ে রইল এবং সমস্ত ঘটনা উপেক্ষা করল।

আমার মনে আছে এই অরাজকতার সময়ে গুজব ছড়িয়েছিল যে মুসলিম ব্রাদারহুডের মাধ্যমে আসাদ পরিবার সৌদি আরবের সাথে সমঝোতায় আসে যে ব্রাদারহুড আসাদ এবং তার পরিবারের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ না করলে আসাদ তাদের বিষয়ে চোখ বুঁজে থাকবে। বাস্তবে এটাই ঘটেছিল আর সিরিয়ার মানুষরা যেন টম-জেরীর কার্টুন দেখছিল। সংঘর্ষ ঘোরতর হয়ে উঠল যখন মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি অংশ আসাদের এক কনভয় আক্রমণ করে এবং গুলি চালায়। তারা কনভয়ের উপর বোমা ফেলে, যার ফলে আসাদের এক সঙ্গী নিহত হয় তবে আসাদ অলৌকিক ভাবে বেঁচে যায়। ১৯৭৯ সালের এই ঘটনা সর্বব্যাপী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল, সিরিয় প্রশাসন শুরু করল নির্দয় গণহত্যা। তারা সিরিয়ার একটি শহর হামা আক্রমণ করে, যেটি মুসলিম ব্রাদারহুডের চিরাচরিত শক্ত ঘাঁটি, এবং ট্যাঙ্ক দিয়ে ধূলিস্যাৎ করে দেয়। তারপর সিরিয়ার অন্যান্য শহরে লুকিয়ে থাকা পরাজিতদের অবশিষ্টকে ধাওয়া করে। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ প্রায় দু'বছর চলেছিল এবং বহু সিরিয় যারা প্রশাসন বা ব্রাদারহুড কোনপক্ষেই জড়িত নয় তারা এই ঘটনার অন্যতম প্রধান শিকার। রাষ্ট্রপতির জীবনের উপর আক্রমণের কারণে, যা কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য করা হয়নি, প্রশাসন ব্রাদারহুডকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

১৯৭৯ সালে, যখন আমি মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বছরে, আমাদের চক্ষুবিদ্যার অধ্যাপক ড. ইউসেফ আল-ইউসেফকে খুন হতে দেখেছিলাম। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি কাকে খুন করা হয়েছে। চারিদিক থেকে গুলির শব্দে আশপাশের সবাইকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দিয়েছিল, সেই সাথে ছিল লাউডস্পিকারে খুনীর চিৎকার: "আল্লাহু আকবর...আল্লাহু আকবর!"*

ভয়ের পরিস্থিতি কিছুটা কমে গেলে আমি জানলাম হতভাগ্য মানুষটি তিনি যাঁকে আমি নীতি এবং মনুষ্যত্বের আদর্শ বলে ভাবি—ন্যায়বান, উদার এবং সংস্কৃতিবান একজন মানুষ। তিনি ছিলেন দরিদ্র পরিবারের মানুষ যে পরিবার সর্বস্ব দিয়ে তাঁর ইউরোপে ডাক্তারি পড়ার খরচ যুগিয়েছিল। পড়া শেষ করেই তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ঈশ্বরের মাহাত্ম্য

প্রকাশ করে খুনীর চিৎকার মিশে গিয়েছিল গুলির শব্দের সাথে। সেইদিন থেকে আল্লাহ শব্দটি আমার কাছে গুলির শব্দের সমান হয়ে গিয়েছে আর এমন এক ঈশ্বরে পরিণত হয়েছে যার মানুষের জীবনের প্রতি কোন সম্মানবোধই নেই। সেই সময় থেকে আমি অন্য এক ঈশ্বরকে খুঁজে চলেছি—যে ঈশ্বর মানুষের জীবনকে সম্মান করে এবং প্রতিটি মানুষকে মূল্য দেয়।

ঈশ্বরের কি অস্তিত্ব আছে? তার প্রভাব আমি যেটুকু অনুভব করতে পারি, তাতে তার অস্তিত্ব আমাকে মেনে নিতে হয়। একাধিকবার আমি নিজেকে নাস্তিক আখ্যা দিয়েছি, যে কোন অতিন্দ্রিয় বা অলৌকিক বিষয় বিশ্বাস করে না। স্বাভাবিকভাবেই কিছু মানুষ আমার ভাবনাকে অবোধ্য বৈপরীত্য বলে ভাবে। উত্তরে আমি বলব: ইসলামের কারাগারে আমার সারা জীবনে ঈশ্বরকে কখনও দেখিনি, তার প্রভাব অবশ্যই দেখেছি এবং সেই প্রভাবকে নিঃশেষ করতে হলে আমাকে ধরে নিতে হবে সে আছে। যখন একটি শিশু তার বিছানার নীচে রাক্ষস আছে ভেবে ভয় পায়, তার ভয়ের কষ্টটা ঠিক তেমনই হয় যেমন হত সত্যিই রাক্ষস থাকলে। যে জিনিসকে আমরা সত্যি বলে ভাবি, আমাদের উপর তার প্রভাব সত্যির মতই, এমন কি তা নিতান্ত ভ্রম হলেও।

আমি যেমন বুঝি, ঈশ্বরের জন্য আমাদের প্রয়োজনের অনুভূতি থেকেই ঈশ্বরের সৃষ্টি, যে প্রয়োজন অন্য কোন ভাবেই পূরণ হয় না। আমার মতে, ঈশ্বরই সেই বস্তু যার দ্বারা ওই প্রয়োজন মেটে। মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তার বৌদ্ধিক এবং মানসিক শূন্যতা ভরাট করতে যা অন্য কোন বাস্তব উপায়ে সম্ভব নয়। ঈশ্বর যেন একটা চাবি, তা দিয়ে আমরা যে তালা খুলতে চাই সেটাই খুলতে পারি।

একটা উদাহরণ দিই: আমার মেয়ে এঞ্জেলাকে দাঁতের ডাক্তারের কাছ থেকে নিয়ে আসতে ৯১ নম্বর সড়ক দিয়ে গাড়ী চালিয়ে আসছিলাম। বাড়ী আসতে সাধারণত আধঘন্টা লাগে, কিন্তু সেদিন রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম থাকায় অর্ধেক রাস্তা আসতেই একঘন্টা লাগল। এঞ্জেলার সেদিন নিমন্ত্রণ ছিল এক বন্ধুর জন্মদিনের। সে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই আমার উপর হতাশা প্রকাশ করছিল। আমি

নিশ্চুপভাবে তার কৈশোর উৎসারিত সমালোচনা সহ্য করছিলাম। তার পনেরো বছর বয়সের রাগকে মোকাবিলা করার আমার একটাই উপায়, নীরবতা। সে একটু শান্ত হলে আমি তার সাথে শান্তভাবে কথা বলতে শুরু করলাম যাতে আবার না রাগের বিস্ফোরণ ঘটে।

যখন এঞ্জেলার রাগ চরমে সে গাড়ীর জানালাটা খুলল এবং শিশুর সারল্যে বলল, "আমার এখন ইচ্ছে হচ্ছে ঈশ্বর হয়ে যেতে!" শান্তভাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "যদি তুমি ঈশ্বর হতে, তাহলে কী করতে?" কোন দ্বিধা ছাড়াই সে বলল, "আমি আমার জন্য একটা বিশেষ রাস্তা তৈরী করতাম যাতে জ্যাম এড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে সময়ে পৌঁছতে পারতাম"। এঞ্জেলার প্রয়োজন মিটাতে ঈশ্বর রাস্তা প্রস্তুতকারক হয়ে গেলেন।

অবশ্য কখনো কখনো আমরা ঈশ্বরের কাছে খুব বেশী দাবি করে ফেলি। এক বৃদ্ধা মহিলা সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে তাঁর কিশোর নাতিকে জলের উপরে বোর্ড নিয়ে নাচতে দেখছিলেন। কয়েক মিনিট পর একটা প্রবল ঢেউ এসে তাকে গভীর সমুদ্রে টেনে নিয়ে যায়। বৃদ্ধা একেবারে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত কি করবেন বুঝতে না পেরে পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছিলেন। অবশেষে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন আর আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, "প্রভু, আমার নাতিকে নিরাপদে ফিরিয়ে দাও। আমি আর কখনও তোমার কাছে কিছু চাইব না"।

ঠাকুমা তাঁর প্রার্থনা শেষ করতে না করতেই আবার ঢেউ এসে সুস্থ অবস্থায় নাতিকে তাঁর পায়ের কাছে ফেলে দিল। ঠাকুমা আবার হাঁটু মুড়ে বসে আকাশের দিকে হাত তুললেন, "ধন্যবাদ, প্রভু, ধন্যবাদ!তুমি আমার নাতিকে ফিরিয়ে দিলে, কিন্তু"—প্রতিজ্ঞা ভাঙার লজ্জায় মাথা নিচু করে বললেন—"ওর মাথায় একটা টুপি ছিল, তুমি ভুলে গেলে?"

ঈশ্বরের জন্য আমাদের প্রয়োজনের অনুভূতিই ঈশ্বর—যে প্রয়োজন অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুরোধ (প্রভু, আমার নাতিকে নিরাপদে ফিরিয়ে দাও!) থেকে অতি তুচ্ছ অনুরোধ (মহান প্রভু, ভুলো না, ওর মাথায় একটা টুপি ছিল!) পর্যন্ত বিস্তৃত।

আমরা নিজেরাই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তাকে আমাদেরকে সৃষ্টি করতে দিয়েছি। আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তার আকৃতি দিয়েছি তারপর তার প্রয়োজন অনুসারে আমাদেরকে আকৃতি দিতে দিয়েছি। আমরা তাকে আমাদের পোষাক পরিয়েছি, পরে তিনি আমাদেরকে তার পোষাক পরিয়েছেন। সময়ের সাথে আমরা ভুলে গিয়েছি কে কাকে সৃষ্টি করেছে, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন না কি আমরা তাকে। প্রশ্ন রয়েই যায়: কে আগে এসেছে, মুরগী না ডিম?

এ প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় যতক্ষণ না এই অন্ধ চক্র কোন বিকৃত মুরগী বা পচা ডিম সৃষ্টি করে। এই বিকৃতির কারণ খুঁজতে আমাদের জানার প্রয়োজন নেই যে পচা ডিম থেকে বিকৃত মুরগী জন্মেছে না কি বিকৃত মুরগী পচা ডিম পেড়েছে। আমি এটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, আমাদের উভয় দিক থেকে অগ্রসর হতে হবে। আমাদেরকে একই সাথে পুনর্নির্মাণ করতে হবে আমাদের নিজেদের এবং ঈশ্বরকেও। যখন আমরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করব, তখন তাকেও আমাদেরকে সৃষ্টি করতে দিতে হবে। উভয়েই একে অন্যের মঙ্গলের জন্য এবং উদ্ভূত সৃষ্টির পূর্ণতার জন্য দায়ী থাকবে। যদি একজন ত্রুটিযুক্ত হয় তবে অন্যজনও ত্রুটিযুক্ত হবে এবং সময়ের সাথে সাথে চেনা কঠিন হবে কোন জায়গা থেকে এই ত্রুটির সূত্রপাত। আমরা সত্যিই যদি এই সৃষ্টিগত ত্রুটি দূর করতে চাই তবে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়। বরং সময়কে ব্যবহার করতে হবে দু'দিক থেকে অগ্রসর হওয়ার জন্য, একসাথে মুরগী এবং ডিম থেকে: একসাথে ঈশ্বর এবং মানুষ থেকে।

যে যুবকের গ্রামের কথা আগে বলেছি, ঠিক আমার গ্রামের মতোই, মানুষ সেই দৈত্যকে তাদের ভয়ের মাপেই সৃষ্টি করেছিল তারপর সেই দৈত্যকে তার আকৃতি অনুসারে তাদেরকে সৃষ্টি করতে দিয়েছিল। দীর্ঘকাল পরে সত্যি ঘটনাটা হারিয়ে গেল। কেউই আর জানত না কে কাকে সৃষ্টি করেছে অথবা কে অন্যের অপূর্ণতার জন্য দায়ী। গ্রামের মানুষদের মনের মধ্যে থাকা ভয়ই সেই দৈত্যের জন্ম দিয়েছিল না কি দৈত্য তাদের মনের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করেছিল?

সেই যুবক ছিল সাহসী। ক্রমাগত দেশভ্রমণ তাকে এমন মাত্রায় সাহসী করে তুলেছিল যে সে সমকালীন জ্ঞানকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল; যে জ্ঞান তাকে জীবনের ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছিল। মানুষের দুর্লভ গুণের মধ্যে একটি হল সাহস। কোন ত্রুটিকে পরিবর্তিত করতে বা তার সংশোধন ঘটাতে প্রথম প্রয়োজন সাহস। জ্ঞান একা পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। অপরপক্ষে, কখনো কখনো পরিবর্তনহীণতাকে সে চলতে দেয়। শুধুমাত্র সাহসই পরিবর্তন আনতে সক্ষম। আমার গ্রাম থেকে পাওয়া জ্ঞান আমাকে শিখিয়েছিল, ছিদ্র কখনো সূঁচের সমকক্ষ নয়। কিন্তু দেশত্যাগ এবং অভিবাসনের ভীতির মুখোমুখি হওয়ার পর আমি সেই সাহস অর্জন করেছিলাম যা আমাকে শিখিয়েছিল যে ছিদ্র সূঁচের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে যদি সেই ছিদ্রটিই আমার একমাত্র অস্ত্র হয়।

*মুফতি: মুসলিম পণ্ডিত যিনি শরিয়া ব্যাখ্যা করেন।

*যখন মুসলমানরা হত্যা করে তখন তারা চিৎকার করে বলে "আল্লাহু আকবর"—আল্লাহ সর্বোচ্চ মহান!"

ইসলামে ঈশ্বরের চরিত্র

কোন দৈত্যের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটনের আগে আমাদের সমীক্ষা করে জানতে হবে কোন প্রয়োজনে তার সৃষ্টি হয়েছিল। সংক্ষেপে হলেও খুঁজে দেখতে হবে কোন পরিবেশগত পরিস্থিতি এর সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। যদি কেউ অনুসন্ধান করে ইসলাম আসার আগে আরবদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল যা ইসলামের বিকাশে পথ করে দিয়েছিল তাহলে সহজেই বুঝবে ইসলামে ঈশ্বরের চরিত্র কি।

সে যুগের মানুষেরা ভয়ের মোড়কে সম্পূর্ণ আবৃত ছিল, সে ভয় অজানার ভয়। মরুভূমির রুক্ষ জীবনে পর মূহুর্তে কি ঘটে তা বলা অসম্ভব, সেই কারণে মানুষ আতঙ্ক নিয়ে বাঁচত। মানুষের সকল অনুভূতির মধ্যে অজানার ভয় তার বৌদ্ধিক এবং মানসিক ক্ষমতার প্রধান ধ্বংসকারী। যারা এই ধ্বংসাত্মক অনুভূতির কবলে পড়ে তাদের কাছে নিরাপত্তাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। যে অজানার ভয়ে তারা ভীত তার মুখোমুখি তারা হতে পারে না এবং সেই মূহুর্তে জীবনরক্ষাই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আরবের মরুভূমিতে মানুষ একটা দিনের জন্যও নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারত না। বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় ছিল ডাকাতি এবং বাহুবলই ছিল অস্তিত্ব রক্ষার এই উপায়ের আইন। স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী উপজাতিরা ডাকাতি করত এবং তাদের দুর্বল প্রতিবেশীদের সর্বস্ব লুঠ করত।

আরবরা তাদর ভাষাজ্ঞান এবং প্রকাশ ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত ছিল। অজানার প্রতি ভয়ের সেই বাতাবরণে রচিত কবিতা, গল্প বা অন্য কোন সাহিত্যকর্ম যদি কেউ

পড়ে তবে অনুভব করবে সেই ভয়ের মাত্রা কত এবং তাদের উৎপাদনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব। তারা শুধু তাদের সাহস আর দুঃসাহসের অহংকার করায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। কিন্তু এই অহংকার একটা মানসিক ক্রিয়ামাত্র যা তাদের অবচেতনে ভয়কে জয় করতে সাহায্য করে যে ভয় তাদের সচেতন মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন কোন মানুষ ভয় পায় তখনই তরবারিতে শান দেয়, আর সেকারণেই আরবদের তরবারি তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার এবং অসংখ্য; বাস্তবে এবং কল্পনায়, যা তাদের জীবনের প্রতিটি অণুকে ঘিরে রাখে।

এমনই এক পরিবেশে ভয়তাড়িত হয়ে ইসলামের জন্ম। আরব মরুর মানুষের মানসিক প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে এর উদ্ভব, যে প্রয়োজন খুঁজেছিল এমন এক বৃহত্তর শক্তিকে যা ভয়ের কবল থেকে তাদের উদ্ধার করতে পারবে। সে কারণে ভয়তাড়িত চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা এক দৈত্য সৃষ্টি করল যে দৈত্য তাদের ভয়ের থেকেও বড়, যে যা কিছু তাদেরকে ভীত করে তার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা দেয়।

তারা এই দৈত্যকে অবাধ ক্ষমতা দিল এবং তাদের সমস্ত ভয়ের উৎসকে নির্মূল করার স্বাধীনতা অর্পণ করল। তারাই এই দৈত্যকে সৃষ্টি করল আর পরে তাকেই স্বাধীনতা দিল তাদেরকে সৃষ্টি করার। তারা দৈত্যেরই অনুকৃতিতে বেড়ে উঠল, তাকে আত্মীকরণ করল যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণ অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেল। দৈত্যকে রক্ষা করতে ইস্পাত-কঠিন বেড়াজালে তাকে ঘিরে রাখল এবং শাসিয়ে দিল যদি কেউ দৈত্যের কাছে যেতে চেষ্টা করে তবে তার গর্দান যাবে। আজ পর্যন্ত মৃত্যুভয়ে কেউ দৈত্যের কাছে যেতে পারেনি।

বড় হয়ে ওঠার সময়ে আমি যত গল্প শুনেছি তার প্রত্যেকটিতে দৈত্যের কথা থাকত। আমার মনে আছে, আমরা যখন শিশু ছিলাম আর সন্ধ্যাবেলা সবাই দিদিমাকে ঘিরে বসতাম; তিনি এক সুন্দরী মেয়ের গল্প বলতেন যে একাকী একটা পরিত্যক্ত গুহায় থাকত। প্রতিসন্ধ্যায় এক বিশাল দৈত্য সেই গুহার সামনে এসে বলত, "তোমার

হাতটা বাড়াও যাতে আমি রক্ত খেতে পারি, নাহলে ঐ হাত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব"। মেয়েটি গুহার প্রবেশপথ দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিত আর দৈত্য তার সন্ধ্যার খাবার হিসেবে আকণ্ঠ রক্তপান করে হাত ছেড়ে দিত। আবার আসত পরদিন।

যেদিন আমি আমার গ্রামের দৈত্যের হাত থেকে পালাতে পেরেছিলাম সেদিন থেকেই আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করতাম কেন দিদিমা ঐ গল্পটা এত পছন্দ করতেন, যে গল্প কোনদিন শেষ হবার নয়। দৈত্য তো প্রতিদিনই মেয়েটির রক্ত খেতে আসবে। হয়ত গল্পটি দাদুর সাথে দিদিমার জীবনের প্রতিভূ। সুন্দরী মেয়েটি কি দিদিমার অবচেতনে তাঁর নিজেরই প্রতিরূপ ছিল?

আমি আজও স্মরণ করতে পারি যখন আমি গল্পটা শুনি তখন কতটা ভয় আমাকে গ্রাস করেছিল। সেই ভয়কে জয় করতে আমি আমার বাবাকে আরও বড় একটা দৈত্য হিসেবে কল্পনা করতাম যে দিদিমার গল্পের সুন্দরী মেয়েটির রক্তচোষা দৈত্যকে হারিয়ে দিতে পারে। আমি ভাবতাম আমার বাবা একমাত্র শক্তি যিনি আমাকে রক্ষা করতে সক্ষম। অনিবার্য ভাবেই আমি কল্পনা করতাম বাবা দিদিমার গল্পের দৈত্যের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী যেন তিনি আমাকে রক্ষা করতে পারেন যদি কখনও সেই দৈত্য আমার রক্ত খেতে আসে। আমার চেতনে এবং অবচেতনে আমাকে ভয় দেখানো দৈত্যের থেকে আরও বড় আর একটা দৈত্য সৃষ্টি করেছিলাম এইটা নিশ্চিত করতে যে আমি নিরাপদে বাঁচতে পারব।

আরব মরুর অধিবাসীরা আমার মত মানসিক রক্ষাকবচ ব্যবহার করেই তাদের ভয়ের মোকাবিলা করতে পারত। তারা তাদের ভয়ের থেকে অনেক বড় এক দৈত্য সৃষ্টি করল এবং ভয়ের সকল উৎসকে শেষ করে দিল।

আরব মরুর অধিবাসীরা তাদের নতুন ঈশ্বরের উপরে নিরানব্বইটি গুণ আরোপ করল। তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে ইসলামের পূর্বের ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে ভাল গুণগুলি ধার করে তাদের ঈশ্বরের উপরে চাপিয়ে দিল, অথচ বাকি বৈশিষ্ট্যগুলি

চাপালো তাকে অন্য ঈশ্বরদের থেকে পৃথক করতে। তার খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি আগের ঈশ্বরদের খারাপ দিকের অবিকল নকল।

ইসলামের ঈশ্বরের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য "ক্ষতিকারক"। ঈশ্বর ক্ষতি করেন এ কথা কি যুক্তি সম্মত? তবু এই বৈশিষ্ট্য বা গুণ তাদের ঈশ্বরের উপরে মুসলমানেরা আরোপ করে এবং গর্ববোধ করে। ঠিক যেমন তারা গর্ববোধ করে ঈশ্বরকে এই উপাধিগুলি দিয়ে "দয়ালু", "ধৈর্যশীল", "বিজয়ী", "বাধ্যকারী", "রাজকীয়", "অপমানকারী", "পালনকর্তা", "মৃত্যুদাতা", "সর্বোচ্চ", "প্রতিশোধপরায়ণ", "রক্ষাকর্তা"—এই সমস্ত গুণগুলি তারা তাদের দৈত্যের উপরে আরোপ করেছে এবং পরবর্তীতে তাদের আদর্শের অঙ্গীভূত হতে এই সবগুলিকে আত্মীকরণ করেছে।

যখনই আমি কোন শিক্ষিত মুসলমানের সাথে ঐ নামগুলির বৈধতা এবং নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছি শুধু তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়া আর কিছু শুনিনি এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলোচনা অর্থহীন ঝগড়ায় পরিণত হয়েছে। তারা এইসব অভিধাগুলির নঞর্থক দিকগুলিকে যথার্থ প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে বিষয়টাকে আরও খারাপ করে তোলে। মুসলমানরা ঈশ্বরের "ক্ষতিকারক" রূপকে যথার্থ মনে করে, কারণ তারা বিশ্বাস করে এভাবে মানুষকে সন্ত্রস্ত করা যায় যার ফলে তারা ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশ অমান্য করতে সাহস না পায়। তারা বলে: "যখন কোন মানুষ ঈশ্বরের ক্ষতি করার ক্ষমতায় বিশ্বাস করে তখন সে তাঁকে মান্য করে যাতে সে ঈশ্বরকৃত ক্ষতিকে এড়াতে পারে"।

একবার লণ্ডনবাসী এক মহিলা পাঠকের, যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, সাথে এই বিষয়ে ঐকমত্যে আসার জন্য ই-মেইলে প্রচুর আলোচনা করেছিলাম। সে একবার আমাকে লিখল, "তুমি কি অস্বীকার করতে পারো যে ঈশ্বরের ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে? তিনি যদি চাইতেন তাহলে কি এই মহাবিশ্ব ধ্বংস করতে পারতেন না?" সে আরও যোগ করল: "তাঁর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা থাকলে

দোষ কি? মানুষকে তার সীমা লঙ্ঘন করা বা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা থেকে নিবৃত্ত করতে এটা কি জরুরী নয়?"

আমি উত্তর দিলাম: "একজন পিতার ক্ষমতা আছে তার শিশুর ক্ষতি করার যখন সে তাঁকে অমান্য করে, কিন্তু তিনি কি তা করেন? আমাদের সন্তানদের সীমা অতিক্রম না করার শিক্ষা দেওয়ার এটাই কি সঠিক উপায়?

অক্সফোর্ডের স্নাতক উত্তর দিল: "এখানে কোন তুলনাই হয় না। ঈ্শ্বরের শক্তি আর মানুষের শক্তির পার্থক্য, পিতা-পুত্রের শক্তির পার্থক্যের থেকে অনেক বড়"।

আমি উত্তর দিলাম: "কিন্তু ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, দয়া, এবং ভালবাসা কি একজন পিতার থেকে বেশী হওয়া উচিৎ নয়?"

শেষ পর্যন্ত এই বার্তা বিনিময় নিষ্ফল ঝগড়ায় পরিণত হল আর ই-মেইলে অক্সফোর্ডে-স্নাতকের চিৎকার শুনলাম। সে আমাকে বলল পথভ্রষ্ট অবিশ্বাসী এবং ধর্মত্যাগী যার একমাত্র প্রাপ্য মৃত্যু।

যখন আপনি আপনার সন্তানকে ঈশ্বরের গুণাবলী শেখাতে গিয়ে বলেন যে তিনি প্রতিশোধপরায়ণ, বাধ্যকারী, উদ্ধত, বিজয়ী, সেইসঙ্গে পালনকর্তা, তাহলে আপনি কি করলেন? আপনি সৃষ্টি করলেন এক প্রতিশোধপরায়ণ, অত্যাচারী, কর্তৃত্বপ্রয়াসী মানুষ যে আবার পালনও করে; কিন্তু কিসের বিনিময়ে? কারণ মানুষ ঈশ্বরকে আদর্শ রূপে দেখে এবং চেতনে ও অবচেতনে চেষ্টা করে তাঁকে অন্তরে ধারণ করে তাঁর সাথে একাত্ম হতে। যখন আমরা তাদের বলি যে ঈশ্বর প্রতিশোধপরায়ণ, তখন আমরা তাদেরও প্রতিশোধপরায়ণ হওয়াকে যাথার্থ্য দিই। মানুষ স্বভাবতঃ তার আদর্শের সাথে একাত্ম হতে চেষ্টা করে, তাহলে আপনার মতে কি ঘটতে পারে যখন ঈশ্বর নিজেই সেই আদর্শ?

মুসলমানদের সাথে তর্ক করা আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন তারা আপনাকে বোঝাতে চায় তাদের ঈশ্বর দয়ালু, ধৈর্য্যশীল এবং সহনশীল। আমি একজন মুসলিম

মনোবিদ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: “আপনি আপনার ছেলেকে কিভাবে বোঝাবেন যে ঈশ্বর একই সাথে দয়ালু ও প্রতিশোধপরায়ণ? এ ধরণের ধর্মীয় শিক্ষায় কি পরস্পরবিরোধীতা নেই যা শিশুর ব্যক্তিত্বকে দ্বিধাবিভক্ত করে আর তাকে দিশেহারা এবং বিভ্রান্ত করে তোলে?”

তিনি উত্তর দিলেন: “না, আমি তাকে শিখাই ঈশ্বর বিশ্বাসীদের প্রতি দয়ালু আর অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ। আমি এতে কোন পরস্পরবিরোধীতা দেখি না”।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনি কিভাবে আপনার ছেলেকে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য শেখাবেন যাতে সে বুঝতে পারবে কার প্রতি দয়ালু আর কার প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হতে হবে?”

তিনি স্মিতমুখে বললেন: “বিশ্বাসী সেই যে ঈশ্বর, তাঁর নবী এবং শেষ বিচরের দিন এসবে বিশ্বাস করে”।

আমি প্রশ্ন করলাম: “তাহলে যদি আপনার ছেলে একটা যাত্রীপূর্ণ বিমান ছিনতাই করে সুউচ্চ বাড়ীতে আঘাত করে আর তিন হাজার “অবিশ্বাসীকে” হত্যা করে তখন কি সে তার ঈশ্বর এবং আদর্শ যা করতেন সেই সীমার বাইরে কিছু করে না? এটাই কি বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য করার পদ্ধতি?”

কথাবার্তা শেষ হল চিৎকার চেঁচামেচিতে এবং একটা ব্যর্থ তর্কের মাধ্যমে প্রমাণিত হল আমি ধর্মবিদ্বেষী, ধর্মত্যাগী এবং ঈশ্বর ও তার নবীর শত্রুদের সমর্থক।

যখন কোন মানুষ অজানা পরিবেশে বাস করে এবং পরের মূহুর্ত্তে কি ঘটবে জানে না, সেক্ষেত্রে সর্বব্যাপী ভয় তাকে কোন কাজে অক্ষম করে ফেলে। এমনই এক ভয়ের ফলস্বরূপ ইসলামের উদ্ভব। সেই পরিবেশে মানুষ অজানাকে ভয় পেত, সে কারণে ইসলাম ভয়কে পরিমাপের চেষ্টার বিরোধিতা করত। ইসলাম সমস্যার সমাধান করেছে তার মোকাবিলা করে নয়, এড়িয়ে গিয়ে। মুসলমানেরা ভীত মানুষ এবং ভয়ের কারণ থেকে দূরে থাকাই তাদের ভয় থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। যা

কিছু সে বিশ্বাস করে না, সেটাই তাকে ভীত করে আর যা তাকে ভীত করে তাকেই সে এড়িয়ে যায়। সমস্ত অপরিচিত বিষয়ে তার শিক্ষা তাকে সন্দিহান করে তোলে আর এই শিক্ষাই তাকে বঞ্চিত করেছে অবিশ্বাসের বিষয়ে সত্য উদ্ঘাটনের ক্ষমতা থেকে।

যে পরিবেশে ইসলামের উদ্ভব সেখানে ভয়ের মূল উৎস হল অজানার ভয়। যেহেতু সংজ্ঞানুযায়ী সকল নতুন বস্তুই অজানার বৈচিত্র; ইসলাম নতুনকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এবং পরিচিত বাস্তবের গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। শিক্ষায়, চিন্তাধারায়, জীবনাচরণে ইসলাম আজও কারাগারে বন্দী হয়ে আছে যার দরজা চৌদ্দশ' বছরে খোলেনি। এ যেন ঠিক জঙ্গলের মধ্যে কুঁড়েঘরে বাসকরা একজন মানুষ। কুঁড়েঘরটি হল ইসলাম আর জঙ্গল হল অজানা বিষয়। অজানার ভয়কে এড়াতে মানুষটি বাইরে যাওয়ার এবং ভিতরে আসার সমস্ত পথ বন্ধ করে রেখেছে আর কখনও জঙ্গলে বেরোতে চায় না। কুঁড়েঘরে বাস করা মানুষটির মত মুসলিমরা তাদের চারপাশের জগৎকে ঠিক সেইভাবেই দেখে। সে বাইরের জগতের প্রতি অত্যন্ত ভীত। ভয়ের মুখোমুখি হতে বা বহির্জগতের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে তার শিক্ষা তাকে এমন কোন দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করেনি। অপরপক্ষে, তার শিক্ষা তাকে পরিপার্শ্বকে ভয় করতে শিখিয়েছে, অবিশ্বাস করতে বলেছে এবং জগৎ তার জন্য যেসব বিপদ লুকিয়ে রেখেছে তার জন্য সতর্ক করেছে।

একদিকে ইসলাম এবং তার অনুসারীরা, অপরদিকে বাকী সকল ধর্ম দ্বারা ব্যাখ্যাত জগতের সম্পর্ক আজও ভয় এবং অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সম্পর্ক অনেকাংশে ভ্রাম্যমাণ বেদুইনদের সাথে মরু পরিবেশের সম্পর্কের সাথে মিলে যায়। এ সম্পর্ক ভয় এবং অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভয় এবং অবিশ্বাসের উপর নিবদ্ধ কোন সম্পর্ক কখনো সুস্থ এবং দৃঢ় হতে পারে না এবং উভয় পক্ষের অধিকারও নিশ্চিত করতে পারে না।

যে বহির্জগৎ ইসলামের অস্তিত্ব ও সত্ত্বাকে ভয় দেখায় তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সেই জগতের প্রভাবকে নিজের প্রতি অগম্য করে রেখেছে। ইসলাম তার অনুসারীদের অভেদ্য দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছে এবং ভিতরে আটকে রেখেছে। প্রতিটি নতুন আবিষ্কারের উপযোগীতা এবং বৈধতা তুলে বিরোধিতা করেছে। চারিদিক ঘিরে থাকা জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ককে পাস্পরিক সমঝোতা ও লেনদেনের বদলে আগ্রাসনে নিবদ্ধ রেখেছে। ইসলামের জন্মের পর থেকে আজ অবধি কোন উল্লখযোগ্য পরিবর্তন এতে ঘটেনি। শুধুমাত্র সেই পরিবর্তনটুকুই ইসলামে ঘটেছে যা এসেছে তার সীমার বাইরে থেকে এবং ইসলাম জগৎ যেটুকু গ্রহণ করতে পেরেছে।

১৯৬০ সালের প্রথম দিকে আমাদের প্রতিবেশী একটি খ্রীষ্টান পরিবার একটি টেলিভিসন কিনেছিল। আমার মনে আছে কিভাবে স্থানীয় লোকেরা ঐ পরিবারের প্রধানকে লম্পট বলে অভিযোগ করত। তারা ওদের উপর চাপ সৃষ্টির পরিকল্পনা করত যাতে ঐ পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তাদের ভয় ছিল তাদের সন্তানদের বিশেষত কিশোর-কিশোরীদের মঙ্গল এবং নৈতিকতা নিয়ে। টেলিভিসনের বিস্তার ছিল খুব ধীরে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান সময়ে আমি বিশ্বাস করি না এমন কোন সৌদি শেখ আছে যে টেলিভিসনে ইসলামি বা পাশ্চাত্য অনুষ্ঠান উপভোগ করে না। কৃত্রিম উপগ্রহগুলি যারা এই অনুষ্ঠান সারা পৃথিবীতে প্রসার করে, তারা ইসলামের নিজের জন্য তৈরী কারাগারকে ঝড়ের মত উড়িয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাল (Internet) টেলিভিসনের মত ততটা বাধার সম্মুখীন হয়নি এবং এর বিস্তার অনেক দ্রুত ও প্রভাবশালী। ফলস্বরূপ যারা ইসলামি দুনিয়ায় পরিবর্তন আনতে আগ্রহী তারা অনুভব করল যে তারা এই যন্ত্রটির সাহায্যে ইসলামকে ঘিরে রাখা অভেদ্য দেওয়ালকে এক দশকেরও কম সময়ে ধূলিস্যাৎ করে দিতে পারে।

একজন মুসলমান এবং একজন অমুসলমানের মধ্যে সম্পর্কে, সে স্বেচ্ছায় হোক বা প্রয়োজনে, মুসলমান রক্ষণাত্মক ভুমিকায় অবস্থান করে। প্রস্তুত থাকে সেই সম্পর্কের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অজানা বিষয়ের সাথে লড়াই করার জন্য। মুসলমান

রক্ষণাত্মক অবস্থান নেয় অন্যজনের থেকে ভয়ের কারণে এবং তার অভিপ্রায়ের সততার প্রতি সন্দেহে। এমন সম্পর্ক, সে যত গভীর হোক বা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক, কখনোই এমন পর্যায়ে আসে না যাতে মুসলমান লোকটি অন্যজনকে বিশ্বাস করতে বা ভালবাসতে পারে।

একজন মুসলমান এমন সম্পর্ক তৈরীতে রাজী হবে মাত্র দু'টি সম্ভাবনার যে কোন একটি ক্ষেত্রে: প্রথম, তার নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা; দ্বিতীয়, অন্যের স্বার্থহানি করা। তেমন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম লোকটি তার নিজের মনোভাব লুকানোর অসামান্য দক্ষতা দেখাবে। আমি মাঝে মঝেই এখানে দেশ ছেড়ে আসা কয়েকজন বন্ধুর সাথে মৌখিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তাম বিশেষত আমেরিকার মানুষ এবং সংস্কৃতির প্রতি তাদের মানসিকতা বিষয়ে। তাদের ভীতিপ্রদ মতামত শুনে অবাক বোধ করতাম। তারা এত ক্রুদ্ধ যে শুধুমাত্র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টাওয়ার নয়, গোটা আমেরিকাকে ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু যদি আমার কোন আমেরিকান বন্ধু তখন সেখানে এসে পড়ত—এক সেকেণ্ডে সেই ক্রুদ্ধ মানুষটা আব্রাহাম লিঙ্কনের থেকেও বড় আমেরিকান হয়ে যেত।

সান ডিয়েগোতে আমি আমার ইরাকী বন্ধু আমালের, যে প্রায় তিন বছর এ দেশে বাস করছে, সাথে লা জোলা থেকে রিভার সাইড যাচ্ছিলাম গাড়ীতে। সে এবং তার পরিবার দক্ষিণ ইরাকে সিয়াদের উপর সাদ্দাম হুসেনের নিষ্ঠুর অত্যাচরে পালিয়েছিল এবং সৌদি আরবে আশ্রয় চেয়েছিল। সৌদি আরব আশ্রয় দেয়নি। তাদের অনুরোধে আমেরিকা সাড়া দিতে তারা আমেরিকায় চলে আসে।

ওর বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় ঢোকার মুখে একটি গৃহহীন মানুষ দাঁড়িয়ে পথচারীদের থেকে ভিক্ষা করছিল। আমার ইরাকী বন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ করে বলল, "ঐ ভিখারীটাকে দেখ। এটাই হল আমেরিকা যার জন্য তুমি পাগল"।

"বন্ধু, তুমি কি সত্যিই মনে কর এটাই আমেরিকা?" আমি উত্তর দিলাম ।

আমেরিকা এবং তার সংস্কৃতি বিষয়ে আমাল এবং আমার মধ্যে এটাই প্রথম মতবিরোধ নয়। তার বাড়ীর দরজায় পৌঁছানো পর্যন্ত তর্ক চলেছিল। তার প্রতিটি কথায় অসম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়ে আমি তাকে বিদায় দিলাম।

আমি বহু দেশ দেখেছি কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াতে লা জোলা থেকে রিভার সাইড যাওয়ার রাস্তার মত সুন্দর রাস্তা কোথাও দেখিনি; চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নিপুণ পরিকল্পনার দিক থেকে বিচার করলে। কিন্তু আমার বন্ধু আমাল যখন গাড়ীর জানালা দিয়ে আমাদেরকে ঘিরে থাকা সেই স্বর্গের দিকে তাকায় তার শুধু চোখে পড়ে আমেরিকার প্রতিভূস্বরূপ সেই ভিখারীই।

সে অন্যদের ঠকাত। যদিও আমি সর্বদাই চাই খুব বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার আগে আমি যা দেখতে পাই তা ভাল আমেরিকানরা দেখতে পাক। আমাল একটা বিখ্যাত আমেরিকান কোম্পানীর কর্মচারী ছিল। একবার একটা পার্টিতে আমি নিমন্ত্রিত ছিলাম। সেখানে, সে যেখানে কাজ করত সেখানকার বিভাগীয় প্রধানের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন, পরিশীলিত আমেরিকান মহিলা। আমাদের দীর্ঘ আলোচনায় অভিবাসন এবং অভিবাসীরা যখন কোন নতুন দেশে আসে তাদের সমস্যা নিয়ে কথা উঠল। আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম: "আমালের যে জিনিসটা আমার ভাল লাগে সেটা হল এই দেশের প্রতি তার ভালবাসা, আমেরিকান মূল্যবোধের প্রতি বিশাল শ্রদ্ধা এই দেশ তাকে যা দিয়েছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা"। আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। কিন্তু আমার মন ফিসফিস করে বলল: "বেচারা আমেরিকানরা! তোমরা যদি জানতে আমাল যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে কি ভাবে তাহলে বুঝতে নিজেদের বোকামিতে তোমরা নিজেই নিজের কবর খুঁড়ছ"।

বেদুইনের চারপাশ ঘিরে থাকা মরু পরিবেশের ভয় প্রকাশ পায় মুসলমানদের বাইরের জগতের প্রতি তীব্র ভয়ের মাধ্যমে। আগে ছিল এবং এখনও আছে অজানার ভয়। মরুভূমি এবং অজানাকে জয় করতে সে তার ভয়ের থেকেও আরও বড় এক দৈত্যকে সৃষ্টি করল এই আশায় যে দৈত্য তাকে রক্ষা করবে এবং যথেষ্ট আশ্বাস

যোগাবে। কিন্তু যখন সে দৈত্যকে সৃষ্টি করল, সে শুধুমাত্র তার মনের ভয়ের জায়গায় আরও বড় ভয়কে বসাল।

কোরানের যেসব আয়াতে জান্নাতের (স্বর্গ) বর্ণনা আছে সেখানে আছে জান্নাতের নীচ দিয়ে নদী বয়ে যায়। মরুভূমিতে জলের তীব্র অভাব, এবং তৃষ্ণায় মৃত্যু একটা অজানা তীব্র ভয়। নদীর প্রতিশ্রুতি তৃষ্ণায় মৃত্যুভয় থেকে বেদুইনকে আশ্বাস এবং শান্তি দিয়েছিল। মরুভূমিতে অতি অল্প ফসলই হয় সেটাও অল্প পরিমাণে। খাদ্য হিসেবে তা প্রায় কিছুই নয়। ইসলাম তার অনুসারীদের প্রতিশ্রুতি দেয় খেজুর, আঙুর এবং আরও ফলের বাগানের। তা সত্ত্বেও নদীর থেকে ফল এবং খাদ্যের কথা কম উল্লেখ করা হয়েছে কারণ ক্ষুধায় মৃত্যু তৃষ্ণায় মৃত্যুর থেকে কম কষ্টদায়ক। ইসলামে জান্নাত বাস্তব প্রয়োজনেরই অন্য রূপ। এর এই নদী এবং ফলের রূপই বেদুইনকে আশ্বাস দেয়, যে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় মৃত্যুর ভয়ে ভীত।

ডাকাতি, যার কথা আগে বলেছি, ছিল মৃত্যু এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আর একটা প্রধান ভয়। কিন্তু একইসাথে বেঁচে থাকারও প্রধান উপায়। বিভিন্ন গোত্র পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করত খাদ্য এবং জলের জন্য। বেদুইন কখনো এক মূহুর্ত্তের জন্য নিরাপদ বোধ করত না। আরবের ইতিহাস বইগুলি ডাকাতির কাহিনীতে ভরা এবং কিভাবে গোত্রগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ঝগড়া সৃষ্টি করত তাদের আক্রমণ যে যুক্তিযুক্ত তার প্রমাণের গল্পে। ডাকাতি একই সাথে ভয় এবং নিরাপত্তার উৎস ছিল। প্রতিটি গোত্রই ডাকাতির ভয়ে ভীত ছিল আবার অন্যের উপর ডাকাতি করার সুযোগ পেলে নিরাপদ বোধ করত।

ডাকাতিতে আক্রান্ত হওয়ার মানে আরও দারিদ্র্য এবং বঞ্চনা, অপরদিকে যারা এটা করল তাদের পক্ষে প্রচুর লুঠের মাল পাওয়ার সুযোগ। এমনই সময়ে ইসলামের আবির্ভাব। ইসলাম ডাকাতি করাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করল। নবী এবং তার অনুসারীদের ডাকাতি করাকে ন্যায্য বলে পরিচয় দিল, কিন্তু অন্যের ডাকাতি করাকে নিষিদ্ধ করল। নবী মহম্মদকে নিয়ে লেখা আরবি ভাষায় যে কোন বই খুলুন। প্রথম যে বিষয়টি আপনি পড়বেন তা হল নবীর ডাকাতি অভিযানের

কাহিনী। তার প্রতিটি ডাকাতি অভিযানের একটি নাম এবং সবিস্তার বর্ণনা আছে। বুদ্ধিমান পাঠক অতি সহজেই বুঝবেন যে এইসব ডাকাতির মূল উদ্দেশ্য ছিল লুঠ এবং লুঠের মালের ভাগ।

ইসলাম এই সব ডাকাতিকে বৈধ প্রমাণের চেষ্টা করেছিল এই বলে যে এ সব মৃত্যু ঈশ্বরের কারণে। তা সত্ত্বেও এর মূল লক্ষ্য যে লুঠের মাল ভোগ সে কথা ঢাকতে পারে না। কোরানে একাধিক বার লুঠের মালের উল্লেখ আছে। কোরআন একে নিষিদ্ধ করেনি। পক্ষান্তরে বলে, মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগের অধিকারী নবী। তার ভাগের পরিমাণ দেখে অনুসারীরা যাতে অসন্তুষ্ট না হয় সেজন্য নবীর নামের সাথে ঈশ্বরের নাম যোগ করে দেওয়া হল। আয়াত নাজিল হল: "জেনে রাখ, তোমরা যে গণিমতের মালের (booty) অধিকারী হও (যুদ্ধে) তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তার রসুল এবং তার আত্মীয়, অনাথ, অভাবী এবং মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট"। (৮.৪১)

"জেনে রাখ, তোমরা যে গণিমতের মালের (booty) অধিকারী হও" এই বাক্যাংশের ব্যাখ্যা আল-কুরতুবী তাঁর কোরআনভাষ্যে এইভাবে করেছেন, "তোমরা অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে জোর করে কিছু ছিনিয়ে নিয়েছ"। অর্থাৎ প্রকৃত মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার মাল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কোরানের মুসলিম ব্যাখ্যাকাররা মানতে পারেন নি যে ঈশ্বর কেমন করে লুঠের মালের ভাগ নিতে পারেন এবং কাকে সেই অংশ দেওয়া হবে । স্বাভাবিক ভাবেই তারা নবীকে অধিকার দিয়েছে ঈশ্বরের অংশের বিলিব্যবস্থা করার।

মহম্মদ লুঠের মাল ভাগের বিষয়ে তার অনুসারীদের সাথে ঝগড়ার কোন অবকাশ রাখেননি। সেজন্য বলেছিলেন মাল পাঁচ ভাগে ভাগ হবে , তার একভাগ তার এবং ঈশ্বরের। যদি মহম্মদ বলতেন যে তিনিই পাঁচ ভাগের এক ভাগ নেবেন, তাহলে প্রবল আপত্তি উঠতে পারত: একজন ব্যক্তি একা কিভাবে এক ভাগ নিতে পারে যেখানে অন্য হাজারজন মিলে পাবে বাকী চারভাগ। কিন্তু যখন তিনি বললেন "এক পঞ্চমাংশ ভাগ আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের জন্য নির্দিষ্ট", সমস্যা স্তিমিত হয়ে

গেল এবং অন্যদের আপত্তি তোলা কঠিন হয়ে গেল। যদি সর্বশক্তিমান, মহান ঈশ্বর নবীর সাথে এক পঞ্চমাংশ নিতে আগ্রহী হন সেক্ষেত্রে অন্যেরা সংখ্যায় যত বেশীই হোক বাকী চার ভাগ নিয়ে সন্তুষ্ট হবে না কেন?

এখানে আবার আমরা দেখি ইসলামের শিক্ষা এবং নিয়ম-কানুন নির্ধারণে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে; যে ইসলামের আবির্ভাব অজানা ভয়ের পরিবেশে, যেখানে ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় মৃত্যু সেখানকার অধিবাসীদের চিরন্তন আতঙ্ক। এ প্রসঙ্গে মহম্মদের আর একটি বাণী: "নিহতের মালের অধিকারী তার হত্যাকারী" অর্থাৎ যখন কোন মুসলিম কোন অমুসলিমকে হত্যা করে তখন নিহতের মালের অধিকার তার। এই হাদিশটি (মহম্মদের বাণী) নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু মানুষ বিস্মিত হন এই ভেবে যে একজন হত্যাকারী একা কিভাবে মাল পেতে পারে যেখানে কোরানের সুস্পষ্ট নির্দেশ যে মাল পাঁচ ভাগে ভাগ হবে।

বিভিন্ন মতের মধ্যে সমতা বিধানের জন্যে অনেকে বলেছেন, যদি লুঠের মালের পরিমান সামান্য হয় তবে হত্যাকারী একাই তা পাবে আর যদি পরিমাণ বেশী হয় তবে পাঁচ ভাগ হবে। আর একবার জীবন যুদ্ধের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করা হল।

আমেরিকাতে যদি কোন খুন হয়, তদন্তকারীরা প্রথম যেটা খোঁজে সেটা হল খুনের উদ্দেশ্য। যদি নিহতের টাকাকড়ি তার দেহের কাছেই পাওয়া যায় এবং তার বাড়ীতে যেটা যেখানে থাকার কথা সেটা সেখানেই থাকে তবে তদন্তকারীরা বলে, "খুনের উদ্দেশ্য চুরি নয়; অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে"। কিন্তু যখন দেখা যায় সঙ্গের জিনিসপত্র নেই তখন তদন্ত অন্য দিকে মোড় নেয়। এখানে যেহেতু খুনের উদ্দেশ্য অন্য, এটা ধরেই নেওয়া যায় চুরিই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

যখন মুসলমানরা নবীর ডাকাতির ঘটনাগুলিকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য বলে যে সেগুলি ঘটেছে আত্মরক্ষার জন্য, আমি বিশ্বাস করি না তারা চুরি এবং ডাকাতি করে পাওয়া লুঠের মাল ভোগ করাকে ন্যায়সঙ্গত বলতে পারবে। যদি কেউ হঠাৎ অন্ধকারে আপনাকে আক্রমণ করে এবং খুন করতে চেষ্টা করে কিন্তু পরিবর্তে

আপনি তাকে খুন করতে সমর্থ হন সেক্ষেত্রে আপনি আত্মরক্ষার্থে খুন করেছেন বলতে পারেন। কিন্তু হত্যার পর আপনি যদি তার টাকা চুরি করেন তাহলে কি আপনি বলতে পারেন যে আপনি আত্মরক্ষার জন্য টাকা চুরি করেছেন? হত্যার পর আপনি বললেন আপনি আত্মরক্ষার্থে খুন করেছেন, এটা সত্য হলে: একইসাথে আপনি টাকা চুরি করেছেন আত্মরক্ষার্থে, একথাও কি সত্য হতে পারে?

জীবনের বেশীর ভাগ অংশ সময়কালে মহম্মদ বহু ডাকাতি করেছেন। ইবন হিসাম তাঁর লেখা "নবীর জীবনী" দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, মহম্মদ সারা জীবনে সাতাশটি ডাকাতি করেছেন, যদিও কিছু মুসলমান ঐতিহাসিক বলেছেন সংখ্যাটা আরও বেশী। আমি এখানে এই ডাকাতির ঐতিহাসিক সংখ্যা বিষয়ে আগ্রহী নই। কিন্তু যদি কেউ বিষয়টি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েন তবে সহজেই বুঝবেন যে এই ডাকাতিগুলি ঘটেছে মাত্র দু'টি কারণে। প্রথম এবং প্রধান কারণ লুঠের মাল দখল করা। দ্বিতীয় কারণ, প্রথম কারণের জন্যই প্রয়োজনীয়, ডাকাতির শিকার যে গোত্র তাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করা ।

যখন কোন চোর শিকারের অপেক্ষায় ওত পেতে বসে থাকে সে চায় শিকারের যথাসম্ভব ক্ষতি করতে, এটা নিশ্চিত করতে যে সে যেন ফিরে আক্রমণ করতে না পারে। ডাকাতির প্রধান কারণ ছিল ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা থেকে মৃত্যুর ভয়। আর একটা উদ্দেশ্য হল অন্যের ক্ষতি করা, এটা করা হয় শত্রুপক্ষের যেন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না থাকে। ইসলাম একে আইনসিদ্ধ করেছে, বৈধতা দিয়েছে, এবং যৌক্তিক বলেছে ইসলামেরই সৃষ্ট দৈত্যের নির্দেশে। যে দৈত্যকে সৃষ্ট করা হয়েছিল জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে।

আমার মতে, মুসলমানদের চিন্তা এবং আচরণের বিষয়ে সত্য জানা যাবে একমাত্র ডাকাতির দর্শনের গভীর বোধের মাধ্যমে। যে দর্শনের মূল মুসলিম মনে গভীরভাবে প্রোথিত। বেদুইনরা একদিকে ডাকাতির ভয় পেত আবার অন্যদিকে ডাকাতির উপরই নির্ভর করত বেঁচে থাকার উপায় হিসাবে। এই একুশ শতকেও অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় পায় এবং জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে অন্যকে

আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকে। ডাকাতির দর্শনই নিয়ন্ত্রণ করে তাদের জীবন, তাদের আচরণ, তাদের সম্পর্ক এবং তাদের সিদ্ধান্তকে।

যখন আমি আমেরিকায় আসি স্পষ্ট বুঝলাম এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা ডাকাতিতে দক্ষ নয় অথচ বহিরাগত মুসলমানরা ছাড়তে পারেনি। আমি যুক্তরাষ্ট্রে আসার কয়েক সপ্তাহ পর আমার এক আরব প্রতিবেশী আমাকে নিয়ে সুপারমার্কেটে যায় আমাদের এলাকার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। আমরা ভন্স মার্কেটে গেলাম। সেখানে পৌঁছেই সে যথাসম্ভব প্যাকেট খুলল, তারপর সে বেশ কিছু দুধ, জেল-ও, ক্রীমের প্যাকেটে ছিদ্র করল। তারপর সে অনেকগুলি আলুভাজা, কাগজ-রুমাল, এবং স্প্যাগেটির ব্যাগ ছিঁড়ে দিল ।

আমি অত্যন্ত আপত্তির সাথে চেঁচিয়ে বললাম: "দিনা, তুমি কি করছ?"

"ঈশ্বর ওদের অভিশাপ দিন ।ওরা আমাদের দেশ চুরি করেছে"!

"এসব করে তুমি কি তা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছ?"

"আমি ওদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছি! তুমি এখানে নতুন। তুমি কি জান দোকানের মালিক ইহুদী?"

এ ঘটনা পনের বছর আগের যখন আমি নবাগত। এখন আমি আগের চেয়েও বেশী নিশ্চিত যে এই মানসিকতা পরিবর্তনে সময় কিছুই করতে পারে না। এবং একজন মুসলমান যতই তার পরিপার্শ্বের সাথে মানিয়ে নিতে অক্ষম হয়, ততই সে ডাকাতির প্রয়োজন অনুভব করে। সে বিশ্বাস করে সে এদেশে এসেছে লুঠ করতে এবং এদের ক্ষতি করতে।

আমি ক্যালিফোর্নিয়াতে বাস করি। এখানকার পুরনিগম প্রতিটি বাড়ীতে তিনটি ময়লার পাত্র দেয়: একটা পুনরায় ব্যবহারের অযোগ্য ময়লার জন্য; একটা কাঁচ, কাগজ, ধাতব জিনিস যেগুলি আবার ব্যবহারযোগ্য তার জন্য; এবং তৃতীয়টি বাগানের ময়লার জন্য। আমি একদিন আমার এক মুসলিম মহিলা বন্ধুর বাড়ী দুপুরের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। খাওয়া শেষে আমরা টেবিল পরিষ্কার শুরু করলাম।

দেখি বন্ধুটি সমস্ত ময়লা একসাথে নিয়ে একট পাত্রে ফেলে দিল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি বিভিন্ন পাত্রের ময়লা আলাদা কর না?" সে রাগের সাথে বলল, "ঈশ্বর ওদের অভিশাপ দিন। তুমি কি আশা কর যে আমি ওদের পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করব? প্রথম এবং দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধে ওরা কি করেছে জান না? ওরা ওদের ময়লায় আমাদের দেশের পরিবেশ বিষাক্ত করেছে। তুমি কি শুনেছ যে ইজরায়েল জর্ডন এবং মিশরে এইডস (AIDS) আক্রান্ত পতিতাদের পাঠিয়েছে যাতে আমাদের দেশে এইডস ছড়ায়?"

ওর লম্বা গল্প শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে থামানোর জন্য বললাম, "হ্যাঁ, শুনেছি"।

আমার বন্ধু জানে সে তার গোটা জীবন এদেশে কাটাবে; সে জানে যে এই দেশই তার সন্তানদের, তার নাতিদের এবং তার নাতিদেরও নাতিদের দেশ হবে। তবু সে এ দেশের পরিবেশ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়, কারণ সে এখানে এসেছে লুঠ করার জন্য এবং তার শত্রুদের ক্ষতি করার জন্য। ডাকাতির দর্শনের ধারণা তার মনের গভীরে গেঁথে গেছে সেই সঙ্গে এই দেশে বাস করার ইচ্ছাকে উৎসাহ দিয়েছে। সে মনে করে এখানে যে সুখ আরাম ভোগ করে এটা তার নিজস্ব লূঠের মাল আর তার কাজ, আমার মনে হল, শুধুমাত্র একজন মুসলমানের অন্যকে ক্ষতির চেষ্টা ।

মুসলমানরা ডাকাতি করে খায়, ডাকাতির পোষাক পরে, ডাকাতির কথা বলে এবং গাড়ী চালায় ডাকাতদের মতোই। আমি যে সত্যি বলছি তা বোঝার জন্য আপনি শুক্রবারে মুসলিম বিশ্বের যে কোন মসজিদে বক্তৃতা শুনুন। আপনাকে তাঁর ভাষা বোঝার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু তার চিৎকার শুনবেন এবং তার অঙ্গভঙ্গী দেখবেন, আপনি ডাকাতির কলাকৌশলের সাথে পরিচিত হয়ে যাবেন। আমি জন্মেছি এবং বড় হয়েছি একট ছোট শহরে যেখানে চারটে মসজিদ। চারদিকে চারটে— যেখানে শুক্রবারে লোকে নামাজ পড়ে।

শুক্রবারে শহরের সব কর্মকাণ্ড থেমে যায়। পুরুষেরা মসজিদে যায় নামাজ করতে আর মেয়েরা তাদের সন্তানদের নিয়ে বন্দী থাকে ঘরে, জানালা বা বারান্দা থেকে মসজিদের বক্তৃতা শোনে। বিভিন্ন মসজিদ থেকে আসা শব্দের মধ্যে কোন ঐক্য থাকত না। প্রত্যেক বক্তৃতাকারী উচ্চৈস্বরে বক্তৃতা করতেন আর সেই চিৎকার যেন কালা করে দিত। আমাদের বাড়ী ছিল একটা মসজিদের খুব কাছে, এত কাছে যে মনে হত যেন মসজিদের লাউডস্পিকারটি আমাদের শোওয়ার ঘরে রয়েছে। অন্যদের মত আমাদের পরিবারকেও এই তীব্র শব্দদূষণ সহ্য করতে হত।

পিছনের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে সেই দিনগুলি, তখন সেই অতি অল্প বয়সেই আমার অনুমতি ব্যতীত আমার জগতে কাউকে অত্যাচার করতে দিতে চাইতাম না। ভোর ৫ টায় আমার শোওয়ার ঘরে মুয়াজ্জিনের স্বর যেন ফেটে পড়ত এবং আমি নিজের সাথে যেন লড়াই করতাম, সেই অল্প বয়সেই, কিভাবে এর প্রতিবাদ করব ।কেন এত ভোরে আমার উপর এই আক্রমণ হবে? এ কি আমাকে ঈশ্বর এবং তার নবীর বাণী শোনাচ্ছে? নিশ্চয়ই ঈশ্বর শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে অতি কঠোর। আমি এই চিৎকার অগ্রাহ্য করতাম আবার একই সাথে অগ্রাহ্য করতে ভয়ও পেতাম।

আমার বিভ্রান্ত অবস্থা আরও বেড়ে যেত ঐ চিৎকারে মায়ের প্রতিক্রিয়া দেখে। আমার মা নিরক্ষর। তিনি কোন প্রকারে একটি শব্দ পড়তে বা লিখতে পারেন। অন্যান্য ভাষার থেকে আরবি ভাষা কিছুটা আলাদা। সরকারী ভাষা হিসাবে লিখত বা পড়তে যে ভাষা ব্যবহার হয় কথ্যভাষা থেকে সে ভাষা আলাদা। নিরক্ষর মানুষেরা কথ্যভাষায় যথেষ্ট সাবলীল, কিন্তু লেখা বা পড়ার জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তা বুঝতে প্রায় অক্ষম। আমার মা কখনো কোরআন বা কোন ইসলামি বই, এর শিক্ষা, বা ইতিহাস পড়েননি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্থানীয় মহিলারা মুখে মুখে যা বলত, মায়ের জ্ঞান তাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রচারক যা বলত, মা তার কিছুই বুঝতেন না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু'একটা শব্দ বুঝলেও, এটা নিশ্চিত যে তিনি কোন বক্তব্যই ঠিকমত বুঝতেন না। তা সত্ত্বেও মসজিদের প্রচারকের বক্তব্য

তাঁকে খুশী করে তুলত। তিনি প্রচারকদের বিচার করতেন গলার স্বরের তীক্ষ্নতা এবং তীব্রতা দিয়ে আর কতটা আবেগ তারা প্রকাশ করছে তার মাপকাঠিতে। তিনি কাউকে প্রশংসা করতেন আবার কাউকে নিন্দা।

আমার মা সেই চিৎকারে খুশী হতেন আর আমি ঘৃণা করতাম। আমি আমার নিজের মনে এ নিয়ে চিন্তা করেছি এবং ইসলামি পরিমণ্ডলে এই চিৎকার এবং আক্রমণের সংস্কৃতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, দু'জন মুসলমান পরস্পর কথা বলতে পারে না, কয়েক মিনিটের মধ্যে তা চিৎকারে পরিণত হয়। বিশেষত যদি মতদ্বৈধ থাকে, তাহলে কোন ভাল কিছুই বেরিয়ে আসে না। আপনি যখন কোন মুসলিমের সাথে যুক্তিসহ মৃদু, শান্তস্বরে কথা বলেন তখন আপনার বক্তব্য বুঝতে তার অসুবিধা হয়। সে মনে করে আপনার কোন যুক্তিই নেই। একজন মুসলিম যখন অন্যের সাথে কথা বলে—মুসলিম বা অমুসলিম—অন্যজন কি বলেছে তার একটি শব্দও মনে রাখতে পারে না। ঠিক যেমন আমার মা স্থানীয় মসজিদের প্রচারক কি বলেছে তার একটি শব্দও মনে রাখতে পারত না।

*আল-কুরতুবী ছিলেন বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত (১২১৪-১২৭৩)। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত হল তাফসির আল-কুরতুবী। এটি দশ খণ্ডে লিখিত কোরানের আয়াতের ব্যাখ্যা যে আয়াতগুলি ইসলামি আইন সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

মুসলমান পুরুষ এবং তাদের নারী

মুসলিম বিশ্বে ভয় যেভাবে প্রবেশ করে ঠিক সেভাবেই পুরুষরা মেয়েদের সাথে আচরণ করে। বিভিন্ন উপায়ে কুৎসিৎতম এবং চরম ঘৃণাসহ মুসলিম জগৎ অন্যদের সাথে যে আচরণ করে ঠিক তেমনই।

আমি তখন মেডিকেল কলেজে চতুর্থ বৎসরে। বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিভাগে তখন আমি শিক্ষানবীশ ছিলাম। একদিন এক মহিলা সেখানে এলেন এবং বিভিন্ন ধরণের উপসর্গের কথা জানালেন। যখন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করেন তিনি দেখেন তার উরু এবং তলপেটে ছোট পয়সার মত গোল অনেকগুলি পোড়া দাগ। সেদিন যে ডাক্তার ছিলেন তনি হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রধান। জিজ্ঞাসা করলেন, "এগুলি কি?"

মহিলাটি অত্যন্ত বিব্রতভাবে দু'হাতে মুখঢেকে প্রায় শোনা যায় না এমন মৃদুস্বরে বললেন, আমি নির্বোধ বলে আমার স্বামী আমার গায়ে সিগারেট নিভিয়ে শাস্তি দেন।

একমূহুর্ত চিন্তা না করে ডক্টর সাদ বললেন: "তোমাকে এমন করাই উচিৎ। তুমি সত্যিই নির্বোধ না হলে সে এটা করত না"। সব ছাত্ররা হেসে উঠল, শিক্ষকের অহংবোধকে তুষ্ট করতে আমিও হাসলাম। যে শিক্ষককে আমরা সবাই সন্তুষ্ট করতে চাইতাম।

ডক্টর সাদ ডাক্তারি পড়েছেন ব্রিটেনে। তিনি প্রায়ই আমাদের ঈশ্বরবিমুখ ইংরেজ নারীদের নির্লজ্জ আচরণের কথা বলতেন। তিনি ব্রিটেনে নির্লজ্জতা ছাড়া আর

কিছুই দেখেননি। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তিনি সেখানে শিখেছিলেন নারীর প্রতি একজন ডাক্তারের নৈতিক এবং আইনগত দায়িত্বের কথা, যে নারী অত্যাচারিত হয়েছে।

হাসপাতালের জরুরী বিভাগের ঘরে, যেখানে আমি কাজ করতাম, টেলিফোন বেজে উঠল। আমি ফোন তুললাম এবং অবাক হয়ে শুনলাম অন্য প্রান্তে রাগত গলায় একজন বললেন: “ডক্টর আহমদ বলছি। আমি একটা বেশ্যাকে পাঠাচ্ছি। ওর যোনি খুলে সেখানে যা আছে সেটা বার করে দাও!” আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ না দিয়ে তিনি ফোন রেখে দিলেন। আমার সমস্ত শরীর ভয়ে কেঁপে উঠল, মনে হল জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। এমন রাস্তার ভাষায় কোন মহিলার সাথে কথা বলা প্রমাণ করে নারীত্বের প্রতি তার ঘৃণা কতটা গভীর। বিশেষত সেই মহিলা যদি হন একজন ডাক্তার এবং বক্তা তার সহকর্মী।

ডক্টর আহমদ ছিলেন শহরের মেডিকেল প্রশাসনের প্রধান এবং প্রচুর সংখ্যক রোগী তার ব্যক্তিগত ডাক্তারখানায় যেত আর অনেক বেশী ফি দিত যা অন্য ডাক্তাররা চাইতেই পারত না। সেটা এজন্য নয় যে তার সম্মানের প্রতি রোগীদের বিশ্বাস ছিল; এতে তারা সরকার পরিচালিত হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ পেত।

সুহা, যে অল্পবয়সী মেয়েটিকে ডক্টর আহমদ “একটি বেশ্যা” বলেছিলেন; টেলিফোনে কথা হওয়ার প্রায় আধ ঘন্টা পরে জরুরী বিভাগে এসে পৌঁছল। সে একটা রোগা, ফ্যাকাশে মেয়ে, যার বয়স কুড়ির নীচে। তার গায়ে একটা কম্বল যা দিয়ে ফেব্রুয়ারীর কনকনে ঠাণ্ডায় শীত আটকানো যায় না। সে যখন রোগী পরীক্ষা করার টেবিলের দিকে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন একটা রুগ্ন হাঁস টেনে টেনে যাচ্ছে যার মৃত্যুর আর দেরী নেই। যোনি পরীক্ষা করে দেখা গেল একটা মাঝারি মাপের শঙ্কু আকৃতির গ্লাস ভিতরে রয়েছে।

“এটা কি, সুহা?”

সে দু'হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলল: "ওদের একজন জোর করে আমার যোনিতে ওটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। "

"ওদের একজন বলে কি বলতে চাইছ?"

"মিস্টার 'x'এর অফিসে আমি পরিষ্কার করার কাজ করি, মাসিক একটা মজুরী দেয়, যে টাকা দিয়ে আমি আমার কর্মহীন বাবা আর সাত বোনের সংসার চালাই"।

"কিন্তু সে এটা করল কেন?"

"সে বলেছিল আমি নোংরা এবং তার বীর্য্য এত পবিত্র যে আমার শরীরে তা ছোঁয়ানো যায় না"।

সে ভাঙা গলায় কাঁদত কাঁদতে বলল "আমার মনে হয় আমি নোংরার থেকেও নোংরা"।

আমি যখন একটি গ্রামীণ এলাকায় কাজ করতাম তখন একদিন এক কৃষক মহিলা এল, ফতিমা, যার বয়স প্রায় চল্লিশ। তার সমস্যা বমি ভাব, বমি এবং পিঠে ব্যথা। পরীক্ষায় তার জরায়ুর মাপ দেখে বোঝা গেল সে তিন মাসের গর্ভবতী। আমি তাকে এই কথাটা বলা মাত্র ধপ করে পিছনের চেয়ারে বসে পড়ল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজের গালেই চড় মারতে শুরু করল। বেশ জোরেই বলল, "আমি ভিক্ষে চাইছি ডাক্তার, দয়া করে আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাও। আমার ছেলে আমাকে খুন করে ফেলবে। আমি মারা গেলে কিছু হবে না, আমার মরাই উচিৎ। কিন্তু আমি চাই না আমার নোংরা রক্ত আমার ছেলের হাতে লাগুক।

"এ কি বলছ ফতিমা?"

"আমি বিধবা। চার সন্তান রেখে পাঁচ বছর আগে আমার স্বামী মারা যায়। আমার ছেলেমেয়েদের খাবার দেওয়ার বিনিময়ে আমার স্বামীর ভাই আমাকে প্রতিদিন ধর্ষণ করে। আমি গর্ভবতী জানলে সমাজে অপমানের ভয়ে সে আমার ছেলেকে বলবে আমাকে খুন করতে।

"তোমার ছেলের বয়স কত?"

"পনের বছর। ডাক্তার আমি ভিক্ষে চাইছি। আমি চাই না আমার নোংরা রক্তে ওর হাত নোংরা হোক"।

আমি ওকে একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠালাম। প্রায় দু'সপ্তাহ পরে সে আমার সাথে দেখা করতে এল। প্রায় কঙ্কালসার, ক্লান্ত, অসুস্থ।

"কি হয়েছে, ফতিমা?"

"আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। আমি ভ্রূণটা থেকে মুক্তি পেয়েছি, কিন্তু আমি নিজের চোখে মৃত্যুদূতকে দেখেছি। ওরা কোন যন্ত্রণানাশক ছাড়াই অপারেশনটা করেছিল, আর যন্ত্রণায় আমি প্রায় মরেই গিয়েছিলাম"।

"কোন যন্ত্রণানাশক ছাড়াই করেছে? কেন?"

"যন্ত্রণানাশক ওষুধ কেনার টাকা আমার ছিল না। সেজন্য ওটা ছাড়াই ডাক্তারকে অপারেশন করতে হয়েছে"।

আমাল—যে আমাল আমেরিকাকে ঘৃণা করে সে নয়,—একজন ডাক্তার, আমার সাথে একই হাসপাতালে কাজ করত। একদিন শুনলাম সে ছুটতে ছুটতে চক্ষু বিভাগে এসেছে; আগের রাত্রে কোন রাসায়নিকে তার মুখ এবং চোখ পুড়ে গেছে। আমি তখনই তার ঘরে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম "কি হয়েছে, আমাল?"

"বাথরুমে জল গরম করার যন্ত্র চালু করতে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। একটা জ্বালানী তেল ভরা পাত্র মাথায় পড়ে কিছু জায়গা পুড়ে গেছে"।

কিছুদিন পর, আমি আর আমাল একা ছিলাম এবং একেবারে ব্যক্তিগত কথা বলছিলাম। সেদিন সে আমাকে বলল সত্যি কি ঘটেছিল। "সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি আমার এক বন্ধুর বিয়েতে যাব বলে তৈরী হচ্ছিলাম। আমার পনের বছরের ছোট ভাই, যে স্কুল পাশ করেনি, সে এসে আমাকে বাড়ীর বাইরে যেতে নিষেধ করল। যখন আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেছি তখনই সে জ্বালানিভরা পাত্রটা পুরো আমার মাথায় ঢেলে দেয়। আমার বয়স প্রায় চল্লিশ, ওয়াফা, কিন্তু আমি এখনও একজন স্বামীর স্বপ্ন দেখি যে আমাকে আমার বাবা এবং ভাইয়ের সাথে থাকার জীবন

থেকে রক্ষা করবে। তারপর সে বলল, “কিন্তু কি নিশ্চয়তা আছে যে আমার ভবিষ্যৎ স্বামী এদের থেকে ভাল হবে। এ একটা ফাঁদ এবং এর থেকে বেরনো অত্যন্ত কঠিন। আর ভাব, যখন আমার মাকে একথা বলতে গেলাম তিনি বললেন, ‘তোমার যা পাওয়া উচিৎ, সেটাই তুমি পেয়েছ। আমি তোমাকে বারবার সাবধান করেছি তোমার ভাইয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে না যেতে। এখন তুমি তোমার নিজের গোঁয়ার্তুমির দাম দিচ্ছ’। ওয়াফা, আমি কখনও কখনও ভাবি কেবলমাত্র পুরুষরাই মেয়েদের বিরুদ্ধে নয়, মেয়েরা নিজেরাও মেয়েদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে। আমি বিজ্ঞান শিখেছি, পড়াশোনা করেছি; তাও আমার নিজের জীবন নিজে পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয়; অথচ আমার ভাই যে নিজের নামটাও লিখতে জানে না, সে আমার নিজের থেকে আমার ভাল বেশী বোঝে।

‘হামা’-র পরেই আলেপ্পো ছিল মুসলিম ব্রাদারহুডের শক্ত ঘাঁটি এবং সেখানে তারা অনেক অপরাধ ঘটিয়েছিল। সেখানে জীবন অসহ্য লাগছিল। সেজন্য স্থির করলাম অন্য শহরের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে যোগ দেব, অতএব আমার পরবর্তী ঠিকানা হল লাটাকিয়া। লাটাকিয়া ভূমধ্যসাগরের তীরে যেন একটা নিদ্রিত শান্ত শহর। যেখানে আমি জন্মেছিলাম এবং বড় হয়েছিলাম সেই বানিয়াসের উত্তরে লাটাকিয়া।

সেই সময়ে লাটাকিয়াতে দুটো প্রশিক্ষণ হাসপাতাল ছিল। যেটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ভীড় কম আমি সেটিতে আবেদন করলাম এবং তৎক্ষণাৎ গৃহীত হল। এটি একটি সৈনিক হাসপাতাল যেখানে সিরিয়ার সৈনিক ও তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা হত। আমার আলেপ্পো ত্যাগের সিদ্ধান্তে মোরাদ মানসিকভাবে প্রায় ভেঙ্গে পড়ল। তার সামাজিক সমস্যা এবং মায়ের থেকে দূরে; সে বেশীর ভাগ সময় আমার সাথে কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার মনে হল আমি যদি চলে যাই আমাদের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে দু’বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছিল, কিন্তু

যে বিষয় নিয়ে সে পড়েছে তা নিয়ে কোন কাজ করছিল না। সে আমার কাছাকাছি থাকতে চাইছিল এবং সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনেই একটা ছোটখাট চাকরী নিল।

আমার মা আলেপ্পোতে বেশ কয়েকবার আমার কাছে এসেছেন। সেখানে তিনি আহমদ এবং হুদার সঙ্গে থাকতেন। তাঁর সাথে মোরাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না; যাতে তিনি আহমদ বা হুদার কাছ থেকে শুনে আঘাত না পান। প্রথম থেকেই তিনি মোরাদকে পছন্দ করেছিলেন কিন্তু তিনি যে আমাদের সম্পর্ককে মান্যতা দিচ্ছেন সেই মনোভাব আমার কাছে গোপন করেছিলেন। তিনি একদিকে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ করাকে উৎসাহ দিতেন যাতে আমাদের বিয়েটা হয় আবার সম্পর্কটা চিরাচরিত সীমার বাইরে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন যাতে বিয়ের ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়ার দায়িত্ব তাঁকে নিতে না হয়। আমাদের সমাজে কোন নারী, এমনকি তিনি যদি মা-ও হন, এ ধরণের বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারেন না। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন, “একটু অপেক্ষা কর, দেখ তোমার ভাই কি বলেন”।

আমার আলেপ্পো ত্যাগের সিদ্ধান্ত মোরাদের সাথে আমার সম্পর্কটাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল। সে যেন একেবারে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ল। ফলে ভাইয়ের সাথে তার দেখা করতে দেওয়া আর ভাইকে বলা যে সে আমাকে বিয়ে করতে চায়, এ ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না। কোন প্রস্তুতি ছাড়া হঠাৎ করেই আমরা সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম। তার কাছে এটুকু টাকাও ছিল না যে সে আমার জন্য একটা বিয়ের আঙটি কিনতে পারে, সংসার চালানোর টাকার কথা ছেড়েই দিলাম। আমি মনে মনে জানতাম আমার ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া কি হবে। যে মানুষ বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমাকে সম্মানের চোখে দেখে এসেছে, সে আমার সুখের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। মোরাদ আমার ভাইয়ের সাথে দেখা করে নিজের পরিচয় দিয়ে তাদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানাল। আমার ভাই সাগ্রহে সম্মতি দিলেন।

মোরাদ আমার ভাই এবং তার পরিবারের সাথে দুপুরে খেতে বসেছিল। এটা সিরিয়ার প্রথা যে প্রথম সাক্ষাতে অতিথি অবশ্যই দুপুরে আমন্ত্রণকারীর বাড়ীতে খাবে,

বিশেষত সেই অতিথি যদি দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসে। মোরাদের বয়স তখন সাতাশ। সংস্কৃতিসম্পন্ন, অনুভূতিপ্রবণ, মৃদুভাষী মানুষ যে সরাসরি অন্যের মুখের দিকেও তাকায় না। কিন্তু সেদিন সে সপ্রতিভভাবে যথেষ্ট ভদ্রতাসহ আমাদের সম্পর্কের কথা ভাইকে বলল—খুব একটা সবিস্তারে না গিয়ে—এবং আমাদের বিয়েতে তার সম্মতি পাওয়া যাবে এমন আশা প্রকাশ করেছিল। আমার ভাইয়ের উষ্ণ আচরণ এবং প্রতিটি কথা শোনার আগ্রহ পরিস্থিতিকে অনেক সহজ করে দিয়েছিল। বিদায় নেওয়ার সময় করমর্দন করে ভাই মোরাদকে বলেন," তোমার সাথে দেখা হওয়া খুবই আনন্দের। আমাকে একটু সময় দাও বোনকে জিজ্ঞাসা করার জন্য যে সে কি ভাবছে। কারণ সিদ্ধান্ত তার, আমার নয়। আমি তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই!"

মোরাদের সাথে দেখা হওয়ার পরে ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ আমি জীবনে কখনও ভুলব না। নিঃসন্দেহে সেটা আমার জীবনে সবথেকে কঠিন মূহুর্ত্ত। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি মোরাদের সম্পর্কে কতটা জানি এবং আমি আমার সমস্ত বিবেক ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে তাকে বিয়ে করতে চাইছি কি না। তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, তিনি কোনভাবেই কোন আপত্তি তুলবেন না, তবে তিনি চান আমি যেন বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিই এবং তাড়াহুড়ো না করি। কারণ তখনও আমার বয়স বেশী নয় এবং আমার পাশ করে বেরোতে এক বছর বাকী। আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ভাইকে মোরাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার কথা বললাম এবং জানালাম যে তার সাথে আমার পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আমাদের বিভিন্ন দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে আমার মনে হয়েছে যে সে আমার উপযুক্ত জীবন-সঙ্গী হবে।

ভাই আমার সিদ্ধান্তকে আশীর্বাদ করলেন এবং মোরাদকে ফোন করে অভিনন্দন জানালেন। আমি আমার বোনের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করলাম। বোন আমার থেকে এক বছরের বড়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়ে একটা ভাল চাকরী করত। সেই টাকা দিয়ে আমি মোরাদ এবং আমার জন্য দু'টো আঙটি কিনলাম আর মোরাদকে এ ঘটনার কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করলাম এবং আমার

বোন যে টাকাটা দিয়েছে তাও না জানাতে। মোরাদ একজন শেখকে নিয়ে আঙটি দু'টো সহ আমাদের বাড়ীতে এল যেন সে নিজেই কিনেছে। মুসলিম রীতি অনুযায়ী বাগদান পর্ব নির্বিঘ্নে শেষ হল। যদিও মুসলিম রীতি প্রকাশ্য উৎসবের মাধ্যমে বিয়েকেই সমর্থন করে তবু সতর্কতা হিসাবে এই বাগদানের উপর জোর দেয় একটিই কারণে: যদি দম্পতি কোন কারণে মন বদলায়, মেয়েটি অন্য কাউকে বিয়ে করার সুযোগ হারাতে পারে, কারণ বেশীরভাগ পুরুষই অন্যের বাগদত্তাকে বিয়ে করতে চায় না।

আমরা বাগদান করেছিলাম আগষ্টে এবং সেই মাসেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমাদের এই সিদ্ধান্তে ভাই খুব একটা খুশী হয়নি কারণ তার মতে এটা তাড়াহুড়ো করা। লোকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত রমজানের শেষ এবং বকরীদ-এর থেকে দু'মাস দশ দিনের মধ্যে বিয়ে করা অশুভ। আমার ভাই এরই সুযোগ নিয়ে বিয়ে পিছিয়ে দিতে বললেন এটা আশা করে যে এই সময়ের মধ্যে আমি মত বদলাতে পারি, কিন্তু আমি বকরীদের পরেই বিয়ের সিদ্ধান্তে স্থির রইলাম। লাটাকিয়াতে যে হাসপাতালে আমি যোগ দিয়েছিলাম তার কাছেই একটি সুসজ্জিত ঘর ভাড়া নেওয়া হল। ১০ই অক্টোবর বন্ধু ও পরিবারের মানুষদের নিয়ে একটা ছোট অনুষ্ঠানে আমরা সবাইকে বিদায় জানিয়ে নতুন জীবনের পথে বানিয়াস ত্যাগ করলাম।

আমার স্বামী লাটাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী ছেড়ে আলেপ্পো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরি নিলেন। সেখানকার আয় থেকে আমাদের ঘরের ভাড়া দেওয়া এবং কিছু অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র কেনা হল। আমার পরিবার থেকে মাঝে মাঝে পাওয়া টাকা দিয়ে আমি বাকীটা পূরণ করলাম। আমাদের বিয়ের অব্যবহিত পরেই আবিষ্কার করলাম আমি গর্ভবতী। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। আমরা দু'জনেই এক নতুন সমস্যার মুখোমুখি হলাম যার সমাধান নির্ভর করছে পিতা-মাতার কর্তব্য পালনে আমাদের ক্ষমতার উপর। আমি গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নিলাম, কিন্তু আমার মা প্রচণ্ড আপত্তি জানালেন এবং বললেন এ ঘটনা শুধুমাত্র তার মৃতদেহের

উপর দিয়ে ঘটতে পারবে। ফলে গর্ভাবস্থা রক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় রইল না। সিরিয়ার সমাজ কারো গোপনীয়তা রক্ষা করতে অনুমতি দেয় না, একা কোন সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না; সমাজ এবং উভয় পরিবারের মতই গ্রহণ করতে হবে।

যে কোন ভাবেই হোক, আমার বিবাহ আমাকে আমার পরিবার ও সামাজিক চাপ থেকে কিছুটা মুক্তি দিল। ইসলামে স্ত্রীর উপরে তার স্বামীর অধিকার তার বাড়ীর আসবাবপত্রের উপর অধিকারেরই সমান। আমার মা এটা ভালই জানতেন, এবং তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে তিনি এরই সুযোগ নিলেন এবং জানালেন পরিবার থেকে আমাদের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন, আর তিনিই জয়ী হলেন। আমি খুশী যে তিনি এটা করেছিলেন, কারণ 'মাজেন', আমাদের ছেলে সেই গর্ভাবস্থারই ফল। ১লা অগষ্ট, ১৯৮১; একমাসব্যাপী রমজানের উপবাসশেষে উৎসবের প্রথম দিন আমি মাজেনের জন্ম দিলাম। ভাগ্যক্রমে আমার ভাই সেদিন আমাকে দেখতে এসেছিলেন এবং শুনলেন আমি হাসপাতালে। আর ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিজার করার, কারণ আমার প্রসবে বেশ কিছু জটিলতা ছিল।

অপারেশন থিয়েটার থেকে আমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাওয়ার পথে, তখনও আমি যন্ত্রণানাশকের প্রভাবে ছিলাম, তিনি আমার কাছে এলেন যেখানে আমি শুয়ে ছিলাম। আমার কপালে একটা চুমু দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "অপারেশন করতে হয়েছে বলে বিচলিত হয়ো না। তুমি একটা ছেলে পেয়েছ, যে তার মামার মতই সুদর্শন"।

তিনি হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার আগে আমি তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পাইনি, কারণ বাস স্টেশন বন্ধ হওয়ার আগে তাঁকে লাটাকিয়া থেকে বানিয়াস যাওয়ার বাস ধরতে হত। সেদিন হাসপাতাল থেকে চলে যাওয়ার পর আমি আর কোনদিন তাঁকে দেখিনি। ভাগ্যের এ এক পরিহাস যে একহাতে দেয় আবার অন্য হাতে নিয়ে নেয়। ভাগ্য আমায় মাজেনকে দিয়েছিল এবং সেইদিনেই মহম্মদকে নিয়ে নিয়েছিল। আমার ভাই বাড়ী পৌঁছানোর দশ মিনিটের মধ্যে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মারা যান। তখন তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ বছর।

মহম্মদের মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম এবং কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সেই সাথে আমার পারিবারিক এবং সামাজিক দায় থেকে কিছুটা মুক্তি মিলল। তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে আমি ভালবাসতাম এবং শ্রদ্ধা করতাম। শুধু তাঁর জন্যই বিভিন্ন সামাজিক রীতি আমি মেনে নিতাম যাতে আমাদের সম্পর্ক অটুট থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর এমন কেউ আর রইল না যার মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। এমনকি আমার বিয়ের পরেও আমার মনে হত ভাই সরাসরি না বললেও তিনি যাতে খুশী হন তেমন কিছু করাই আমার উচিৎ। আমি জানতাম তিনি কি চাইতেন আর কি চাইতেন না, এবং আমি তাঁকে খুশী করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। আমার বিয়ে এবং তাঁর মৃত্যুর পর আমি অপেক্ষাকৃত দায়মুক্ত হলাম। আমার অন্য ভাইদের মতামত বিষয়ে আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না, বিশষত আমি তখন বিবাহিত, এবং, ইসলামের চোখে আমার স্বামীর খাস সম্পত্তি।

পাঁচ বছর হয়ে গেল আমি আমার পরিবারের বাইরে মোরাদের সাথে আছি। এর ফলে আমি নিজেকে নিয়ে ভাবার সুযোগ পেয়েছি এবং আমার ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে একটা আকার পেয়েছে। বিয়ের পরে, মোরাদের সাথে আমার ঘরের জীবন আমাদের বাইরের জীবনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আমরা একটা বিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা করলাম যা অন্য মানুষদের থেকে আলাদা, আমরা নিজেদেরকে নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ করে ফেললাম।

আমি ছিলাম অত্যন্ত আগ্রহী পাঠক। পাশ্চাত্যের জীবন সম্পর্কে যে কোন কিছুই আমাকে খুব টানত। যে জীবন আমাদের আদর্শগত বন্দীশালায় আবদ্ধ জীবনের থেকে বহুদূরে। আমার বোনের এক বন্ধু একটা সাধারণ লাইব্রেরীতে কাজ করত। তার মাধ্যমে আমি অনেক বই পেতাম, এবং দীর্ঘদিন ধরে আমার অভ্যাস ছিল বিভিন্ন প্রবন্ধ ফটোকপি করে রাখা। আমাদের এক প্রতিবেশী, লেবাননের মানুষ, আমি যে বই চাইতাম তিনি সেই বই চোরাপথে তার দেশ থেকে ফেরার সময় এনে দিতেন। পরিবর্তে বিনা পয়সায় আমি তার এবং তার পরিবারের চিকিৎসা করতাম।

তিনি একবার একজন সৌদি লেখক ও চিন্তাবিদ আবদুল্লা আল-কাশিমির লেখা দু'টি বই এনে দিয়েছিলেন। সৌদি আরব সেই লেখকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল। তিনি পাশ্চাত্যের কোথাও পালিয়ে গিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত কেউ জানে না তার কি ঘটেছে। তার দু'টি বই, "The World is not a mind" এবং "This Universe—What is its Conscience?" যখন পড়লাম, আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে একটা ধাক্কা দিল। বইদু'টির বক্তব্য যেন আমার জীবনকে ওলোট-পালট করে দিল। আমার স্বামী এবং আমি প্রতিদিনই বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতাম যেগুলি আমরা জীবনে পালন করতাম। আমরা কি পড়ি তা কাউকে বলতে সাহস পেতাম না পাছে আমাদের বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগের অভিযোগ আসে। আমরা যা পড়তাম তা থেকে আমার স্বামী গ্রহণ করতে পারত আমার চেয়ে অনেক বেশী। বর্তমানের বেশীর ভাগ মুসলমানের মত আমি একটা বিশ্বাসে ভর করে সবকিছু ব্যাখ্যা করতাম যে বিশ্বাসের বিরোধী কিছু ঘটলে আমি ভয় পেতাম। আমি বিশ্বাস করতাম, ইসলামের চেয়ে সাধারণ মানুষের ইসলাম ব্যাখ্যা মুসলিম দেশগুলির দুর্দশার জন্য দায়ী। আমার স্বামী এই ক্ষেত্রে আমার সাথে সহমত পোষণ করত না। কিন্তু এই মতপার্থক্য আমাদের উষ্ণ বন্ধুত্বের বন্ধনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলত না এবং আমরা দু'জনেই পরস্পরের মতকে সম্মান করতাম।

প্রথম থেকেই আমার স্বামী অনুভব করেছিল যে আমার বিশ্বাস, অর্থাৎ ইসলামের চেয়ে মুসলিমদের দোষই বেশী, সমাজে বাস করার ক্ষেত্রে হয়ত কোন ভয়াবহ পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। যে সমাজ কোন ব্যক্তিবিশেষকেই ধর্মীয় নিষেধের বাইরে একটা পদক্ষেপও করতে দেয় না। সে কারণে আমার চিন্তা ভাবনায় কোন আপত্তি করত না, যেমন আমিও করতাম না। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা যখন কারো সাথে কোন আলোচনা করতাম আমি সতর্ক প্রহরীর ভূমিকায় মোরাদের প্রতিটি কথায় তীক্ষ্ণ নজর রাখতাম। আর যখনই মনে হত মোরাদ বিপদসীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছে তখনই কথার মাঝে ঢুকে মোরাদের মন্তব্যের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টাকে অনেকটা গ্রহণযোগ্য করে তুলতাম।

আমি খুবই সাবধান থাকতাম যেন কখনোই বিপদসীমা অতিক্রম না করি, সে কারণে মোরাদ যখন তার মনের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করতে চাইত তখন আমি তাকে রক্ষা করব ভেবে অনেকটা নিরাপদ বোধ করত। তার শৈশব এবং তার জীবনের নানা পরিস্থিতি তাকে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে সমস্যাটা ইসলামের মধ্যেই, আর মুসলমানরা তাদের বিশ্বাসেরই শিকার।

আমার বিয়ের প্রথম পাঁচ বছরে আমি ধীরে ধীরে চিন্তার অন্য স্তরে পৌঁছলাম। ইসলামের বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির সত্যতা বিষয়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতাম এবং উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করতাম। আমরা গোপনে বই দেওয়া নেওয়া করতাম, যেন সেগুলি আফিম। আল-কাশিমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন এবং ইসলামকে আক্রমণ করেছিলেন। এমনভাবে সবকিছু বিশ্লেষণ করেছিলেন যে পুরোপুরি বদ্ধ মনও থমকে যায় এবং ভাবতে বাধ্য হয়। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত সৃষ্টিশীল লেখক। আরবিতে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। তাঁল লিখনশৈলী ছিল উপভোগ্য এবং সহজবোধ্য যা পাঠককে এমন সূক্ষ্ম ভাবে বিষয়ের গভীরে নিয়ে যেত যে তখন পাঠক তাঁর মতকে সমর্থন না করে পারত না, অন্তত ব্যক্তিগত পরিসরে। তিনি ছিলেন ইসলামের জন্মভূমি আরবের মানুষ, ফলে তাঁর আলাদা একটা বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল। তাঁর বই সহজে পাওয়া যেত না, কিন্তু আমরা একটা উপায়ে বই যোগাড় করতাম এবং ভাগ করে পড়তাম। আমার মনে পড়ে আমি যে হাসপাতালে কাজ করতাম সেখানে একটি অল্পবয়সী মেয়ে, কুড়ির কাছাকাছি বয়স, আমাকে বলেছিল সে আল-কাশিমির বই পড়েছে। সে আমার কাছে একটি বই চাইল। আমি বইটি আমার একটা দামী পোষাকে মুড়ে তাকে দেওয়ার সময় বেশ জোরে সকলকে শুনিয়ে বলেছিলাম সে তার বোনের বিয়েতে পোষাকটি পরতে পারে তবে পরে ফেরৎ দিতে হবে।

মিশরীয় ডাক্তার নওল এল-সাদাবি, তিনিও আমার চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন আনতে বিশেষ ভূমিকা নেন। যদিও তাঁর বই আল-কাশিমির বইয়ের মত অতটা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল না, তাঁর মতবাদ সমাজের বেশীর ভাগ অংশেই অভিশপ্ত বলে বিবেচিত

হত। তিনি যেন আমার পরামর্শদাত্রী হয়ে উঠলেন। তাঁর বই আমাকে ভবিষ্যতের জন্য ক্ষীণ আশার আলো দিল যে আমাদের সমাজের কোন কিছুই বর্তমানে যা আছে তার থেকে উন্নত হতে পারবে না। তাঁর বই “The female is the source” পড়ার পরে আমার মনে হল যেন আমি নেশাগ্রস্ত অচেতন অবস্থা থেকে জেগে উঠলাম। যে সমাজ বিশ্বাস করে নবী মহম্মদের বিধান এই যে কারো নামাজের সময় কোন কুকুর বা নারী তার পাশ দিয়ে গেলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে; সেই সমাজের কোন লেখিকার পক্ষে লেখা খুবই কঠিন যে নারীই সবকিছুর উৎস।

আমি যে সমাজে বাস করতাম ডক্টর এল-সাদাবিও সেই সমাজে বাস করতেন—যে সমাজ নারীকে শুধু নোংরাই ভাবে না, উপরন্তু ভাবে, যে এই কথা মানে না সে অবিশ্বাসী এবং হত্যার যোগ্য। এমন সমাজে ডক্টর এল-সাদাবির পক্ষে তাঁর যুক্তি প্রমাণ করা সহজ ছিল না, আমার মত মানুষের পক্ষেও সহজ ছিল না তাঁর মতবাদ পালন করা। আমার কাছে ডক্টর এল-সাদাবি আজও একজন আদর্শ এবং উদাহরণ, এবং আমি স্বীকার করি আজ আমি যে মানুষটা হয়ে উঠতে পেরেছি তাকে তৈরীতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

১৯৮৪ সালে আমার স্বামী একটি সিরিয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে শিক্ষাদানের পদ্ধতি নিয়ে পড়াশোনার জন্য ব্রিটেন যান। সে সময়ে তিনি সিরিয়ার তিসরীন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর এই যাত্রা ছিল আমাদের জীবনে আর একটি বাঁক। আমরা যা কিছু বইয়ে পড়েছি তিনি বাস্তবে সেগুলি দেখেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সমাজকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যেমন অবাক হয় একজন কয়েদী, যার জন্মই হয়েছে গরাদের পিছনে, যখন প্রথম বাইরের পৃথিবীকে দেখে।

তিনি আমাকে একটি গোপন চিঠিতে বললেন: “মাজেনকে নিয়ে ব্রিটিশ দূতাবাসে যাও এবং সবকিছু ফেলে রেখে বেরিয়ে এস। জীবন এখানে সম্পূর্ণ অন্যরকম, যা এখন বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়”। স্বাভাবিকভাবেই, আমি ও রকম কিছু করতে চাইনি। আমি জানতাম সে ইংল্যাণ্ডে আছে সিরিয় সরকারের খরচে, নির্দিষ্ট

সময় শেষ হলেই তার ভিসাও শেষ হয়ে যাবে এবং তার এমন কোন বিশেষ দক্ষতা নেই যাতে সেখানে নতুন করে জীবন শুরু করা যায়। সে ব্রিটেনে ছিল তিন মাস, তারপর আমার অনুরোধে ফিরে আসে। তার ব্রিটেন বাসের অভিজ্ঞতা যেন সারাক্ষণ তাকে ঘিরে রাখত আর সেখানকার কথা বলত তার বাড়ী ফেরার দিন থেকে চার বছর পর যেদিন সে যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা করে সেইদিন পর্যন্ত।

তাঁর তিন মাসের ব্রিটেন বাস তার বদ্ধমূল ধারণাকে আরো দৃঢ় করল যে মুসলমান সমাজে আমরা একটা বিশেষ মতবাদের দাস, যে মতবাদ মানুষকে সম্মান করে না এবং তার ভাবনাকেও কোন মূল্য দেয় না। কিছু কারণে তখনও আমি এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতাম আর জোরের সাথেই বলতাম যে ইসলাম নয় ইসলামের অনুসারীরাই আসল সমস্যা। আজ যখন পিছন ফিরে তাকিয়ে আমার এই ভাবনার কারণ খুঁজি, তখন আমার এই দৃষ্টিভঙ্গীর কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাই না মাত্র একটা ছাড়া। সে কারণ হল বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তি, আমার জীবন ও নিরাপত্তার তাগিদে যে মত আমাকে মেনে নিতে হয়েছিল।

আমাদের অজান্তেই নতুন বিশ্বাস আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল। আমরা আর কোন ধর্মীয় প্রথা পালন করতাম না এবং উপবাসের মাসে পরিবারের সাথেও দেখা করতে যেতাম না। উপরন্তু, আমাদের মনোভঙ্গী পরস্পরের প্রতি আচরণে প্রভাব ফেলেছিল। আমাদের বেশীরভাগ পরিচিত বলত আমি কর্তৃত্বকারী মহিলা এবং আমার স্বামী দুর্বল। যখন কোন মানুষ তার স্ত্রীকে সম্মান করে এবং তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়, তখন তাকে দুর্বল ভাবা হয় আর স্ত্রীকে ভাবা হয় কর্তৃত্বকারী। যখন আমার মা আমাদের কাছে আসতেন, আমার স্বামীর সাথে আমার আচরণে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। যেমন, আমরা যখন খাবার টেবিলে বসে, তখন হয়তো স্বামীকে এক গ্লাস জল আনতে বললাম। আমার মা পরিচিত ছিলেন চিরাচরিত প্রথার সাথে, যেখানে ভাবা হয় স্ত্রী স্বামীর দাসী এবং তার জন্য স্বামীকে কিছু করতে বলা খুবই অস্বাভাবিক। আমি মায়ের সাথে তর্ক করতাম আর তিনি প্রায়ই আর কখনো আসবেন না প্রতিজ্ঞা করে চলে যেতেন।

আমার দুই ভাইও কম সমালোচনা করত না আমার আর আমার স্বামীর আচরণের। খানিক ঠাট্টাচ্ছলে, খানিক সত্যি সত্যি স্বামীকে আমার দাস বলত। আমার স্বামী এসব ঠাট্টাকে উদারতার সাথে দেখত এবং জোরের সাথে বলত যে আমি এমন একজন নারী যার ভদ্র ব্যবহার পাওয়া উচিৎ। আমাদের "অদ্ভুত" বিশ্বাস—অন্যেরা যেমন ভাবত—আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, অনেক সময় আমাদের বলা হত মার্ক্সবাদী, কারণ লোকে বিশ্বাস করত যে যারা ইসলাম থেকে বিচ্যুত তারা নিরীশ্বরবাদী কমিউনিস্ট।

আমি ১৯৮১ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করি, মাজেন-এর জন্মের তিনমাস পর। সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার হিসেবে চাকরী পাই দেশের কেন্দ্র থেকে দূরে একটি পাহাড়ী গ্রামে, যে গ্রাম সবথেকে কাছের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে। আমার স্বামী এবং আমি "কিনসেব্বা" নামের সেই গ্রামে চলে গেলাম এবং স্থানীয় শেখ, মুহম্মদের একটি বাড়ী ভাড়া নিলাম। তিনি মসজিদের দেখাশোনা করতেন, নির্দিষ্ট সময়ে নামাজের জন্য মানুষদেরকে ডাকতেন। আমাদের বাড়ীর পিছনে একটি ছোট ঘরে তিনি থাকতেন।

শেখ-এর স্ত্রী এবং সাত সন্তান দূরে একটা অন্য শহরে থাকত। তাদের কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। গরমের ছুটিতে অল্প সময়ের জন্য তাকে দেখতে আসত, কারণ তাদের মধ্যে খুব একটা সদ্ভাব ছিল না। শেখ-এর সাথে আমাদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কারণ তিনি বেশ হাসিখুশী মানুষ ছিলেন আর যথেষ্ট রসবোধসম্পন্ন। আমরা তার সাথে দীর্ঘ সময় ধরে খানিকটা মজার ছলে ইসলাম এবং তার শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতাম। তিনি প্রায়ই আমাদের কাছে বলতেন: "বিশ্বাস কর, যদি মসজিদের শেখদের বেতন বন্ধ হয়ে যেত তাহলে সারা সিরিয়াতে একটা মসজিদও খোলা থাকত না"। আমার মনে আছে শীতকালে এক ঝড়ের রাতে গ্রামে বাজ পড়ল। পরদিন সকালে শেখ দেখলেন মসজিদের গম্বুজ এবং বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফিরে এসে মৃদু হাসতে হাসতে মজার ভঙ্গীতে বললেন:

“আল্লাকে ধন্যবাদ, মসজিদ সারানো পর্যন্ত আমাকে কয়েকটা দিন ছুটি দেওয়ার জন্য”।

তিনি আমার স্বামী আর আমাকে সন্তানের মত দেখতেন। আমাদেরকে বিশ্বাস করতেন এবং নির্ভর করতেন। তিনি বহুবার পুলিশ হিসাবে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতেন, কেমন করে ঘুষ নিতেন, জিজ্ঞাসাবাদের ঘরে কেমন করে পেটাতেন। পরে চাকরি পাল্টে তিনি ট্রাক-চালক হন। তিনি গল্প করতেন কিভাবে ট্রাক থেকে মাল চুরি করতেন। এমনকি তিনি একটা পতিতালয়ে দ্বারোয়ানের কাজও করেন। অবশেষে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা তাকে ত্যাগ করার পর নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি অনুতাপ করতেন, ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতেন; শেষে গ্রামের শেখ হন। তার মজা করার প্রবণতা তুচ্ছ করার বিষয় ছিল না বরং তার মনোজগতে যে দ্বন্দ্ব ছিল তার পরিচয় ফুটে উঠত। তাকে দেখার প্রথম দিন থেকে আমি সেটা বুঝতাম।

শেখ-এর সাথে বন্ধুত্ব তার ধর্মনিষ্ঠা নিয়ে আমাদের সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার সাথে কথাবার্তায় মজার ছলে আমরা প্রায়ই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়তাম। তিনি মোটেই নির্বোধ মানুষ ছিলেন না এবং অত্যন্ত বাকপটু ছিলেন। তিনি বোধ হয় আন্দাজ করেছিলেন মজার মাধ্যমে আমরা কিছু সত্য বার করার চেষ্টা করতাম। তিনি নিজে এক মূহুর্ত্তের জন্যও ইসলামের শিক্ষা বিষয়ে সন্দেহ করতেন না। তা সত্ত্বেও সাধারণত সরাসরি প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতেন এই বলে যে ঈশ্বর জানেন। ফলে আমাদের মনে হত তিনি যা বিশ্বাস করেন সে সম্বন্ধে নিজেই নিশ্চিত নন। এ বিষয়ে তিনি অন্য শেখদের থেকে আলাদা ছিলেন। অন্যেরা যেখানে জোরের সাথে দাবী করত পরম সত্যের তারাই একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী।

তার প্রতিবেশী হয়ে তিন বছর বাস করার পর আমরা যখন সেই গ্রাম ছেড়ে গেলাম তখন আমাদের মনে শত শত উত্তর না পাওয়া প্রশ্ন। তার সাথে আমাদের বন্ধুত্ব আমাদের সন্দেহ এবং সত্যকে খোঁজার আগ্রহ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। যাই হোক, আজও আমি ইসলামের সাথে সংযোগ রাখতে চাই তা যতই ভঙ্গুর হোক না কেন।

শেখ মুহম্মদই ইসলামের শিক্ষা নিয়ে আমাদের সন্দেহের একমাত্র উৎস ছিলেন না। ঐ গ্রামে বাস করার সময় আমি অন্য এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। এখানকার আদিম গ্রাম্য সমাজ মানতে পারত না যে একজন মহিলা ডাক্তার হতে পারে। প্রথম বছরটা আমি কোনমতে সামলে নিয়েছিলাম ধৈর্য্য ও সহনশীলতা দিয়ে গ্রামবাসীদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য, বিশেষত মহিলাদের। রাত্রে আমাদের বাড়ীটা জরুরী বিভাগের ঘরে পরিণত হত। দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দে প্রায়ই মাঝরাত্রে ঘুম থেকে জেগে বাইরে ডাক শুনতাম: "ডক্টর মোরাদ, দয়া করে দরজা খুলুন, আমাদের ওয়াফাকে দরকার"। আমার স্বামী ডাক্তার নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা তাঁকে ডাক্তার বলে ডাকত, অথচ আমাকে ডাকত নাম ধরে।

তারা আমাকে বিশ্বাস করত। সেকারণে তাদের বাড়ীতে যেখানে সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢোকে না, আমি সেখানেও চলে যেতাম এবং বন্ধ দরজার পিছনে লুকিয়ে থাকা অনেক রহস্য সরাসরি দেখেছি। সেখানে যা দেখতাম তাতে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠতাম চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে চাইতাম। কিন্তু জীবনের ভয়ে আমার কন্ঠরোধ হয়ে যেত। যে ভয়ানক অন্যায়-অবিচার আমি দেখেছি তার প্রতিবাদ করতে পারিনি।

রমজান মাসে যখন মুসলমানরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন খাবার খায় না, জলপানও করে না; সারা বছরের মধ্যে সেই মাসটাই ছিল আমার সবথেকে কঠিন সময়। আমি যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করতাম সাধারণ সময়ে যত রোগী আসত, রমজান মাসে আসত তার থেকে অনেক বেশী। দিনের ভাগে ক্লান্তি(exhaustion) এবং জলশূন্যতার(dehydration) সমস্যায় মৃতপ্রায় রোগীর ভীড় বাড়ত আর রাত্রে বদহজম আর বমির রোগী; কারণ দিনের উপবাসের ঘাটতি মেটাতে তারা খেত অত্যধিক বেশী পরিমাণে। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ভোর থেকে মাঠে কঠিন শ্রমসাধ্য এবং ক্লান্তিকর চাষের কাজ করত যেজন্য যথেষ্ট জলপানের প্রয়োজন, বিশেষ করে গরমের সময়, অথচ উপবাসের কারণে তারা জল পান করতে পারত না। তাদের জন্য দুঃখবোধের কারণে আমি বোঝাতে চেষ্টা করতাম—বিশেষ করে মেয়েদের—

উপবাস না করতে, কিন্তু তাদের কঠিন ঘৃণার দৃষ্টি দেখে আমার কথা গিলে ফেলতাম।

এটা বলাই বাহুল্য যে এই রকম গ্রাম্য সমাজে পুরুষরা মহিলাদের সাথে অমানবিক ব্যবহার করত, এমনকি মেয়েরা করুণভাবে শোষিত হত। অনেক মহিলা খোলা মাঠেই সন্তান জন্ম দিত, কখনও কখনও আমাকে ডাকা হত কোন মহিলাকে সাহায্যের জন্য যার প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে যখন সে মাটি কোপাচ্ছিল। এই অবিচারের সামনে আমার কি করা উচিৎ বুঝতে না পেরে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার প্রচণ্ড রাগ হত। কখনও কখনও একজন ডাক্তারের অধিকারবোধে আমি চিৎকার করে পুরুষদের বলতাম: “তোমাদের কি কোন অপরাধবোধও হয় না?” সাধারণত তারা শুধু হাসত এবং আমার প্রশ্নকে পাত্তাই দিত না।

মেয়েদের শ্রমের শোষন আমার কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমি অত্যন্ত কষ্ট পেতাম তাদের উপর যৌন অত্যাচারে। আমি নারী হওয়ার সুবাদে এমন অনেক ঘটনা জেনেছি যা একজন পুরুষ ডাক্তারের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। যদিও ঐ অঞ্চলে যৌন লাঞ্ছনার ঘটনা অতি প্রকট, কিন্তু তা অন্যের চোখের আড়ালে থাকত। মহিলাদের প্রতি সহানুভূতির মাধ্যমে আমি তাদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলাম এবং তারা এমন গোপন কথা আমাকে বলত যেগুলি তারা সঙ্গে নিয়েই কবরে চলে যেত। অনেকেই ধর্ষিত হত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ধর্ষিত হত নিজের পরিবারের পুরুষ সদস্য দ্বারা, সাধারণত তাদের নিজেদের বাবা। এইসব ধর্ষণের ফলে যেসব কুমারী মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ত তারা অবিলম্বে খুন হয়ে যেত সামাজিক অসম্মান ধুয়ে ফেলতে এবং কলঙ্ক গোপন করতে। কিছু ক্ষেত্রে ধর্ষক নিজেই সেই খুনী। কিছু ধর্ষিতাকে আপেলগাছে ছড়ানোর কীটনাশক খাইয়ে খুন করা হত। ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হত: “স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু”। এইসব নারীদের ডেথ সার্টিফিকেট পেতে কোন ডাক্তারের প্রয়োজন হত না। সাক্ষীই যথেষ্ট।

ঐ গ্রামে আমার চাকরীর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আমার হৃদয়ে যেন রক্তক্ষরণ হচ্ছিল আর আমি রাগে জ্বলছিলাম। তিন বছর পর আমি লাটাকিয়াতে ফিরলাম অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক শিক্ষা নিয়ে, যেগুলি ঘটে আমি যে সমাজে থাকি সেখানেই।

স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ

১৯৮০-র দশকের শেষদিকে সারা পৃথিবী সন্ত্রাসবাদে সহায়তার অভিযোগে সিরিয়াকে অভিযুক্ত করল। সিরিয়ার নাম যুক্ত হল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের তালিকায় এবং কঠিন অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হল। আমি বিশ্বাস করি এই সময়ে সিরিয়ার পাশপোর্টধারী একজন প্যালেস্টিনীয় যুবক লণ্ডন এয়ারপোর্টে প্লেনে ওঠার আগে তার মেয়েবন্ধুর স্যুটকেসে বোমা রেখেছিল। এই ঘটনা আবিস্কৃত হলে অপরাধী লণ্ডনে সিরিয়ার দূতাবাসে আশ্রয় নেয়। ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে না পেরে গোটা দূতাবাস ভবনটিই উড়িয়ে দেয়। এই ঘটনার পরে সিরিয়া ব্রিটেনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘোর সমস্যায় পড়ে।

অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সিরিয়ার উপরে প্রভাব ফেলতে শুরু করল, ফলে ১৯৮০-র দশকের শেষ চার বছরে জীবন অসহ্য নরক হয়ে উঠেছিল। একদিকে সিরিয়ার মুসলিম সমাজের চিরাচরিত আদর্শগত অত্যাচার, অপরদিকে স্বৈরতন্ত্রী শাসনের ফলে সিরিয়ার যুবসমাজ পৃথিবীর অন্য কোন জায়গায় বাসস্থান খুঁজতে শুরু করল। অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি যেন আগুনে ঘি ঢালল এবং তাদের মনে হল তারা আরও বেশী দুর্দশাগ্রস্ত, ফলে দেশত্যাগের ইচ্ছাও বৃদ্ধি পেল।

আমার স্বামী দামাস্কাসের প্রতিটি বিদেশী দূতাবাসের বাইরে অপেক্ষা করে বহু রাত কাটিয়েছে, আর প্রতিটি দূতাবাসের প্রত্যাখ্যানে আমরা হতাশ হয়েছি। আমাদের আয়ের বেশী অংশই খরচ হয়ে যেত তার দামাস্কাস যাওয়া-আসার ভাড়ায়, কারণ সব বিদেশী দূতাবাসই ছিল সেখানে। এছাড়া হোটেলের খরচ, কারণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হত অন্য আরেক দূতাবাসে কাগজপত্র জমা দেওয়ার জন্য। আমি

অধৈর্য্য হয়ে পড়ছিলাম তাঁর এই লাগাতার যাতায়াতে এবং অন্য বাসস্থানের জন্য অনন্ত খোঁজে; কারণ আমাদের আয়ের বেশী অংশই এতে ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যখনই আমি এই প্রসঙ্গ তুলতাম সে আশাব্যঞ্জকভাবে বলত, "আমি নিশ্চিত যে আমি এই দেশের জন্য নই এবং পৃথিবীতে এমন একটা জায়গা অন্তত আছে যার আমাকে প্রয়োজন।

১৯৮৮ সালের মে মাসে সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল এবং প্রমাণ হল আমার স্বামীর ভাবনাই ঠিক, পৃথিবীতে অন্য একটা দেশ তার অপেক্ষায় আছে যে দেশ তাঁর জন্মভূমির চেয়ে যোগ্যতর তাঁকে পাওয়ার জন্য। সে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পেয়ে গেল এবং আমার আট মাস আগে সিরিয়া ত্যাগ করল। যে সময়টুকু আমরা আলাদা ছিলাম তখন সে সপ্তাহে অন্তত দু'টো চিঠি লিখত। সেই চিঠিতে সে সবিস্তারে আমেরিকার সমাজ সম্বন্ধে তাঁর ধারণার বর্ণনা দিত। আমার কাছে আজও সেই চিঠিগুলি আছে, যার একটাতে সে লিখেছিল, "আজ আমি একজন আমেরিকান মহিলাকে ইলেক্ট্রিকের খুঁটি বেয়ে উঠে সারাইয়ের কাজ করতে দেখলাম—বিশ্বাস করতে পার?" অন্য একটা চিঠিতে লিখল, "আজ টিভিতে দেখলাম কিভাবে আমেরিকান জরুরী সেবা বিভাগ গর্তে পড়ে যাওয়া একটা ছোট্ট বিড়ালকে উদ্ধার করল। তারা প্রায় দু'ঘন্টার চেষ্টায় বিড়ালটাকে যখন জীবন্ত বাইরে নিয়ে এল সবাই হাততালিতে ফেটে পড়ল"।

আমি যে হাসপাতালে কাজ করতাম সেখানকার সহকর্মীদের কাছে সেই চিঠিগুলি পড়ে শোনালে তারা বলত যে আমেরিকান সমাজের কথায় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে এবং তাদের নৈতিক অবক্ষয়কে আমি দেখতে পাই না। নিজের মনে কখনও কখনও আমার মনে হয় নৈতিকতা নিয়ে আমাদের ধারণা কি? এবং কেন আমেরিকান জরুরী সেবা বিভাগের একটা বিড়ালের বাচ্চা উদ্ধার করাকে একটা নৈতিক কাজ বলে ভাবতে পারি না! আমার অবাক লাগে কেন আমেরিকার একটা বিড়ালের বাচ্চার থেকে আমার দেশের মানুষ খারাপ অবস্থায় থাকে? আমি বুঝতে পারতাম না কেন আমার সহকর্মীদের মনে হয় যে আমেরিকার সমাজ নৈতিকভাবে

ক্ষয়িষ্ণু, যখন তারা সরাসরি সেই সমাজকে দেখেনি। যদি সত্যিই যুক্তরাষ্ট্র নৈতিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু হয়, তাহলে সিরিয়ার এত মানুষ কেন তাদের দূতাবাসের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে? আমি জানতাম এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমার স্বামীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করতে হবে।

আমার স্বামী জানত আমার লেখার ক্ষমতা আছে এবং আরবি সাহিত্যের উপর ভাল দখলও আছে। তাঁর চিঠিতে বারবার আমাকে বলত যুক্তরাষ্ট্রের জীবন আমাকে একটা অভাবনীয় সুযোগ দেবে আরব জগতে লেখক হিসাবে পরিচিতি পাবার। চলে যাওয়ার স্বপ্ন দিন দিন বেড়ে চলছিল। যেভাবে আমার চারপাশের লোকজন আমার স্বামীর অনুপস্থিতি নিয়ে আলোচনা করত তাতে সেই স্বপ্ন আমাকে আরও আঁকড়ে ধরছিল। আমার সেই সমাজ থেকে পালানোর ইচ্ছা বেড়েই চলছিল যে সমাজে আমার ধর্মীয় চিন্তাবোধকে চারপাশের বাস্তবের সাথে মেলাতে পারতাম না।

ডিসেম্বর ১৫, ১৯৮৮ আমি স্বর্গ-প্রেরিত উপহার পেলাম: আমি আমেরিকার ভিসা পেলাম, দামাস্কাসে আমেরিকান দূতাবাসের বাইরে তিনদিন তিনরাত্রি কাটানোর পর। লাইনে আমার সামনে ছিলেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত বোরখায় ঢাকা এক মুসলিম মহিলা। তিনি একটানা কোরানের আয়াৎ উচ্চারণ করছিলেন এবং ঈশ্বরের কছে প্রার্থনা করছিলেন তিনি যেন তার ভিসা পেতে সাহায্য করেন। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, “মেয়ে, এই প্রার্থনাটা বারবার কর, আমি নিশ্চিত তোমার ইচ্ছাপূরণ হবে। বল, ঈশ্বর এক, হে প্রভু, ওদের মন আর চোখ অন্ধ করে দাও”। আমি বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়ে বললাম, “আপনি কেন চাইছেন ঈশ্বর ওদের মন আর চোখ অন্ধ করে দিন?” তিনি বললেন, “কারণ ওরা যদি সত্যিটা জানতে পারে তাহলে কক্ষণো আমাকে ভিসা দেবে না। আমার স্বামী ইতিমধ্যেই আমেরিকায় চলে গেছেন, এবং আমরা ভাবছি ওখানেই থেকে যাব”।

আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা করলাম, “হে প্রভু, আমাকে স্বাধীনতার পথে চালিত করো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি অন্যদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব”।

ঐ মাসেরই পঁচিশ তারিখে, বড়দিনের রাত্রে, প্লেন আমাকে লস অ্যাঞ্জেলেসে নামিয়ে দিল, যেখানে আমার স্বামী আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকত, কাছের প্রতিবেশী ছিলেন এক আমেরিকান ভদ্রমহিলা। যখন তিনি জানলেন আমার স্বামী এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন আমাকে আনতে তখন তিনি একটি আমেরিকান পতাকা তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় টাঙিয়ে দিয়ে তাকে বললেন: “তোমার স্ত্রীকে বোলো আমেরিকা তাকে স্বাগত জানাচ্ছে”।

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম যখন আমি পতাকাটি দেখেছিলাম এবং জেনেছিলাম কেন আমার স্বামীর প্রতিবেশী, ডায়ান, সেটি টাঙিয়েছিল। সে আমার আরবি নাম উচ্চারণ করতে পারত না, সেজন্য আমাকে একটা আমেরিকান নাম দেবে ভেবেছিল: সে আমাকে ডাকতে শুরু করল “পাম” বলে। আমার নামটা পছন্দ হল না সামান্য কারণে। আমাদের আরবিতে ‘প’ অক্ষরটি নেই। আমরা সেটি বলতে গেলে অনেকটা ‘ব’ অক্ষরের মত শোনায়। আমি নিজেকে “বাম” বলে পরিচয় করাতে ডায়ান হেসে ফেলল। ‘বাম’ আমার দেখা ইংরাজী অভিধানে প্রথম শব্দ এবং জানলাম এটি ব্যবহার হয় “সহসা আঘাত” বোঝাতে। আমি দৌড়ে গিয়ে ডায়ানকে বললাম আমার নাম বদলে দিতে। আমি তাকে বললাম: “ডায়ান, বাম-এর বদলে তুমি বরং আমাকে লীনা বলে ডেকো। সে হেসে উঠল, আজও সে আমাকে লীনা বলেই ডাকে। এখন এই ঘটনা মনে পড়লে আমার আশ্চর্য লাগে। মনে হয়, এটা কি কাকতালীয় যে আমি নিজেকে বাম বলে উল্লেখ করেছিলাম—অথবা এটাই আমার ভাগ্য ছিল?

সেই সপ্তাহেই আমি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির, লং বীচ, ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট-এ ভর্তি হলাম। ক্লাসে প্রায় পনেরজন ছাত্র ছিল—আমি, এল সালভাদোর

থেকে একজন মহিলা, ইয়েমেন থেকে এক ভদ্রলোক—বাকী সবাই জাপানী। আমি ছিলাম যেন নতুন খেলনায় মুগ্ধ এক শিশু। আমি আগে কখনও এল সালভাদোর বা জাপানের মানুষ দেখিনি, এমনকি ইয়েমেনেরও নয়, যে আরব দেশ সিরিয়া থেকে মাত্র দু'ঘন্টার প্লেনযাত্রা দূরত্বে। সকলের সাথে পরিচিত হয়ে বেশ খুশী হলাম। আমার সামান্য ভাঙ্গা ইংরাজীতে খুব অল্প সময়ে তাদের কাছ থেকে আমি যা শিখলাম, আমার দেশে কখনও তা শিখিনি।

আমার ইংরাজী সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত কয়েকটি মেডিকেল শব্দে, কিন্তু তবু আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল ভাষাটি শিখতে। আমার মনে আছে একবার শিক্ষক আমাদের প্রত্যেককে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস থেকে একটি পৃষ্ঠা পড়তে বললেন এবং সে সম্বন্ধে কিছু বলতে বললেন। আমি অনেকক্ষণ ধরে পত্রিকাটির পাতা উল্টালাম একটা নিবন্ধ খুঁজতে যেটা পড়তে এবং তৈরী করতে সহজ হয়। খুঁজতে খুঁজতে ক্যালেণ্ডার বিভাগে আমি যেমন খুঁজছিলাম তেমন পেয়ে গেলাম: “প্রিয় অ্যাবি” কলাম। প্রথমবার আমি সেটা পড়লাম এবং আসক্ত হয়ে গেলাম। কলামের মাধ্যমে “অ্যাবি”কে জানা আমার জীবনে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। “অ্যাবি” পাঠকদের সমস্যা নিয়ে চিঠি পায়, সে তার একটা সমাধান জনিয়ে দেয়। আমি একথা বললে লোকে হাসতে পারে, কিন্তু “প্রিয় অ্যাবি” পড়লে আপনি আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানতে পারবেন। মানুষ তাদের হাজার সমস্যা নিয়ে যেসব চিঠি তাকে লেখে, তা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা, ভাল ও মন্দ উভয়ই, আমি জানতে শুরু করলাম। ফলে এইসব সমস্যাপূর্ণ চিঠিগুলি পড়ে আমেরিকার জীবনের সুবিধাগুলি বুঝতে পারলাম আর ধীরে ধীরে তার প্রেমে পড়ে গেলাম।

আমার মনে হয় কোন সমাজের সুবিধাজনক দিকগুলি জানার দ্রুত উপায় হল প্রথমেই তার সমস্যাগুলি জানা এবং কিভাবে তার সমাধান করা হয়। যখনই আমি কোন পাঠকের সমস্যার কথা এবং সে যে সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছে তা পড়তাম, তখন কল্পনা করতাম ইসলাম এর কি সমাধান দিত; দু'টোর পার্থক্যে হতাশ বোধ হত। আমি আশ্চর্য বোধ করতাম আমাদের মুসলিম সমাজে কত “প্রিয় অ্যাবি”

প্রয়োজন যার দ্বারা আমাদের সমস্যাগুলির বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক উপায়ে সমাধান করা সম্ভব। "অ্যাবি"র ভাবনাগুলি ও তার পাঠকরা যেন আমার মনে বাসা বেঁধে ফেলল এবং সময়ের সাথে সাথে আমি নিজেই "প্রিয় অ্যাবি"তে পরিণত হয়ে গেলাম, একটাই তফাৎ: আমি আরবিতে আরব পাঠকদের জন্য লিখব।

ক্যালিফোর্নিয়াতে দু'মাস কাটানোর পর আমাদের আর্থিক পরিস্থিতি একটু খারাপ হয়ে পড়ল। আমি অনুভব করলাম আমার সীমিত ইংরাজী নিয়ে আমাকে কোন একটা কাজ করতে হবে যাতে কিছু উপার্জন হয়। এক সিরিয় যুবকের সাহায্যে একটা গ্যাস স্টেশনে কাজ পেলাম। একসময়ে আমি মানুষের হৃৎপিণ্ডে রক্ত পাম্প করেছি; এখন আমি গ্যাস পাম্প করি। কেউ ভাবতে পারেন যে আমি আমার নতুন কাজে বিব্রত বোধ করছিলাম। পক্ষান্তরে আমি এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে নিয়েছিলাম যাতে শুধুমাত্র "প্রিয় অ্যাবি" কলাম পড়ার পরিবর্তে সরাসরি আমেরিকান সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। আমি গ্যাস স্টেশনের ক্রেতাদের কাজ এবং আচরণ লক্ষ্য করতাম এবং তারা কি বলে মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। তাদের মধ্যে অনেকে আমার সাথে কথা শুরু করে দিত এবং কখনও কখনও সেসব কথা ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছে যেত।

মোটের উপর আমি অনুভব করতাম আমি সিরিয়াতে ডাক্তার হিসাবে যে সম্মান পেতাম তার থেকে অনেক বেশী সম্মানের সাথে এখানকার মানুষ আমার সাথে ব্যবহার করত। এমনকি আমি ভুল করলেও আমার সাথে ভদ্র ব্যবহার করা হত। একদিন এক আমেরিকান ভদ্রলোক গ্যাস স্টেশনে আসতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি নট স্ট্রীটের (Knott Sreet) রাস্তা জানি কি না। আমি একটা তাক দেখিয়ে বললাম তিনি যা খুঁজছেন ওখানে পেয়ে যাবেন। তিনি ভদ্রভাবে হাসলেন, বললেন "ধন্যবাদ" এবং নিজের পথে চলে গেলেন। অন্য একজন কর্মী আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন আমি ভদ্রলোকের প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি কি না। আমি বললাম যে আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোক

পিস্টাচিও নাট (Pistachio Nut) চাইছেন। যখন আমি বুঝলাম আমি প্রশ্নটি ভুল বুঝেছি তখন বিব্রত বোধ করলাম। কিন্তু সেই ভদ্রলোকের মৃদু হাসি এবং ধন্যবাদের কথা আজও আমার হৃদয়ে উষ্ণতা ছড়ায়। গ্যাস স্টেশনে বিদেশী কর্মী হয়ে আমি অনেক বেশী সম্মান পেতাম, আমার মাতৃভূমিতে ডাক্তারের সম্মানের চেয়ে। ঘটনাটা আজও আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে এবং যেন আমাকে ঘাড়ে ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়। যখন আমি গ্যাস পাম্প করতাম আর প্রতিদিন অজস্র আমেরিকানের সাথে কথা বলতাম, আমাদের সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসরীতির নৈতিকতা বিষয়ে আমার যত প্রশ্ন ছিল সেগুলি আরও জোরালো হত আর তাদের উত্তর পাওয়া আরও জরুরী হয়ে উঠল।

আমি পৌঁছানোর এক বছর পর, বড়দিনের কয়েকদিন আগে, টেক্সাকো তার গ্যাস স্টেশন কর্মীদের জন্য হিলটন হোটেলে একটি পার্টি দিল। আমি পৌঁছে দেখলাম হলটি অসাধারণ সুন্দর করে সাজানো। খাবার টেবিলে খাবার সাবধানে সুন্দর করে রাখা। আমরা যারা কর্মী—বেশীর ভাগই ইংরেজী না বলা বিদেশী—তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল। আমার অঝোরে কান্না পেল। আমি অশ্রু এবং অনুভূতি গোপন করতে প্রায় ছুটে মেয়েদের ঘরে (wash room) গেলাম। ফিরে এসে বুঝলাম আমার পাশে বসা মহিলা কিছু একটা অনুমান করেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমি এত বিচলিত কেন। আমি অন্য এক ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে বললাম, “ঐ মহিলাকে দেখতে আমার সিরিয়ায় থাকা বোনের মত, এক বছর হয়ে গেল আমি তাকে দেখিনি”, তারপর আবার কেঁদে ফেললাম। কিন্তু আমার বোনের স্মৃতি আমাকে কাঁদায়নি। অন্য এক ঈশ্বরের জন্মদিনের আনন্দময় উৎসবের মাঝে আমি কেঁদেছিলাম আমার দেশের স্মৃতিতে যেখানকার ঈশ্বর নারী এবং দরিদ্রকে শিকার করার আদেশ দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রবাসের দেড় বছর পর আমার মেয়ে অ্যাঞ্জেলার জন্ম হল। তার বয়স যখন মাত্র চল্লিশ দিন, তখন লস অ্যাঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে আমার আর দুই সন্তানকে অভ্যর্থনা করলাম, যাদের আমি সিরিয়ায় রেখে এসেছিলাম। আমাদের আনন্দ পূর্ণ হল

যখন আমাদের আমেরিকার স্বপ্ন সত্যি হল এবং মনে হল আমরা এক সুস্থিত ও সৃষ্টিশীল জীবন পেতে চলেছি। আমার প্রথম দুই সন্তান যেদিন স্কুলে যাওয়া শুরু করল সেইদিন আমি আমেরিকান সমাজে প্রবেশ করলাম। পুত্র মাজেন, তার বয়স তখন নয়, ভর্তি হল ক্লাস ফোরে আর চারবছরের কন্যা ফারাহ নার্সারীতে। তাদের স্কুল জীবনের সাথে থেকে আমি এক অন্য জগৎ আবিস্কার করলাম যে জগৎ আমার বেড়ে ওঠার জগতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যারা আমার সন্তানদের শেখাতেন সেই মানুষদের থেকে আমিও অনেক মূল্যবান বিষয় শিখলাম।

মাজেন জন্মগতভাবে কানে কম শুনত। যখন আমরা সিরিয়ায় ছিলাম, নিজে ডাক্তার হয়েও তার জন্য হিয়ারিং এইড কিনতে পারিনি, কারণ সেগুলি দেশে তৈরী হত না, ইউরোপ থেকে আমদানী করতে হত। সে সময়ে পশ্চিমের সাথে সিরিয়ার কোন বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল না। কারণ সন্ত্রাসবাদে সহায়তার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর সিরিয়া আন্তর্জাতিক বয়কটের সম্মুখীন হয়েছিল। স্কুলের পরামর্শে মাজেনকে একজন কান-বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং এক সপ্তাহেরও কম সময়ে সে হিয়ারিং এইড ব্যবহার শুরু করল। আমি সেই দিনটাকে কখনও ভুলব না যেদিন ডাক্তারখানা থেকে মাজেনকে নিয়ে বেরোলাম যে সেই প্রথম এইড পরেছিল। তার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল, ছোট্ট পাখীর মত বলে উঠল, “মা, বিশ্বাস করতে পার আমি রাস্তার গাড়ীর শব্দ শুনতে পাচ্ছি”। আমি কাঁদতে কাঁদতে আমার স্বামীর কাঁধে মুখ রাখলাম আর সে বলে উঠল, “আমেরিকা দীর্ঘজীবি হোক! আমেরিকা দীর্ঘজীবি হোক!”

আমরা ঠিক করলাম সেইদিনই দিনটাকে উদযাপন করব এবং একটা রেস্তোঁরায় গেলাম। আমি এখনও মনে করতে পারি সেটার নাম ছিল টম’স হ্যামবার্গার, প্যারামাউন্টে আমাদের বাড়ী থেকে কাছেই। আমরা এটা পছন্দ করলাম কারণ এটাই সবচেয়ে সস্তা। তখন একটা হ্যামবার্গারের দাম ছিল ৬৯ সেন্ট, যে একঘন্টা আমরা সেখানে কাটিয়েছিলাম সেটাই আমাদের জীবনে সবথেকে আনন্দের মূহুর্ত্ত। টেবিলে বসে আমরা একটা খেলা শুরু করলাম। ফারাহ মাজেনের পিছনে

দাঁড়িয়ে ওর কানের কাছে ফিসফিস করে একটা শব্দ বলবে, যদি সে সেটা শুনতে পায় তবে এক ডাইম পাবে আর যদি না পায় তবে ফারাহ পাবে। আমি লক্ষ্য করলাম যে ফারাহ এমনভাবে শব্দটা উচ্চারণ করছিল যেন তার ভাই সেটা শুনতে পায়, যদিও তার ফলে সে ১০ সেন্ট পাবে না।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে এক ভদ্রমহিলা আমার সাথে দেখা করে নিজের পরিচয় দিলেন নাদজ এ এলিস বলে। তারপর বললেন লস অ্যাঞ্জেলেস ইউনিফায়েড স্কুল ডিস্ট্রিক্ট তাকে মাজেনের জন্য বিশেষ শিক্ষক নিযুক্ত করেছে। তিনি মাজেনকে বিশেষ ভাবে কথা বলা, ভাষাবোধ, এবং শব্দ শেখাবেন যাতে সময়ের সাথে সাথে সে উন্নতি করতে পারে। কিছুদিনের মধ্যেই মিস এলিস পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেলেন। তিনি আমাদের পরিবারের সবার ভাষাগত ত্রুটি দূর করতে সাহায্য করতেন এবং স্কুলের সাথে যোগযোগ রাখতেও সাহায্য করতেন। মিস স্কার্ফ ছিলেন মাজেনের বিশেষ শিক্ষিকা, তার ভূমিকাও মাজেনের জীবনে মিস এলিসের থেকে কিছুমাত্র কম ছিল না। তিনি মাজেনকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। মাজেন উত্তেজনায় স্কুল থেকে লাফাতে লাফাতে ফিরে আমাকে বলত, "মা, ভাবতে পার মিস স্কার্ফ প্রতিদিন আমাকে আদর করেন। সিরিয়াতে কোন শিক্ষক কখনও আমাকে আদর করেনি কেন?" আমার সন্তানের প্রশ্ন যন্ত্রণার সাথে গভীরভাবে আমার মন-মানসিকতায় দাগ কেটেছিল আর আমি নীরবে উত্তর দিয়েছিলাম: "আমি নিজেই আজও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি, সোনা"।

একদিন দিনের শেষে আমি ফারহাকে স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিলাম। দেখলাম তার শিক্ষিকা স্কুলের মাঠে তার সাথে বসে ওর জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছেন। আমি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিলাম। দু'জনকে একসাথে দেখে আমার স্মৃতিতে একটা অত্যন্ত তিক্ত ঘটনা ভেসে উঠল যা আজও মনে গেঁথে আছে। আমি যখন ফারাহ-র বয়সী তখন আমাদের প্রধান শিক্ষককে মনে পড়ল। তিনি একদিন আমার কাছে এসে তার বাড়ীতে একটা রুটির প্যাকেট দিয়ে আসতে বললেন যেটা তিনি বাড়ীর জন্য কিনেছেন। ভয়ে আমি শিশুর মত বলে ফেললাম,

"কিন্তু আমাদের এখন শ্রুতিলিখন আছে"। আমি বাক্যটা শেষ করতে না করতেই তিনি প্রচণ্ড জোরে আমাকে একটা চড় মারলেন। সেই নিষ্ঠুর চড়ের যন্ত্রণা ভাবতে ভাবতে আমি মিসেস অ্যাণ্ডারসনের অনুগ্রহের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি বললেন, "আমি ওকে গেটের দিকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। দেখি ওর জুতোর ফিতে খোলা। ভয় পেলাম যে ও পড়ে যেতে পারে"। মিসেস অ্যাণ্ডারসন ফারাহকে আদর করলেন, ওর কাঁধে হালকা চাপড় দিতে দিতে বললেন , "এখন লক্ষ্মী হয়ে থাক, কাল দেখা হবে"। ফারাহ পিছনের সিটে বসে ছিল। আমি আয়নায় তার মুখ দেখছিলাম। সে উজ্জ্বল চোখে চারদিক দেখছিল। আমি নিজের মনে ভাবলাম: আমি তোমাকে ঈর্ষা করি, সোনা। আমি যখন ছোট ছিলাম, ভাগ্য কেন আমাকে মিসেস অ্যাণ্ডারসনের মত শিক্ষক দেয়নি—আমার জুতোর ফিতে বাঁধার জন্য নয়, আমার ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জন্য?

বাড়ী ফিরে দু'দিন আগে শুরু করা একটা প্রবন্ধ লেখা শেষ করলাম এই কথা লিখে: "আমাদের নবী বলেছেন; 'তোমার সন্তানদের সাত বছর বয়স হলে নামাজ পড়তে শেখাও আর দশ বছর বয়স হলেও যদি তারা তা না করে তাহলে প্রহার কর'। সেই নবী নরকে যাক যে চায় কোন পিতা তার দশ বছর বয়সী পুত্রকে মারুক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা না করার অপরাধে।

একদিন প্রধান শিক্ষক মিস্টার উইলসন আমাকে ফোন করে বললেন, "মিসেস সুলতান, মাজেন তার হিয়ারিং এইডটা বাড়ীতে ফেলে এসেছে। আপনি কি ওটা স্কুলে নিয়ে আসতে পারবেন?" আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "অবশ্যই, আমি এখনই যাচ্ছি!" আমার বেরোতে একটু দেরী হয়েছিল কিন্ত যখন দরজা খুলে গাড়ীর দিকে যাচ্ছি, দেখি প্রধান শিক্ষক মাজেনের হাত ধরে দু'জনে আমাদের বাড়ীর দিকে আসছেন। আমাকে দেখে মিস্টার উইলসন বললেন, "মিসেস সুলতান, আমি জানি আপনি ব্যস্ত, তাই ভাবলাম এই সুন্দর বসন্তের দিনে মাজেনকে নিয়ে একটু হেঁটে আসি যাতে আমরা নিজেরাই হিয়ারিং এইডটা আনতে পারি"। হিয়ারিং এইডটা নিয়ে

যেতে দেরী হয়েছিল বলে আমার যেন অপরাধ বোধ না হয় সেজন্য মিস্টার উইলসন সুন্দর আবহাওয়া উপভোগ করার উপরই বেশী গুরুত্ব দিলেন।

আমি তাঁকে হিয়ারিং এইডটা দিয়ে আমার ডেস্কে ফিরে একটা কাগজে স্মৃতি থেকে একটা গল্প লিখলাম। গল্পটি আমি পড়েছিলাম একটা মুসলিম বইয়ে, খলিফা ওমর ইবন আল-খাত্তাবের গল্প। খলিফা একটা লাঠি দিয়ে তার পুত্রের মাথায় মেরেছিলেন বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই। তার স্ত্রী হাফসা প্রতিবাদ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ওকে মারলেন কেন?" ওমর উত্তরে বললেন, "আমি দেখলাম ও নিজেকে ছাপিয়ে উঠছে, তাই একটু ছেঁটে মাপমত করে দিলাম"। গল্পটির শেষে আমার সেদিনের অভিজ্ঞতা যোগ করে শেষে লিখলাম, "আমেরিকা দীর্ঘজীবি হোক এবং অবিচার, নিপীড়ণ, নিগ্রহের সংস্কৃতি ধ্বংস হোক! মিস্টার উইলসন দীর্ঘজীবি হোন, অনন্ত মৃত্যু হোক খলিফা ওমর ইবন আল-খাত্তাবের!"

শিক্ষকেরা আমার সন্তানদের প্রতি যে মহানুভবতা দেখিয়েছিলেন তার ফলে আমি আমার ছেলেমেয়েদের স্কুলজীবনের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে গেলাম। শুধুমাত্র শিক্ষালাভে তাদেরকে সাহায্য করার জন্যই নয়, আমিও তাদের সাথে যেন শিখতে পারি। স্কুলের থেকে ছেলেমেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি প্রতিবার সঙ্গে যেতাম অভিভাবকের লিস্টে নাম লিখিয়ে। অভিভাবকেরা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতেন। আমি প্রায়ই বাচ্চাদের বিপজ্জনক রাস্তা পার হতে সাহায্য করেছি এবং আমি আমার ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে পাওয়া ধন্যবাদজ্ঞাপক শংসাপত্রগুলি রেখে দিয়েছি।

আমার মনে পড়ে একদিন দুধ শেষ হয়ে গেছে, স্বামী কাজে গেছেন। সে সময় এক গ্যালন দুধের দাম ছিল $১.৬৯। খুঁজে দেখলাম $১.৬৮ আছে। আমি মাজেনকে বললাম রাস্তার অপর পারের দোকানে গিয়ে মালিককে বলতে যে আমি পরে এক পেনি দিয়ে দেব; মালিক একজন চমৎকার মহিলা যিনি আমাকে ভালই চিনতেন। মাজেন যেতে চাইল না, বলল তার অস্বস্তি লাগবে। কি করি বুঝছি না। আমার ছোট

মেয়ে ঘুমিয়ে আছে, ফলে আমিও বাড়ী থেকে যেতে পারছি না। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। মাজেনকে বললাম, "শোন, তুমি দোকানে যাও। ভিতরে ঢোকার আগে গাড়ী রাখার জায়গায় ভাল করে দেখবে যদি কারও কাছ থেকে এক পেনি পড়ে গিয়ে থাকে। যদি পাও তাহলে তোমার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে আর যদি না পাও ফিরে আসবে"। এই পরিকল্পনায় মাজেন আনন্দে নেচে উঠল আর $১.৬৮ নিয়ে দৌড়ে দোকানে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পর জানালা দিয়ে দেখি সে এক গ্যালন দুধ নিয়ে জোরে হাসতে হাসতে আসছে। দরজা খুলে অবাক হয়ে শুনি সে বলছে, "মা, তুমি কখনও বিশ্বাসই করতে পারবে না কি হয়েছে! আমি একটা সেন্ট খুঁজছিলাম আর পেলাম একটা ডলার। আমার কাছে এখন নিরানব্বই সেন্ট আছে"। বলে আমার হাতে পয়সাগুলি দিয়ে দিল। আমি ওকে কাঁধে ধরে বললাম, "শোন, সোনা, এটাই আমেরিকা: তুমি এক সেন্ট চাইলে তোমাকে এক ডলার দেবে—তবে তোমাকে বাইরে গিয়ে খুঁজতে হবে!"

ক্যালিফোর্নিয়া ষ্টেট পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি, পোমোনা-তে মাজেন যখন প্রথম বর্ষে তখন সে সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালানোর জন্য। আমি তাকে বলেছিলাম যদি সে অনুদান পায় তবে আমি এবং তার বাবা মিলে বাকী সমস্ত খরচ চালাব। আমরা আশা করিনি যে ঐ অনুদানে তার সমস্ত ফিস মেটানো যাবে। টাকা জমা দেওয়ার দিন সে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল, আমি আমার সই করা একটা খোলা চেক(টাকার অঙ্ক না লেখা)তার সঙ্গে দিলাম ঘাটতি পূরণের জন্য। কয়েকঘন্টা পর সে আমাকে ফোন করে হাসতে হাসতে বলল, "মা আন্দাজ কর তো কি হয়েছে!" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি?" সে বলল, "এটাই আমেরিকা; তুমি এক সেন্ট চাইলে তোমাকে এক ডলার দেবে। অনুদানের টাকায় সমস্ত ফিস দিয়ে, বইয়ের দাম দিয়ে এখনও আমার কাছে কিছু টাকা আছে"। বাড়ী ফিরে সে আমাকে চেকটা ফেরৎ দিয়ে মজার ভঙ্গীতে বলল, "আমি তোমাদের সাহায্য চাই না, আমেরিকা তোমাদের থেকে অনেক বেশী উদার!"

আমি ওর কাঁধ ধরে বললাম, “শোন, এটা একটা ঋণ, তুমি পাশ করে বেরোলে তোমাকে এটা শোধ করতে হবে”। কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে কথাটা পূরণ করল, “আমাকে লস অ্যাঞ্জেলেস ইউনিফায়েড স্কুল ডিস্ট্রিক্ট-এ একটা হিয়ারিং এইড দান করতে হবে যেটা একটা শিশুকে দেওয়া হবে যার প্রয়োজন—আমি জানি। আমি সবটাই জানি। আমি অন্তর থেকে এ শিক্ষা পেয়েছি!”

অবশ্যই আমাদের জীবনে একটা দ্বন্দ্ব কাজ করত যে কারণে আমি উদ্বিগ্ন বোধ করতাম: আমরা মধ্য প্রাচ্য থেকে আসা বিদেশী, বাস করি আমেরিকাতে। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মাজেন আমেরিকায় আছে এক বছরের কিছু বেশী সময়। আমি লক্ষ্য করলাম টেলিভিসনে যখন যুদ্ধের খবর দেখাচ্ছে তখন সে তার বোন ফারহাকে তার শিশুসুলভ ভঙ্গীতে ঘটনার ব্যাখ্যা করে বলছে, “আমরা আমেরিকানরা সাদ্দাম হুসেনের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী, আমরা ইরাকীদের পিষে ফেলব”। আমি চোখের জল লুকাতে চেষ্টা করলাম। তার বাক্যের প্রথম অংশ “আমরা আমেরিকানরা” এবং দ্বিতীয় অংশের “আমরা ইরাকীদের পিষে ফেলব” মধ্যে একটা অসংগতি ছিল। সেটা আমার জীবনপথে আমাকে থমকে দিয়েছিল। কিন্তু আমি বেপরোয়া, আমি এগিয়ে চললাম।

আমি যখন বুঝলাম আমার ইংরেজী—বিশেষত পড়ার দক্ষতা—যথেষ্ট ভাল হয়েছে, আমি স্থির করলাম মেডিকেল সমতুল পরীক্ষা দিতে, যে পরীক্ষা আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা বৈধ করণের জন্য পাশ করা প্রয়োজন। তাহলে আমি যুক্তরাষ্ট্রে ডাক্তারি করতে পারব। যে বিষয়গুলিতে আমাকে পাশ করতে হবে তার মধ্যে ছিল আচরণ-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান। বিষয় দু’টি আমাকে যেন এক বিশাল জ্ঞানসমুদ্রে ডুবিয়ে দিল যেমনটা আগে কখনও ঘটেনি এবং আমি এই বিষয়ে আমার অত্যন্ত ভাসাভাসা ডাক্তারি জ্ঞানের জন্য বিব্রত বোধ করলাম। এটা ব্যক্তিগত অক্ষমতার জন্য নয়, আমরা যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, সেখানে তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে। আমি বিশ্বাস করি এই সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছিল কারণ এর বেশীর ভাগ বিষয়ের

সাথে ইসলামের শিক্ষার বিরোধ। এ থেকে ছাত্রদের সরিয়ে রাখা এই ভয়ে যে এতে তাদের চিন্তা ভাবনায় পরিবর্তন হতে পারে। কাপলান মেডিকেল স্কুলে, যেখানে বিদেশী ডাক্তারদের এই পরীক্ষা পাশ করতে সাহায্য করা হয়, অন্য মুসলিম দেশ যেমন ইরান, পাকিস্তান থেকে আসা ডাক্তারদের সাথে আমার দেখা হয়। তারাও বলে যে এই বিষয়গুলি এত উঁচুমাত্রায় বা এত গভীরভাবে তাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ানো হয় না।

বিষয়দু'টির জন্য আমার জ্ঞানপিপাসা আমাকে এতটাই গভীরে নিয়ে গেল যে তা পরীক্ষাপাশের জন্য প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশী। আমার আমেরিকাবাসের প্রথমদিকে আচরণ-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমি এতটাই আগ্রহ বোধ করেছিলাম যে তা জানার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলাম। একদিন আমার স্বামীকে একটা কথা বলেছিলাম সেটা সে এখনও মনে রেখেছে: "আমি এখন বুঝি কেন আমেরিকা পরাশক্তি। আমেরিকা মহান কারণ এখানকার মানুষেরা চিন্তার স্বাধীনতা পায়। তারা এমন এক সংস্কৃতির ফসল যা সৃষ্টি হয়েছে পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিকের লেন্সের নীচে। অথচ মুসলিম জগতে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি কারণ আমরা উঠে এসেছি একটা দমনমূলক সংস্কৃতি থেকে যার মানুষের মন সম্বন্ধে কোন সম্মানবোধ নেই এবং বিজ্ঞানের সাথে পা মিলিয়ে চলতে না পারার অক্ষমতাকে অস্বীকার"।

মেডিকেল সমতুল পরীক্ষা পাশের জন্য যেসব বই এবং প্রবন্ধ পড়া প্রয়োজন ছিল, আমার পড়া তাকে অনেক ছাপিয়ে গেল। যখন আমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত একটি আরবি ভাষার সংবাদপত্র খুঁজে পেলাম তখন খুব খুশী হয়েছিলাম। অনেক আশা নিয়ে তখনই ঐ সংবাদপত্র পড়লাম। আমি খুব আশা করেছিলাম, আমরা আমেরিকাতে যে স্বাধীনতা উপভোগ করি তাতে আগে দমনমূলক পরিস্থিতে যা কিছু আমরা প্রকাশ করতে পারিনি, তা প্রকাশ করতে পারব এবং আমাদের মতামত যা আমরা বোতলবন্দী করে রেখেছিলাম তা ছড়িয়ে দিতে পারব। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝলাম, এই সংবাদপত্রগুলি আরব দুনিয়ার সংবাদপত্রগুলিরই

অবিকল নকল। প্রতিটি সংবাদপত্রই বিশেষ কোন দেশ বা দল দ্বারা সমর্থিত এবং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আমাদের নিজেদের দেশগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্বেরই অনুরূপ।

সেই সময়েও ইসলামের সাথে সরু সূতোর একটা বন্ধন আমার ছিল। আমি স্থির করলাম হারানো সত্য খুঁজে পেতে একটা মুক্ত অনুসন্ধান করব এই আশায় যে, সরু সূতোর পরিবর্তে শক্ত রশি আসবে। আমি আমার অনুসন্ধান শুরু করলাম দু'টি ভিন্ন স্তর থেকে—মুসলিম স্তর: যেখানে কোন সামাজিক চাপের ভয় ছাড়াই আমি ইসলাম সম্পর্কে গভীর সবিস্তার জ্ঞান লাভ করলাম; অন্যটি আমেরিকান স্তর: আমেরিকার সমাজ সম্পর্কে সরাসরি গভীর ধারণা, যার ফলে উভয়ের একটা সম্যক তুলনা করতে পারি।

এই অনুসন্ধান চলাকালীন আমি কখনও লেখা বন্ধ করিনি। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একটি প্রবন্ধ লিখতাম। তিনটি সংক্ষিপ্ত রচনায় আমি শান্তভাবে আমাদের প্রথা এবং শিক্ষা পদ্ধতির মৃদু সমালোচনা করেছিলাম। আমার অবস্থানকে সমর্থন করে আমেরিকাতে আমি যা পড়েছি এবং দেখেছি তার সাথে তুলনা করে। প্রতিটি প্রবন্ধ ছিল যেন স্থির জলে পাথর নিক্ষেপ। প্রতিটিই বিশাল আলোড়ণ তুলল। সময়ের প্রেক্ষিতে আমি যত বেশী তীব্র সমালোচনা করছিলাম, তত বেশী তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছিল। ১৯৮৯ সালের গোড়ায় যখন আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তখন থেকে সেপ্টেম্বর ১০, ২০০১ পর্যন্ত সময়কালে আমার লেখার অগ্রগতির একটি লেখচিত্র (graph) যদি আঁকা হয় দেখা যাবে একটি ধীর অথচ দৃঢ় একটি রেখা যা আমার সমালোচনার তীব্রতা প্রকাশ করে। সেই রেখার প্রতিটি বিন্দু প্রমাণ করবে ইসলাম সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা এবং মনোভাব কতটা পরিবর্তিত হয়েছিল এবং নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করবে কখন সেই পরিবর্তনটা হয়েছিল।

আমি ইসলামি এবং আমেরিকান, উভয় ধরণের বই পড়ার প্রতি আসক্ত হয়ে উঠেছিলাম। যত বেশী পড়ছিলাম ততই বুঝতে পারছিলাম আমেরিকার সাথে তুলনায় আমাদের মুসলিম জগতের অবস্থা কত করুণ। এটা শুধুমাত্র আমাদের ইসলামি বিশ্বাস ধারার মর্মান্তিক পরিণতি। আমি আশা করেছিলাম আমার আমেরিকাবাসের

প্রথম চার বছরে যে সরু সূতোটি আমাকে ইসলামের সাথে বেঁধে রেখেছিল, তার জায়গায় শক্ত রশি আসবে। কিন্তু দেখলাম দিনে দিনে সে আরও দুর্বল এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ল। আমি এক সংবাদপত্র থেকে আরেকটায় গেলাম, যেহেতু প্রতিটিই আমাকে নিষিদ্ধ করেছিল, প্রত্যেকেই অন্য একটায় যেতে বলল। সৌদি সমর্থিত কাগজ আমাকে প্রথম প্রত্যাখ্যান করে। সেই সময় সাদ্দাম হুসেনের সরকার সমর্থিত একটি সংবাদপত্র আমাকে নেয়—তবে এজন্য নয় যে তারা আমার লেখা পছন্দ করেছিল, কারণ তারা সৌদিদের ঘৃণা করত।

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর সাদ্দাম হুসেন চেষ্টা করেছিলেন ইসলামকে অবলম্বন করে মানুষের আস্থা অর্জন করতে এবং তার শাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে। ফলে আমি বেশীদিন সেই সংবাদপত্রের সাথে থাকতে পারলাম না, শেষে ওয়াশিংটনে সিরিয় দূতাবাস সমর্থিত একটি কাগজে লেখা শুরু করলাম। যেহেতু সিরিয় সরকার সাদ্দাম হুসেনের মত প্রথমদিকে খুব একটা ধর্মঘেঁষা ছিল না, এই কাগজে আমার অবস্থিতি একটু বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সেই কাগজের প্রকাশক ছিলেন একজন খ্রীষ্টান। একটা পর্যায়ে এসে সমস্যা দেখা দিল। যেভাবে বিভিন্ন দিক থেকে আমার প্রবন্ধগুলির বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান ভয়ঙ্কর আক্রমণ হচ্ছিল একজন অমুসলিম হিসাবে তা তিনি সহ্য করতে পারলেন না।

আমার লেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ কাগজ থেকে মুসলমানরা তাদের বিজ্ঞাপণ তুলে নিল। ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী আক্রমণের প্রায় দুমাস আগে প্রকাশক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনযে তিনি আমার টেলিফোন নাম্বার CAIR-কে (The Council on American-Islamic Relations) দিতে পারেন কিনা, কারণ এর একজন সদস্য আমার সাথে কথা বলতে চান। অবশ্যই আমি সম্মতি দিলাম। সেইদিনই আমি CAIR এর মিস্টার হুশাম আয়লুস এর কাছ থেকে টেলিফোন পেলাম। মিস্টার আয়লুস কথাবার্তার সময় ভদ্রতার সাথে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন নিজেকে সংযত রাখতে। আমি যা লিখেছি সে সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং বললেন আমি সীমারেখা অতিক্রম করার জায়গায় এসে গেছি। যখন একজন

মুসলমান—বিশেষত সে যদি CAIR-এর সদস্য হয়—কোন লেখক বা লেখিকাকে বলে যে সে সীমারেখা অতিক্রম করার জায়গায় এসে গেছে, তার কথা স্বাভাবিক ভাবেই প্রচ্ছন্ন হুমকি বহন করে। বিপদ কতটা গভীর সেটা তারাই বুঝবে যাদের আরবি ভাষায় ভাল দখল আছে এবং ইসলামকে ভালভাবে চেনে। সে কি বলেছে সেটা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা যখন শুনল, তারা আমাকে সহজভাবে ধৈর্য্যসহ থাকতে বলল, কারণ লক্ষণ মোটেই ভাল ছিল না। ভিতরে ভিতরে প্রেসার কুকারের মত ফুটছিলাম আর যত তাপমাত্রা বাড়ছিল, মনে হচ্ছিল আমি বিস্ফোরিত হয়ে যাব।

আমি যখন পিছনে ফিরে তাকাই, আমার অবাক লাগে কোথা থেকে আমার এই ইচ্ছাশক্তি এসেছিল? অনেক ঘটনাই আছে, তবে একটা স্মৃতিই বারবার ফিরে আসে যেদিন থেকে আমি সিরিয়া ছেড়ে এসেছি। আমার স্বামী আমার প্রায় একবছর আগে আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। যখন আমি অভিবাসন দপ্তরে আমার সন্তানদের জন্য পাশপোর্টের আবেদন করলাম, ওখানকার আধিকারিক পাশপোর্ট দিতে অস্বীকার করলেন এই যুক্তিতে যে ইসলামি আইন অনুসারে আমি আমার সন্তানদের বৈধ অভিভাবক নই, তাদের বাবাকে আবেদন করতে হবে। আমি ব্যাগ থেকে ওকালতনামা (Power of Attorney) বার করলাম, যেটি আমার স্বামী উপযুক্ত জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। যাতে আমাকে আমার স্বামীর টাকা, সম্পত্তি, এবং সমস্ত বিষয়ে আইনগত অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোক সেটি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, “ওটা ওকালতনামা, অভিভাবকত্বের প্রমাণ নয়। এটা আপনাকে তার সম্পত্তি বিক্রির অধিকার দিয়েছে, কিন্তু তার সন্তানদের অভিভাবকত্ব আপনার নেই”।

“কিন্তু তারা তো আমারও সন্তান, স্যর”।

“একজন মহিলা তার সন্তানদের অভিভাবক নয়। বুঝেছেন?”

“তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি? ওদের জন্য পাশপোর্ট প্রয়োজন এবং ওদের বাবা এখানে নেই”।

"একটা সমাধান হতে পারে, আপনার স্বামীর পরিবারের কোন পুরুষ এসে বলবেন যে তিনি আপনাকে আপনার সন্তানদের জন্য পাশপোর্ট নিতে অনুমতি দিচ্ছেন"।

আমার স্বামীর পরিবারের নিকট আত্মীয় মাত্র একজনই আমাদের শহরে থাকতেন কিন্তু তাকে আমি কখনো দেখিনি। আলি ছিল অত্যন্ত খারাপ স্বভাবের দুশ্চরিত্র মাতাল। সেকারণেই আমার স্বামী কখনও তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়নি।

আমি খোঁজখবর করে তার বাড়ীতে গেলাম। আমাদের বাসা থেকে দূরে বেশ দরিদ্র এলাকায়। তার স্ত্রী উষ্ণ হাসি দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। তার মুখে আমার জন্য সমবেদনার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। পাছে কেউ শুনে ফেলে এজন্য সে খুব আস্তে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "ও সব সময়ে মাতাল হয়ে থাকে। আমি জানি না তুমি যা চাইছ তা সে করতে রাজী হবে কি না। অল্প কিছু টাকা ওকে ঘুষ দিও। তুমি কি বলছ তা সে শুনবেই না, তবে টাকা দেখলে চাঙ্গা হয়ে উঠবে"।

অভিবাসন দফতরে আলির পকেটে পঞ্চাশ সিরিয় পাউণ্ড(এক ডলার) দেওয়ার পর সে তার পরিচয় পত্র নিয়ে আধিকারিকের কাছে গেল। যে পরিচয়পত্র প্রমাণ করে সে আমার স্বামীর পরিবারের লোক—তবে সম্পর্কের নৈকট্য বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। পরিচয়পত্র দেখিয়ে বলল, "হ্যাঁ অফিসার। সে আমার ভাইয়ের স্ত্রী। আমার ভাই আমাকে তার সন্তানদের অভিভাবক নিযুক্ত করেছে। ভাইয়ের ইচ্ছানুসারে তার সন্তানদের পাশপোর্ট নিতে আমি ওকে বাধা দেব না। যখন আমরা সেই বাড়ী থেকে বেরোলাম তখন আমার হাতে পাশপোর্ট, কিন্ত ভিতরে রাগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমি একজন জ্ঞানবুদ্ধিওয়ালা সম্মানিত মহিলা এবং ডাক্তার; আমি আমার সন্তানদের অভিভাবক হওয়ার যোগ্য নই, কিন্তু মাত্র এক ডলারের বিনিময়ে কোনরকম নৈতিক মূল্যহীন একজন মাতালের অধিকার আছে আমার এবং আমার সন্তানদের অভিভাবক হওয়ার!

আমি স্যুটকেসভর্তি যন্ত্রণার স্মৃতি নিয়ে আমার জেল থেকে পালালাম। আমি আমার দুই শিশুকে রেখে গেলাম। যখন আমি এবং তাদের বাবা তাদের নিয়ে চলতে

সক্ষম হব তখন নিয়ে যাব। আমার স্যুটকেস ভর্তি ছিল আমার সন্তানদের জন্য ভালবাসায় আর সুহা, ফতিমা, আমাল আরও হাজার মুখে। তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা আমি যদি লিখতাম, তাহলে এত বই হত যে আমেরিকান লাইব্রেরী অব কংগ্রেস (American Library of Congress) ভরে যেত। আমি আমেরিকায় এসেছিলাম একটামাত্র লক্ষ্য নিয়ে: আল্লাহ যাদেরকে কেটে ছোট করে দিয়েছেন যতক্ষণ না তারা মাছির থেকেও ছোট হয়ে যায়; তাদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য। আমার লক্ষ্য এবং ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং পরিকল্পনার অভাব ছিল, যে পরিকল্পনার সাহায্যে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়। কিন্তু, আমেরিকা আমাকে পুনর্নির্মাণ করেছে, জ্ঞান দিয়ে শক্তিশালী করেছে, স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়েছে, পরিকল্পনা গঠনে সাহায্য করেছে যাতে আমি ওই হতভাগ্যদের বাঁচাতে পারি। আমি স্থির করেছি ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগে "আল্লাহ"কে বিচারের কাঠগড়ায় তুলব।

আল জাজীরাতে কে ওই মহিলা?

গোটা আরব দুনিয়া জিজ্ঞাসা শুরু করল: “আল জাজীরাতে কে ওই মহিলা যে একজন পুরুষকে থামতে বলছে যাতে সে কথা বলতে পারে?” সে সময়ে আমার ধারণা ছিল না কোন আগুনের শিখা আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি। আল জাজীরাতে প্রথম আসার কথা যখন ভাবি, আমার আশ্চর্য লাগে এবং বিশ্বাস করতে পারি না আমি কি করেছিলাম। প্রথমবার আল জাজীরা টেলিভিসন নেটওয়ার্কে এসে ‘X’ নামের এক মুসলিম ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে বিতর্ক করেছিলাম, তার সাথে আমাদের স্থানীয় মসজিদের ইমামের খুব একটা পার্থক্য ছিল না। প্রোগামের আহবায়ক অনুষ্ঠানের দুদিন আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি বিতর্কে অংশ নিতে পারব কি না। তিনি প্রোগ্রামের বিষয় কি সেটা না বলে বললেন, “আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে ইচ্ছুক আপনার মতে ইসলামি শিক্ষার সাথে সন্ত্রাসবাদের যোগ কতখানি”। আমি প্রায় ষোল বছর আরবিতে কোন আলোচনা করিনি। ঐ সময়ে আমি আরবিতে লিখেছি কিন্তু কথা বলিনি। প্রোগ্রামটি কি ধরণের সে বিষয়ে কোন ধারণা ছিল না, কারণ আমার কেবল লাইনে আল জাজীরা ছিল না এবং সাধারণত টেলিভিসন দেখতাম না।

অবশ্যই আমাকে মনোনীত করার জন্য আল জাজীরার বিশেষ কারণ ছিল। আমার প্রবন্ধগুলি গোটা আরব দুনিয়ায় পরিচিত ছিল। বিষয়টিতে আমার মত ছিল পরিস্কার এবং নির্দিষ্ট। তারা আমাকে মনোনীত করেছিল আরব দর্শকদের এটা দেখাতে যে আমার চিন্তাভাবনা কত অগভীর, আমাকে অপদস্থ করতে এবং এটা নিশ্চিত করতে যে আমি আমার মতকে প্রমাণ করতে অক্ষম। তারা নিশ্চিত ছিল যে,

লেখক হিসাবে আমি পাঠকদের কাছে আমার মত প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও, টেলিভিসনে কোনভাবেই পারব না। কোন একটা চূড়ান্ত আঘাতে একেবারে ভূপাতিত হব। আরব জগতে টেলিভিসনের দর্শকসংখ্যা পাঠক সংখ্যার থেকে অনেক বেশী এবং এতে মুসলিম আরব সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আছে। তারা ভেবেছিল যদি এই দর্শকদের সামনে আমাকে পরাজিত করা যায়, তবে আমি একেবারে শেষ হয়ে যাব!

আরব জগতের সাধারণ মানুষ প্রধানত কোন আলোচনাকে বিচার করে সেই মাপকাঠিতে, যা দিয়ে আমার মা স্থানীয় মসজিদের ইমামকে বিচার করতেন: অর্থাৎ গলার জোর আর তীক্ষ্ণতা দিয়ে। প্রোগ্রামের অন্য অতিথি ছিলেন গলার জোর এবং তীক্ষ্ণতায় দক্ষ, বুদ্ধিমান ইমাম। তিনি আমাকে আমার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের সিকিভাগও কথা বলতে দেননি। আমার উত্তর দেওয়ার অধিকারকেও সম্মান করেননি। আক্রমণের শাস্ত্র যেহেতু অধিকার দেওয়াতে বিশ্বাস করে না, তিনি আমার সময়কেও সম্মান করেননি। তার তীব্র চিৎকার এবং ক্রোধ আমার জন্য নির্দিষ্ট সময় লুঠ করে নিয়েছিল। তিনি আমার একটি শব্দও শোনেননি বা আমার কোন প্রশ্নেরও উত্তর দেননি।

শান্তভাবে এবং অসাধারণ ধৈর্যের সাথে আমি আমার মত প্রকাশ করতে পেরেছিলাম এবং খুব অল্প সময়ে দর্শকদের স্পষ্টভাবে ও সংক্ষেপে আমার কথা বলেছিলাম। ইসলামের ইতিহাসে কোন নারী কখনও কোন পুরুষের চিৎকারকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। ইসলামের ইতিহাসে কোন নারী কখনও শান্তভাব দিয়ে কোন পুরুষের চিৎকার থামাতে পারেনি অথবা কথা বলা এবং বোঝানোর ক্ষমতা দিয়ে পুরুষের আওয়াজকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। ডাকাতি বা লুঠপাঠের দর্শন যাতে মুসলমানরা অতি দক্ষ, এই প্রথম পরাজিত হল। পরাজিত হল একজন নারীর কাছে যে ষোল বছর আরবিতে কথাবার্তা বলেনি এবং যে প্রথমবার লক্ষ লক্ষ মুসলিম দর্শকের সামনে কথা বলছিল।

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছিল, সঞ্চালক আমাকে আরও কয়েক সেকেণ্ড সময় দিলেন আমার বক্তব্য শেষ করার জন্য এবং আমার মতকে সংক্ষেপে প্রকাশ করার জন্য, কিন্তু আক্রমণাত্মক প্রতিপক্ষ আবার আমার কথার মধ্যে কথা বলে বাধা দিলেন। সময় অতি অল্প এবং মহামূল্যবান, যার একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করা যায় না; আমি চিৎকার করে তাকে বললাম: "চুপ করুন! এটা আমার সময়!" আমি কথাটা উচ্চারণ করেছিলাম এটা না বুঝেই যে সেটি আরব এবং মুসলিম ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। ইসলামের ইতিহাসে কোন নারী স্পষ্টভাবে এবং জোরের সাথে কোন পুরুষকে মুখ বন্ধ করতে বলেনি কারণ সেটা তার বলার পালা। ইসলামের প্রথা এবং ঐতিহ্যে নারীর কোন পালা থাকে না। তাদের নিজস্ব সময় বলে কিছু নেই। ইসলামে নারীর তার নিজের উপরেও কোন অধিকার নেই বা তার নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ারও অধিকার নেই।

আমার মেইলবক্স চিঠির বন্যায় ভেসে গেল। "চুপ করুন! এটা আমার সময়!" এটাই ছিল বেশীর ভাগের বিষয়। যেসব দর্শক আমার মতকে সমর্থন করে বক্তব্যের প্রশংসা করেছিলেন, তাদের মনে হয়েছিল গোটা বিতর্কে আমি যা বলেছি তার ভাল অংশের মধ্যে এটি একটি। কিন্তু যে মুসলমানরা এটাকে তাদের আক্রমণ এবং চিৎকার করার ক্ষমতার উপর আঘাত বলে মনে করল, তারা অভিশাপ দিল এবং আমার সাহসকে অপমানজনক ঔদ্ধত্য বলে মনে করল। আমার কাছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল আমি একটা ধর্মীয় নিষেধকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলাম, অন্য মুসলমান মহিলারা আমাকে সেটা ভাঙ্গতে দেখেছিল। আমি একটা ধর্মীয় নিষেধকে ভেঙ্গেছিলাম যা আমি মানিনা এবং পূতপবিত্র ও অলঙ্ঘ্য বলেও মনে করি না। আমি আশা করি এই ঘটনা অন্য নারীদের সাহস দেবে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। চৌদ্দশ বছরে এই প্রথমবার আমি একজন মুসলমান শেখের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম এবং তার নির্বুদ্ধিতা ও ভণ্ডামিকে খুলে দিয়েছিলাম।

আমি কে যে এই অসমসাহসিক কাজ করল? আমি যা করেছিলাম তা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করতে শুরু করল যে আমি কে এবং আমি কি বিশ্বাস করি। আল জাজীরাতে কে ওই মহিলা? আমি একজন মুসলিম নারী। হ্যাঁ, আমি নিজেকে মুসলিম মনে করি। সে আমি ইসলামে বিশ্বাস করি বা না করি। আমি নিজে পছন্দ করে মুসলিম হইনি। কিন্ত অন্য কিছু হওয়াও আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। প্রতিটি মানুষ সেটাই যা তাকে তার শিশুবেলায় বোঝানো হয়। আমরা প্রত্যেকেই ছোটবেলায় আমাদের জন্য পাতা ফাঁদে পড়ে যাই, আর বাকী জীবনটা শুধু একটা তিক্ত লড়াই সেই ফাঁদে থাকার জন্য অথবা ফাঁদ থেকে বেরোবার জন্য। থাকা বা বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত শুধু আপনার একার এবং যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক জীবন তার বিরোধিতা করবে। আপনি যদি থাকার সিদ্ধান্ত নেন তবে জীবন আপনাকে টেনে বার করার চেষ্টা করবে আবার যদি বেরিয়ে যেতে চান তবে টেনে আপনাকে আটকে রাখবে। থাকা সমস্যা, বেরিয়ে যাওয়াও সমস্যা। আপনার স্বাধীনতা নির্ভর করে থাকা বা বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের উপরে।

আমি শৈশবে ইসলামের ফাঁদে পড়েছিলাম। বড় হয়ে আমি সেই ফাঁদ থেকে বেরোনোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার স্বাধীনতা আমার সিদ্ধান্তে নিহিত। আমি বিশ্বাস করি না কখনও আমি সেই ফাঁদের কবল থেকে মুক্তি পাব—কেউ পারে না—কিন্তু সেই অক্ষমতা আমাকে আমার স্বাধীনতা থেকে সরাতে পারে না। আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে, যে ভাবেই মুক্ত করে থাকি; আমি এখন স্বাধীন।

এটাই জীবনের খেলা। প্রতিটি মানুষই একটি জন্মচিহ্ন নিয়ে জন্মায়, যেটা অন্যেরা তার জন্য তৈরী করে দেয়। তার কোন ভূমিকা নেই স্থির করার, সেই জন্মচিহ্ন কেমন দেখতে হবে, কি দিয়ে তৈরী হবে, কিন্তু সে সেটা ধারণ করতে বাধ্য হয়, তার গায়ে আঁকা থাকে সারাজীবন কারণ তা মোছা যায় না, কখনো বিবর্ণও হয় না। প্রতিটি জন্মচিহ্ন সেই মানুষটির পারিবারিক মূল্যবোধ, আদর্শ, প্রথা এবং ঐতিহ্যের পরিচায়ক। এটাই আপনার একমাত্র সম্বল যা দিয়ে আপনাকে জীবনযুদ্ধে লড়তে হবে। এর কোন অংশ আপনাকে বাধা দেবে, অন্য অংশ আপনার পথ সুগম

করবে। আপনাকে একাই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কি রাখবেন আর কি ত্যাগ করবেন। জীবন কোন মনোরম বিষয় নয়। কেন?

প্রতিটি মানুষের জন্মচিহ্ন অন্যের থেকে আলাদা। মার্গারেট থ্যাচার তাঁর জন্মচিহ্নে যা দেখেছিলেন তা কোনভাবেই আমার দিদিমার জন্মচিহ্নের সাথে মেলে না। থ্যাচার যা দেখেছিলেন তা তাঁর গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথকে মসৃণ করেছিল। সেই দেখার মূল মন্ত্র ছিল, "তুমি যেমন চাও তাই তুমি হতে পার"। জীবনের পথে মিসেস থ্যাচার বহু বাধার সম্মুখীন হয়েছেন যারা তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সহজাতভাবে পাওয়া সেই চিহ্নের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি সব বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমার দিদিমার জন্মচিহ্ন ছিল আলাদা। দিদিমা যা দেখেছিলেন তার ফলে তিনি তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে নাচতে পেরেছিলেন অথচ অন্তরে যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছিলেন। তার জন্মচিহ্নের মর্মকথা ছিল অন্যরকম। সেকথা বলে, "নারীরা হল অমঙ্গল। সেই অমঙ্গলের দশ ভাগের একভাগ ঢাকা পড়ে বিয়ের মাধ্যমে, বাকী নয় ভাগ তার সাথে কবরে ঢাকা পড়ে"। আমার দিদিমা তাঁর স্বামীর বিয়েতে নাচতে অস্বীকার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি দাদুর আদেশ পালন করেছিলেন এবং স্বামীর রক্ষণাবেক্ষণে স্ত্রী হয়ে রয়ে গিয়েছিলেন যাতে বিয়ে তাঁর কিছুটা দোষ ঢেকে দেয়। জীবন দিদিমার সাথে যে খেলা খেলেছিল তার থেকে অনেক সহজ ছিল মার্গারেট থ্যাচারের খেলা। মিসেস থ্যাচার অনুভব করেছিলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত, আর দিদিমা অনুভব করেছিলেন তিনি শুধুই দাদুর স্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত।

দু'জন নারীর জীবনেই অনেক বাধা এসেছে যে কারণে তাঁরা তাদের বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে পারতেন, কিন্তু আমার দিদিমা যেসব বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা তাঁর বিশ্বাসকে ত্যাগ করার পক্ষে অনেক বেশী কঠিন ছিল মার্গারেট থ্যাচারের চেয়ে। তর্কের খাতিরে ধরা যাক, মিসেস থ্যাচার তার সমুখের বাধার কারণে নিরুৎসাহিত হয়ে তাঁর বিশ্বাস ত্যাগ করলেন অর্থাৎ তিনি যা হতে চান তিনি তাই হতে পারেন, এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ত্যাগের কারণে তিনি যে আসন পেতে

চেয়েছিলেন তা থেকে বঞ্চিত হতেন, কিন্তু তাঁকে গৃহহীন হয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হত না। মার্গারেট থ্যাচারের অবচেতনে হয়ত তাঁর বিশ্বাস কষ্ট দিত যতদিন না তিনি যা হতে চেয়েছিলেন অন্তত তার কাছাকাছি কিছু একটা হতে পারতেন।

আবার তর্কের খাতিরে ধরা যাক, আমার দিদিমা তাঁর বিশ্বাস ত্যাগ করলেন যে মেয়েরা একটা অমঙ্গলের বস্তু যার দশ ভাগের একভাগ ঢাকা পড়ে বিয়েতে। তাঁর এই বিশ্বাসত্যাগ তাঁকে সাহায্য করত আমার দাদুর আদেশ অমান্য করতে এবং তার বিয়েতে নাচার যন্ত্রণা এড়াতে পারতেন। কিন্তু যদি তিনি তা করতেন, তাঁর ঠাঁই হত তাঁর বাবার বাড়ীতে, যা তাঁর নিজের এবং পরিবারের অপমান।

আমার দিদিমার অবচেতনে তাঁর বিশ্বাস ক্রমাগত কষ্ট দিত যেমন দিত মিসেস থ্যাচারকে। এমনকি যদি সবকিছু ঠিক থাকত, তবু দিদিমা সারাজীবনে ঐ "অমঙ্গল"-এর একটা ক্ষুদ্র অংশের চেয়ে বেশী কিছু হতে পারতেন না, যে অমঙ্গলের কথা তাঁকে বোঝানো হয়েছিল এবং তিনি তা নিজের অঙ্গীভূত করেছিলেন।

যে জন্মচিহ্ন আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে পাই তা মনের গভীরে আঁকা থাকে এবং আমরা যতই তাকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করি না কেন একটা বড় দাগ থেকে যায় যা আমাদের প্রভাবিত করে এবং প্রতি মূহুর্তে মনে করায়। আর সেজন্যই আমি আবার বলছি: "আমি একজন মুসলমান"। আমার মনের সচেতন অংশে আমি স্বাধীনতা প্রয়োগ করেছিলাম এবং ইসলাম ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার অবচেতন মনে যে জন্মচিহ্ন আঁকা আছে তার থেকে আমি কতটুক মুক্ত হতে পেরেছি? একটা বিশাল দাগ এখনও আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি নিজেকে আবার প্রশ্ন করি, "আল জাজীরাতে কে ওই মহিলা?" আমি শুধু এই উত্তরই দিতে পারি যেমন ইসলামের শিক্ষার কারণে আমার দিদিমা দিতেন: "সে একটা অমঙ্গল! সে তার স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ তার দোষের দশ ভাগের একভাগ ঢেকে দেওয়ার জন্য এবং এখন অপেক্ষা করছে বাকী নয় ভাগ কবরে লুকানোর জন্য"। আধুনিক স্নায়ুজীববিদ্যা থেকে আমরা জানি যে জন্মচিহ্ন, আমি যে নাম দিয়েছি, তার সাথে থাকে শারীর-স্থান বিষয়ক, রাসায়নিক এবং শারীরবৃত্তীয়

পরিবর্তন, যা ঘটে দেহের কোষে এবং মস্তিস্কের কলাসমূহে। আমি জানিনা আমার নিজেকে পুনর্গঠন করার ক্ষমতা আছে কি না, কিন্তু একটা জিনিস আমি জানি: আমার মায়ের দেওয়া জন্মচিহ্ন আমার যে ক্ষতি করেছে সেইভাবে আমার মেয়েরা তাদের জন্মচিহ্ন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমি চাই না।

আমি আশা করি আমার লেখা সন্তানদের জন্মের আগেই সেই চিহ্নের বিষয়ে মুসলিমদের চিন্তা করতে সাহায্য করবে যা তারা সন্তানদের দিয়ে যাবে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জন্মচিহ্নের কারণে আমি যন্ত্রণা ভোগ করেছি, এখনও করছি এবং মৃত্যুদিন পর্যন্ত করে যাব। আমি আমার মেয়েদের সেই যন্ত্রণা থেকে কিছুটা হলেও বাঁচাতে পেরেছি। আমার মেয়েরা হয়ত একজন মার্গারেট থ্যাচার হয়ে উঠতে পারবে না, কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার দিদিমার চেয়ে বেশী মিসেস থ্যাচারের কছাকাছি হবে। আমার একবিন্দুও সন্দেহ নেই যে আমার নাতনি একজন মার্গারেট থ্যাচার হয়ে উঠতে পারবে যদি সে চায়। আমি আমার জন্মচিহ্ন ত্যাগ করেছিলাম শুধুমাত্র আমার জন্য নয়, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও।

আবারও, আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, "আল জাজীরাতে কে ওই মহিলা?" সে বলে সে একজন মুসলিম নারী। কিন্তু মুসলিম নারী কি? তার শিশু বয়সে ইসলাম তাকে যা বলেছিল সে তাই। তার জন্মচিহ্নে যন্ত্রণার সাথে ইসলাম কোন নীতিবাক্য লিখে দিয়েছে? "একজন নারী একটি অমঙ্গল"। এই হাদিস ইসলামের নবী মহম্মদের দ্বারা উচ্চারিত হয়ে মা থেকে কন্যায় চালিত হয়েছে, জন্মচিহ্নে খোদিত হয়েছে, তারপর বয়ে চলেছে এবং আবার বয়ে চলেছে আমার কাছে পৌঁছন পর্যন্ত। এই হাদিসকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ প্রথা পূঞ্জীভূত হয়েছে, একে শুধু গৌরবান্বিতই করেনি, একে আরও কুৎসিৎ করেছে।

ইসলামে এই হাদিসটি এবং তার সব ব্যাখ্যা পবিত্র: আমরা কখনও একে লঙ্ঘন করতে পারি না। জগতে একজন নারীর কাছে এর থেকে মারাত্মক কোন বিশ্বাস হতে পারে না যে সে একটা অমঙ্গল। অন্য কোন বিশ্বাসই একে কম

অপমানজনক করতে পারবে না। জ্ঞান হওয়া অবধি আমি এই বিশ্বাস বারবার শুনেছি। এটাই আমাকে শেখানো একমাত্র হাদিস নয়, তাদের মধ্যে এটা কুৎসিৎতম।

আমার কাছে মায়ের সব থেকে পুরানো স্মৃতি হল তাঁর একটি গল্প, তিনি কিভাবে আমার নাম রেখেছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে আমাকে গল্পটি বলেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল তিনি অন্তরে কাঁদছেন। তিনি বলেছিলেন আমার জন্ম হওয়াতে তিনি খুব একটা খুশী হননি, এটা অবশ্য বলাই বাহুল্য। তিনি কোন পুত্রের জন্ম দেওয়ার আগে আমার কাকার স্ত্রী দুই পুত্রের জন্ম দিয়ে ফেলেছেন। এই দুর্ঘটনার চাপে মা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না আমার কি নাম রাখবেন। একদিন সকালে আমার কাকা আমাদের বাড়ীর বারান্দার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখেন আমার মা আমাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তিনি হেসে বললেন: "এখনও ওর নাম রাখো নি?"

মা বললেন: "এখনও রাখা হয় নি। তুমি একটা নাম দেবে?"

কাকা নির্দ্বিধায় বললেন: "ওর নাম রাখ 'গু'। এটাই ওর উপযুক্ত নাম"।

মা এই গল্প আমার সামনে শতবার বলেছেন। তিনি তাঁর প্রতিবেশী মহিলা বন্ধুদের সাথে মজা করার জন্যই এটা বলতেন, বুঝতেনই না প্রতিবারই কত গভীরভাবে আমার মনে আঘাত করছেন। এভাবেই কাকার সৌজন্যে আমার মা আমার জন্মচিহ্নে গু নামটা জুড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের জন্মচিহ্ন বহু শতাব্দী পেরিয়ে তাঁকে এটা করতে নির্দেশ দিয়েছিল।

মুসলিম নারীর জন্মচিহ্নে সবথেকে ভীতিপ্রদ অংশ হল নবীর স্ত্রীদের গল্পগুলি থেকে যা এসেছে। যা একটা ফাঁদ সৃষ্টি করেছে যে ফাঁদে প্রতিটি মুসলিম নারীই পড়ে: আমার জীবনে কোন মানুষই নবীর থেকে ভাল হতে পারে না এবং নবীর স্ত্রীরা তাদের স্বামীর প্রতি যতটা অনুগত ছিলেন আমি তার থেকে কম অনুগত হতে পারি না। পুরুষরা তাদের নবীকে আত্মীকরণ করেছে আর নারীরা করেছে তার স্ত্রীদের।

ইসলামের পুরুষ এবং নারী কিভাবে এই ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবে? আমি জানিনা তারা পারবে কি না, যদি না তারা এই বিয়েগুলিকে খুঁটিয়ে দেখে। মহম্মদ এবং তার স্ত্রীদের অসম্মান করার জন্য নয়, আমি এটা বলছি নারীর প্রতি মুসলিম পুরুষদের মনোভাব এবং আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য, মনে রাখতে হবে মহম্মদ তাদের আদর্শ।

কোরানে আছে: "আল্লাহর প্রেরিত দূতের একটি সুন্দর উদাহরণ আছে" (৩৩:২১)। নবী আয়েষার সাথে তার বিবাহ স্থির করেন যখন আয়েষার বয়স ছয় এবং তার বয়স পঞ্চাশ। বিয়ের বাসরযাপন হয় যখন তার বয়স নয় বৎসর। আল-শতি-র লেখা 'মহম্মদের স্ত্রীগণ', নবীর জীবনীতে সেই দিনের কথা আয়েষার জবানীতে বর্ণিত আছে:

"নবী আমাকে বিয়ে করেন যখন আমার ছয় বছর বয়স এবং বাসরযাপন করেন আমার নয় বছর বয়সে। আল্লাহর নবী কয়েকজন পুরুষ ও মহিলাকে, যারা তার অনুসারী ছিল, সাথে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে আসেন। আমি গাছের ডালে বাঁধা একটি দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম, তখন আমার মা আমার কাছে এসে নামিয়ে নেন। তিনি আমার চুল আঁচড়ে দিলেন, জল দিয়ে আমার মুখ পরিস্কার করে দিলেন, তারপর একটি ঘরের দরজার কাছে নিয়ে গেলেন। আমাকে শান্ত হতে দেওয়ার জন্য একটু থামলেন, তারপর ভিতরে নিয়ে গেলেন। আল্লাহর নবী একটি বিছানার উপর বসে ছিলেন, মা আমাকে তার কোলে বসিয়ে দিলেন। সবাই লাফিয়ে উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল, এবং নবী আমাদের বাড়ীতে বাসর করলেন।

এ গল্প আমার বইএ স্থান পেয়েছে তার ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য নয়, বরং আমি এর নৈতিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এ গল্প কি করেছে এবং এখনও করে চলেছে মুসলমান পুরুষ ও নারীদের নৈতিক এবং মানসিক গঠনকে ধ্বংস করার জন্যে। একজন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পুরুষ বিয়ে করেছে একটি ছয় বছরের বালিকাকে এবং তার নয় বছর বয়সে বাসরযাপন করেছে। এটা একটা অপরাধ, সরল ও সোজা

বিষয়। যে সময়ে এটা ঘটেছিল তখন হয়তো এটাই একমাত্র ঘটনা নয়, কিন্তু সময় এসেছে তেমনটাই ভাবার। এ অপরাধের কুৎসিৎ চেহারা শুধু এই ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা যে ধর্মীয় এবং আইনগত বৈধতা সমাজে সৃষ্টি করেছে সেখানেই এর প্রকৃত কুৎসিৎ রূপ। ব্যক্তি মুসলমান এ ঘটনাকেই নৈতিক উদাহরণ বলে গন্য করে। সেখানেই এর গুরুত্ব, ঘটনার স্থান এবং কাল নয়।

ইসলামের প্রথা শৈশবকে কোন মূল্য দেয় না। একটা শিশু তার পিতার সম্পত্তি, পিতা অন্য যে কোনও সম্পত্তি যেভাবে ব্যবহার করে ঠিক তেমনি ভাবে তাকেও ব্যবহার করতে পারে। যখন একজন মা তার নয় বছর বয়সী বাচ্চা মেয়েকে তার ঠাকুর্দার বয়সী একজন লোকের হাতে তুলে দেয়, তার মেয়ের শৈশব অপূরণীয়ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। যখন একজন মায়ের কোন কাজ ধর্মীয় এবং আইনি বৈধতা পায়, তখন সেটাই চৌদ্দশ বছর ধরে জীবনের রীতি হয়ে দাঁড়ায়।

মুসলিম জগতে একটি শিশুর কোন অধিকার নেই। সে একটা সম্পত্তি, দায়িত্ব নয়। ইসলামের শিক্ষা শিশুদেরকে শেখায় পিতামাতার আদেশ পালন করতে কারণ তারা তাদের জীবন দিয়েছে। কিন্তু সেই শিক্ষাই শিশুটির জীবনের মান এবং প্রকৃতি বিষয়ে পিতামাতার দায়িত্ব সম্পর্কে কিছুই বলে না। ইসলামি শিক্ষা শিশুটিকে পিতামাতার অন্ধ আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর উপর জোর দেয়। সে তাদের সমস্ত আদেশ পালন করে, ঈশ্বরকে মান্য করতে যেগুলি বাধা দেয় সেইগুলি ছাড়া। আল্লাহ মানুষকে তার পিতামাতার মাধ্যমে দমন করে রাখে এমন কি শিশুটিকে দৈত্যের কবলে রাখাও নিশ্চিত করে, দৈত্য আদেশ করে পিতামাতাকে অমান্য করতে যদি তাদের আদেশ দৈত্যের মনোমত না হয়।

ইসলামি আইন মাত্র একটি বিষয়ে শিশুদের প্রতি সমাজের দায়িত্বের কথা বলে: যদি কোন শিশুর পিতামাতা ইসলাম ত্যাগ করে তবে সমাজ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে শিশুটিকে ইসলামের অধীনে রাখবে। মুসলমান সমাজে মানুষ শিশুকাল থেকেই তাদের পিতামাতার ফাঁদে পড়ে এবং তাদের দয়ায় জীবন ধারণ করে, যদি না এমন কোন আইন থাকে যাতে সমাজ এসে তাদের পিতামাতার অত্যাচার থেকে বাঁচায়।

এই অবস্থা চলতে থাকে সারা জীবন ধরে। একজন মুসলমান তার পিতার চোখে শিশুই থাকে যতদিন পিতা বেঁচে থাকে এবং তার পৌরুষ প্রকাশের একটিই সুযোগ থাকে স্ত্রী ও সন্তানদের উপর কঠোর আচরণ করায়।

যন্ত্রণার এই চক্র চলতেই থাকবে যতদিন না আপনি জানবেন কোথায় এর শুরু, কোথায় শেষ। যখন একজন মুসলমান নারীর বিয়ে হয়, সে শুধু একজন পুরুষকেই বিয়ে করে না, তার বাবা এবং মাকেও সাথে নেয় যারা ইসলামের আইনে এই বিয়েতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। স্বামীর পিতামাতা ছোট বড় সমস্ত বিষয়ে মাথা গলায় এবং শাশুড়ী এটাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে, যখন তিনি নববধূ ছিলেন সেই প্রথম জীবনে ভোগ করা যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিতে প্রতি মূহুর্তে নববধূর উপরে রাগ প্রকাশ ক'রে। অল্পবয়সী স্বামী মনে করে আইনগত এবং প্রথাগতভাবে সে অন্ধভাবে মাকে মান্য করতে বাধ্য। সে তার মাকে লাগামছাড়া ভাবে তার এবং তার পরিবারের বিষয়ে নাক গলাতে দেয়।

একজন মুসলিম পুরুষ অবচেতনেই তার পিতার মত আচরণ করে এবং স্ত্রীকে লৌহকঠিন হাতে শাসন করে আবার একইসাথে কষ্ট অনুভব করে পিতার হাতে তার মায়ের অত্যাচারের কথা ভেবে, যখন সে ছোট ছিল। সে বিষয়টিকে ন্যায়সংগত মনে করে এই ভেবে যে সে তার মাকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। তার মা অবচেতন মনে তার শাশুড়ীর ভূমিকা নকল করে যখন নববধূর উপর তার অল্পবয়সের রাগ উগরে দেয়—এই চক্র চলতেই থাকে কারণ ইসলাম নারীকে ব্যবহার করে অন্য নারীকে অত্যাচার করার যন্ত্র হিসেবে। এইরকম সমাজে নারীরা পুরুষদের উপরে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারে না, শুধুমাত্র অন্য নারীর উপর তাদের অবদমিত রাগ উগরে দেয়।

আমি মুসলিম নারীদের কাছ থেকে অনেক চিঠি পাই যারা আমাকে অভিশাপ দেয়। আমি একে এক নারীর প্রতি অন্য নারীর তীব্র ঈর্ষা ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। যখন এই নারীরা আমার লেখা পড়ে তখন চেতনে এবং অবচেতনে তারা নিজেকে প্রশ্ন করে: "কেন ওয়াফা সুলতান তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা পায় অথচ

আমি পাই না? কেন ওয়াফা সুলতান এমন দেশে বাস করতে পারে যে দেশ তাকে সম্মান করে অথচ আমি পারি না?” যখন এসব প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে হতাশ বোধ করে তখন আমাকে আক্রমণ করে আর অভিশাপ দেয়। আমি তাদের অবস্থা বুঝতে পারি এবং সম্মান করি। হয়ত তার থেকেও বেশী, আমি তাদের প্রতি সহমর্মিতা বোধ করি। আমার মন কাতর হয়ে পড়ে, কারণ আমি জানি তারা কেমন জীবন যাপন করে, কিন্তু আমি একটাই কাজ করতে পারি তা হল এ বিষয়ে লেখা আর ইসলামের বিরুদ্ধে বলা; আমি তাদেরকে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারি।

আয়েষার সাথে মহম্মদের বিয়ের কাহিনী এই অত্যাচারকে আজকের দিন পর্যন্ত চিরস্থায়ী হতে সাহায্য করেছে। আমার বোন তার পিসির ছেলের সাথে তার মেয়ের বিয়ে স্থির করেছিল যখন মেয়ের বয়স এগারো আর ছেলের বয়স চল্লিশ। আমি তখন কিশোরী এবং আমি এখনও মনে করতে পারি যখন প্রতিবেশী মহিলারা জিজ্ঞাসা করত এই বিয়ের বিষয়ে মেয়ে কি ভাবছে তখন আমার বোন বলত: “সে এখনও বাচ্চা; সময়ের সাথে সে স্বামীকে ভালবাসবে। বিয়ে হয় আল্লাহ আর তাঁর নবীর নিয়মে”। হায়! তা কখনও হয় নি। সেই বিয়েটা ছিল একটা ভয়ানক এবং অসুখী ঘটনা যা থেকে মেয়েটি কোনদিন বেরোতে পারেনি। যখন আমার ভাগ্নী স্বামীর বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল, যেমন সে প্রায়ই যেত, এবং বাবার কাছে গিয়ে উঠল, তখন দেখল সে জেলখানার এক কোন থেকে অন্য কোনে গিয়েছে মাত্র। তার বাবা তাকে বোঝাল যে একজন নারীর পক্ষে তার স্বামীর ঘরই সর্বোত্তম জায়গা। পরিবারের চাপে সে ফিরে গেল তার “আল্লাহ ও তাঁর নবীর দ্বারা নির্দিষ্ট সর্বোত্তম জায়গায়”। কোনদিকে কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে আমার ভাগ্নী আত্মহত্যা করে যখন তার বয়স ছাব্বিশ, যে সময়কালের মধ্যে সে চার সন্তানের মা হয়েছিল।

আয়েষার সাথে মহম্মদের বিয়ের কাহিনীর আরও ভয়াবহ প্রভাব আছে মুসলিম পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের উপরে। বিয়ের গল্পে আছে, যে মূহুর্তে আয়েষার মা তাদের বাড়ীর বিছানায় তাকে মহম্মদের হাতে তুলে দিলেন তখনই মহম্মদ নয় বছর বয়স্কা আয়েষার উপর শিকারী পাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই “বিয়ে”র গল্পের

মাধ্যমে ইসলাম নারীর শরীর, বুদ্ধিবৃত্তি, মানসিক আবেগকে বিয়ের উপযোগী হয়ে ওঠার বয়সে পৌঁছানোর অধিকারকে অস্বীকার করে। ইসলাম নারীর বিচার-বোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে বিয়ে করার অধিকারকে অস্বীকার করে। একটি মেয়ে তার দোলনা থেকে ঝাঁপ দিয়ে একজন পুরুষের হাতে পড়বে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিণত মহিলা হয়ে যাবে—নৈতিকতার প্রাথমিক নিয়ম একে মানতে পারে না। গভীর দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় আইনই একে মান্যতা দিয়েছে, ফলে সেটাই জীবনের ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই আইনের কারণে গোটা ইসলামি দুনিয়ায় অসংখ্য অল্পবয়সী মেয়ের শৈশব ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেক আরব দেশে যেমন জর্ডন, সিরিয়া, মিশরে উপসাগরীয় পুরুষদের দ্বারা নাবালিকা মেয়েদের অধিকারের উপর শত শত অপরাধ প্রতি বছর ঘটে, যে মেয়েদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই তাদের নিজেদের জীবনের উপর। এইসব লোকেরা অসদুপায়ে অর্জিত টাকা এবং অস্তিত্বহীন নৈতিকতা নিয়ে তীব্র এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে নাবালিকা মেয়েদের কেনে। এইসব দানবসদৃশ শূয়োররা যে মেয়েদের কেনে সেটাই তাদের যন্ত্রণার আরম্ভ। সে যন্ত্রণা সাধারণত শেষ হয় তার বাবার সংসারে ফিরে যখন তার শৈশব, তার নারীত্ব, তার সম্মান, এবং পরিচয় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে; আল্লাহ ও তাঁর নবীর আইন অনুযায়ী বিয়ের নামে। সেই নাবালিকা তার জীবনের নরকে ফিরে আসে সমাজে পরিত্যক্ত হয়ে যে সমাজ তার এই দুরবস্থাকে সামান্য মর্যাদাও দেয় না। এরপর যদি সে পারে জীবনের বাকী দিনগুলি পার করে অন্যদের মুখে মাংসখণ্ডের মত নির্দয়ভাবে চর্বিত হয়ে।

মহম্মদের আরও বিয়ের ঘটনা আছে, যেমন জয়নবের সাথে বিয়ে, যে বিয়ে পুরুষ ও নারীর প্রকৃত সম্পর্কের চূড়ান্ত ধ্বংস স্বরূপ। জয়নব ছিল মহম্মদের পিসির মেয়ে এবং পালিত পুত্র জায়েদের স্ত্রী অর্থাৎ পুত্রবধূ। একদিন নবী জায়েদ ও জয়নবের বাড়ীতে যান। দরজায় গোচর্মের একটি পর্দা ছিল যেটি হাওয়ায় উড়ে যায় এবং তিনি জয়নবকে দেখতে পান। তিনি তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যান। জয়নব

মহম্মদকে ভিতরে আসতে বলে কিন্তু তিনি অসম্মত হয়ে ফিরে যান এবং আস্তে আস্তে বলতে থাকেন "যিনি হৃদয় পরিবর্তন করে দেন তিনি প্রশংসিত হোন"। যখন জায়েদ স্ত্রীর কাছ থেকে এই ঘটনা জানল, সে মহম্মদের কাছে গিয়ে বলল: "সম্ভবত জয়নব আপনাকে মুগ্ধ করেছে, আমার উচিৎ তাকে আপনার কাছে দিয়ে দেওয়া। মহম্মদ তাকে বললেন: "তুমি তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও"। আপনি যখন বিষয়টি চিন্তা করবেন, যা আমরা এখন দেখলাম, পুত্র তার স্ত্রীকে দিয়ে দিচ্ছে পিতাকে; যেন সে তার বন্ধুকে বলছে: "তোমার কি আমার জুতোটা পছন্দ? আমি খুলে ফেলব যাতে তুমি নিতে পার?" যেদিন থেকে এই "পবিত্র" বিয়ে ঘটেছে, তখন থেকেই মুসলিম নারীদের জুতোর মত পরা হয়েছে আর খুলে ফেলা হয়েছে বহু শতাব্দী ধরে।

কিন্তু, মহম্মদ তার কামনাকে দমন করতে পারলেন না এবং পাথরখণ্ডের মত আয়াতের পর আয়াত গড়িয়ে নেমে এল পাহাড়চূড়া থেকে, তার কামনাকে লাগামছাড়া করার ক্ষমতা দিল, দেবদূত গ্যাব্রিয়েল অনবরত সামনে-পিছনে, উপরে-নীচে যাতায়াত করতে থাকলেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি মহম্মদের দ্বিধার সমাধান করতে পারলেন। কোরানে এই আয়াতগুলির প্রথমটিতে আল্লাহ মহম্মদকে তার ইচ্ছা গোপন করার জন্য মৃদু তিরস্কার করলেন। "তুমি অন্তরে যা গোপন করতে চেয়েছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন: তুমি মানুষকে ভয় করছিলে, অথচ তোমার আল্লাহকে ভয় করা উচিত ছিল"(৩৩:৩৭)। প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা গ্রহণযোগ্য ছিল না এবং তৃতীয় একটি আয়াত সুবিধাজনক ভাবে নাযিল হল জায়েদের দত্তক নেওয়াকে বাতিল করে। সেইসঙ্গে মহম্মদের পুত্রবধূকে বিয়ে করা নিয়ে যারা সমালোচনা শুরু করেছিল তাদেরও মুখ বন্ধ করা গেল। "মহম্মদ তোমাদের কারোর পিতা নন। তিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ এবং নবী"(৩৩:৪০)।

এখানে যেমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে, একজন মুসলমান পুরুষ একটা দুর্বল সত্ত্বা যে তার প্রবৃত্তিকে শাসন করতে অক্ষম এবং সে কারণে ইচ্ছামত তার প্রবৃত্তিকে লাগামছাড়া করার অধিকার তার আছে। যখন ঈশ্বরের নবী তার পুত্রবধূর প্রতি লোভ করলেন এবং ঈশ্বর তার ইচ্ছাপূরণের আদেশ দিলেন; এই আচরণ মুসলমানদের

ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আইনে পূতপবিত্র হয়ে গেঁথে গেল। মহম্মদ দত্তকপ্রথাকে নিষিদ্ধ করলেন সে সময়ের প্রথানুযায়ী সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য তার দত্তকপুত্রের স্ত্রীর সাথে বিয়েকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য। এই নিষেধ একটি সমাজিক নিয়মের মৃত্যু ঘটাল যে নিয়ম বহু শিশুকে রক্ষা করতে সাহায্য করত, যে শিশুরা কোন না কোন কারণে আজ মুসলিম সমাজের অন্তরকে পচিয়ে দিচ্ছে।

এই সমাজে বহু শিশু যারা তাদের বাবা বা মাকে হারিয়েছে তারা যে যন্ত্রণার শিকার হয় তার কোন যথার্থ সমাধান নেই। এই সমাজে পিতার নতুন স্ত্রী স্বামীর আগের স্ত্রীর সন্তানদের কখনো নিজের সন্তান বলে মনে করে না। তার ধর্মবিশ্বাস, যেখানে দত্তক নেওয়া নিষেধ, তাকে চেতনে ও অবচেতনে বাধা দেয় তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে। নতুন স্বামীরাও একই আচরণ করে তার স্ত্রীর প্রথম বিয়ের সন্তানদের সাথে। এই সমাজে অনাথ আশ্রমগুলি পশুর খোঁয়াড়ের থেকে ভাল কিছু নয় যেখানে জীবনের একান্ত প্রাথমিক নৈতিকতাও রক্ষিত হয় না। সমাজ এই শিশুদের ঘৃণার চোখে দেখে কারণ এদের বেশীর ভাগই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ফসল। তাদের মাধ্যমে তাদের বাবার উপর প্রতিশোধ নেওয়া হয়। ইসলামি আইনে বিশ্বাসের কারণে লোকে এদের দত্তক নেয় না, যে আইন দত্তক নেওয়া নিষিদ্ধ করে অথচ দ্বিতীয় কোন সমাধানও দেয় না। আমাদের সকলেরই মনে আছে বসনিয়া যুদ্ধের পর কি ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছিল। যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে প্রায় ৩০,০০০ অবৈধ শিশু জন্মায়। তাদের মুসলমান মায়েরা তাদেরকে লালন পালন করতে অস্বীকার করার কারণে পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলিতে ভাগ করে দেওয়া হয় যার মধ্যে সিংহভাগ গ্রহণ করে আমেরিকা। কোন মুসলিম দেশ এই শিশুদের একজনকেও গ্রহণ করে নি।

মহম্মদের সমস্ত বিয়ের মধ্যে সাফিয়ার সাথে বিয়েটাই ভয়ঙ্করতম। সাফিয়া বিন্ত হায়ী ছিলেন একজন ইহুদী নারী যার স্বামী, পিতা, এবং ভাইকে মহম্মদ খায়বারের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। আক্রমণের সময়ে সাহম নামে মহম্মদের এক অনুচর তাকে যুদ্ধবন্দী করে। মহম্মদ সাফিয়াকে তার কাছ থেকে নিয়ে নেন,

ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাতজন যুদ্ধবন্দী নারীকে দেন এবং সেইদিনই সাফিয়াকে বিয়ে করেন যেদিন তিনি তার স্বামী, পিতা এবং ভাইকে হত্যা করেন। আর একবার, একজন নারীকে তার বিয়ের বিষয়ে, প্রকৃত অর্থে তার ভাগ্যের বিষয়ে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন সুযোগ দেওয়া হল না। দিনের পর দিন সাফিয়া নিজেকে দেখল মহম্মদের বাহুবেষ্টনীতে, এবং মহম্মদ তাকে নিয়ে কি করবে তা গ্রহণ বা অস্বীকার করার কোন অধিকারই তার নেই।

মুসলিম জগতে নারীর অবস্থার ক্রমাবণতি বিষয়ে আলোচনার সময় ইসলামি আইনের রক্ষকরা প্রতিবাদ করে বলেন, ইসলাম নারীকে দিয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান কিন্তু ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে কিছু মানুষ কোরআন এবং নবীর নীতিকে ভুল বুঝেছে। তবুও আমার প্রশ্ন: সেই অনুসারীরা কি নবীর জীবৎকালেও নবীর আচরণকে ভুল বুঝেছিল? কোথায় কোরানের আয়াত বা নবীর নীতি যা এই কুৎসিৎ চেহারাকে ঢাকতে পারে? তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা কেমন করে একজন পঞ্চাশ বছরের মানুষের সাথে ছয় বছরের মেয়ের বিয়েকে (তিন বছর পর বাসর) ধর্ষণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবব? উত্তর পাওয়া যাবে না। আমরা কেমন করে একজন মানুষের পুত্রবধূকে বিয়ে করা গ্রহণযোগ্য কাজ বলে দেখব? কারও পক্ষেই অন্যরকম ভাবার কোন উপায় নেই। একজন মানুষ একটা গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে একজন নারীকে যুদ্ধবন্দী করল তার স্বামী, পিতা, এবং ভাইকে হত্যা করে; তারপর তাকে বিয়ে করল। একে অপরাধ ছাড়া আর কি ভাবে দেখা যেতে পারে? আমরা পারি না কারণ কোন আয়াত বা নীতি নেই যার দ্বারা অন্যরকম ভাবা যায়।

নারীর প্রতি ইসলামের মনোভাব বোঝার জন্য মরু পরিবেশকে আরও গভীরভাবে অনুভব করা প্রয়োজন যা ইসলামকে জন্ম দিয়েছে। কোন গোষ্ঠী ঘুমাতে যায় এবং জেগে ওঠে অন্য কোন আরও বেশী অস্ত্রে সজ্জিত বড় গোষ্ঠীর তরবারির ঝনঝন শব্দে। আক্রমণকারী গোষ্ঠী ঝড়ের গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য গোষ্ঠীর জমি, সম্পদ এবং অন্যান্য জিনিসের লোভে। তারা কিছু মানুষকে হত্যা করে, অন্যরা পালায়।

যুদ্ধের উত্তাপ কমে গেলে বিজয়ী দল পরাজিত দলের নারীদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় যেমনভাবে তারা ভাগ করে পালিত পশুদের, সম্পদের এবং অন্যান্য জিনিসের। আরব ইতিহাসে কোন গোষ্ঠীই এই আক্রমণ এবং তার ফলাফল থেকে রেহাই পায় না।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃত্যুর সাথে আরব মরুর বাসিন্দা মানুষের আরও একটা ভয় আছে, যে ভয়ের উৎস নারীরা। কোন নারী অন্য কারো হস্তগত হলে সে যে অপমানের সম্মুখীন হবে তার ভয়। সেই সময় এবং স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একজন লোকের কাছে নারী হল তার পরাজয় এবং লজ্জার এক চিরন্তন চিহ্ন। কারণ তার গোষ্ঠী যখন আক্রান্ত হবে তখন সে নারীকে রক্ষা করতে সক্ষম নাও হতে পারে। সে তীব্র অপমানের সম্মুখীন হবে যদি সেই নারী অন্যের হস্তগত হয়। নারীর প্রতি তার মনোভাব জন্মায় তার নিজের অক্ষমতার বোধ থেকে কারণ তাকে রক্ষা করতে সম্ভাব্য অক্ষমতা। তার ঘৃণা তার অপমানের জন্য দায়ী প্রকৃত অপরাধীর প্রতি হয় না, কারণ সে নিজেই কোনদিন আক্রমণকারীর জায়গায় থাকবে এবং অন্য কাউকে পরাজিত করে তার নারীকে হস্তগত করবে। বরং তার ঘৃণা সৃষ্টি হয় কোন নারীর প্রতি সে হতে পারে তার মা, বোন, অথবা স্ত্রী। সেই সময় থেকেই মুসলমান পুরুষের সম্মানের একমাত্র মানদণ্ড হল: সে কত সফলভাবে কোন নারীর হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত জায়গা রক্ষা করতে পারে। সে নারীকে দায়ী করে তার লজ্জা, অসম্মানের কারণ হিসেবে এবং নারীর প্রতি তার আচরণ হয়ে দাঁড়ায় বাঁকাপথে প্রতিশোধের মত।

ইসলামের জন্ম এমন পরিবেশে যা নারীকে বন্দী করা ও ধর্ষণ করাকে অনুমোদন করে, যে লোক অপরাধ করেছে তাকে দায়ী না করে—নারীদের দায়ী করে। প্রচলিত ধারার কোন কিছুই ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি। বরং একে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ধর্মীয় বিধির অন্তর্ভুক্ত করেছে। পুরুষের প্রয়োজন নারীর উপর প্রতিশোধ নেওয়া কারণ সে মনে করে নারীই তার অসম্মানের মূল এবং তার দৈত্য সেই প্রয়োজন মিটাতে অনুমতি দেয়। নারী বিষয়ে অজস্র আয়াত নবীর কাছে এসেছে। এই অসংখ্য পাথরখণ্ড পাহাড়চূড়া থেকে নেমে এসেছে মেয়েদের মাথা

থেঁতলে দেওয়ার জন্য, তাদের মানবীয় আকৃতি বিকৃত করে দেওয়ার জন্য। যদি কেউ আরবি সাহিত্য পড়ে, যেখানে বর্ণনা করা আছে নবী মহম্মদের ডাকাতির কাহিনী এবং কেমন করে তিনি লুঠের মাল ও বন্দীদের ভাগ করেছিলেন, বুঝতে পারবে সেই ফাঁদের বৈশিষ্ট্য, যে ফাঁদে সকল মুসলমান পুরুষ এবং তাদের স্ত্রীরা পড়ে। মহম্মদ উদাহরণ রেখে গেছেন যা মুসলমান পুরুষরা অনুকরণ করতে বাধ্য আর মুসলমান নারীরা উদাহরণ হিসাবে নেবে তার স্ত্রীদের।

চৌদ্দশ বছরে মুসলমান পুরুষ তাদের নবীর শাসন থেকে মুক্ত হতে পারেনি আর নারীরাও তার স্ত্রীদের থেকে ভাল কিছু করে উঠতে পারেনি। মহম্মদ তার নিজের জন্য এবং অনুসারীদের জন্য আক্রমণের মাধ্যমে বন্দী নারীদের ধর্ষণ করাকে আইনসিদ্ধ করেছিলেন একটি আয়াতের দ্বারা যেটি পাহাড়চূড়া থেকে গড়িয়ে মহম্মদের কোলে এসে নেমেছিল। কোরানের সেই আয়াতে আছে: "যে নারীকে তোমার ভাল লাগে তাকে বিয়ে কর, দুই তিন বা চারজনকে। কিন্তু যদি ভয় কর যে তুমি তাদের মধ্যে সমতা রাখতে পারবে না, তবে একজনকে বিয়ে কর"(৪:৩)। যে নারীকে তোমার ভাল লাগে? পুরুষরা বিয়েকে নিতান্তই তার কামনা নিবৃত্তির পথ ছাড়া অন্য কিছু ভাবেনি, সেই বিয়েতে নারীর অনুভূতির কথা না ভেবেই। এবং পুরুষরা কখনই তাদের কামকে নিয়ন্ত্রণ করেনি, যে নারীকে অধিকার করতে পেরেছে তাকে দিয়েই কাম প্রশমিত করেছে, ঠিক যেন নারী একটা অস্থাবর বস্তু।

একজন পুরুষের সম্পত্তির পরিমাণই নির্দিষ্ট করে দেয় সে কতজন নারীকে সে বিয়ে করতে পারবে। কোরআন নারীকে দুই ভাগে ভাগ করেছে: স্বাধীন নারী এবং দাসী। দাসীর স্বাধীনতার কোন অধিকার নেই। ইসলাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছে একজন পুরুষ চারজন পর্যন্ত স্বাধীন নারীকে বিয়ে করতে পারে, যদি সে সকলের সাথে সমান আচরণ করতে পারে, না পারলে একজন। একজন দাসী স্বাধীন নারীর অধিকার ভোগ করতে পারে না। সুতরাং একজন পুরুষ যত খুশী দাসী বিয়ে করতে পারে যতজনকে সে কিনতে পারে। 'সমান' বলতে ইসলাম কি বোঝে? এ ক্ষেত্রে ইসলামিয় দৃষ্টিতে শব্দটির অর্থ, পুরুষটি তার শুক্র এবং সম্পত্তি চার স্ত্রীর মধ্যে সমান

ভাগ করে দেবে। যদি সে তা না পারে তবে মাত্র একটি বিয়ে করবে। দৈত্য কত সমদর্শী যা সে মানুষকে এবং তাদের অতি-সৌভাগ্যবতী-স্ত্রীদের দেয়!

মুসলিম পুরুষ ও নারী এই জটিল "সমতা"-র দৃষ্টি থেকে কি পেয়েছে যেখানে পুরুষকে দেওয়া হয়েছে নিয়ন্ত্রণহীণ কামের অধিকার এবং নারীকে করা হয়েছে পণ্য যা পুরুষ ইচ্ছানুযায়ী কিনতে পারে? এই অভিধানে কোথায় "পরিবার" বা "সন্তানের" ধারণা, যে অভিধান পড়া এত কঠিন? শব্দদুটির কোন সংজ্ঞা কি ইসলামি শব্দকোষে আছে? আর একজন পুরুষের কি দায়িত্ব আছে যার কামপ্রবৃত্তি সন্তানের একটা গোটা বাহিনী উৎপাদন করে? যেমন ওসামা বিন লাদেন, যার ভাই বোনের সংখ্যা অসংখ্য এবং একজন পিতা যার স্ত্রীর সংখ্যা গোনার অতীত?

যদি একজন মুসলমান পুরুষ তার চার স্ত্রীকে—এবং অন্য যত নারীকে সে অধিকার করে—তাদের মধ্যে তার শুক্র এবং সম্পত্তি সমানুপাতে ভাগ করতেও পারে, কিভাবে তার সময় এবং উদ্যম সন্তানদের মধ্যে ভাগ করবে যারা পৃথিবীতে এসেছে তারই অসংযত কামের ফসল হিসেবে? পাহাড়চূড়া থেকে গড়িয়ে আসা সেই পাথরখণ্ডের কারণে আমরা মুসলমান নারী পুরুষ কত মূল্য দিয়েছি? "বিবাহ"-এর প্রকৃত ধারণা ত্যাগ করে এ আমাদেরকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং একটা গোটা জাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে, পরিবারকে ধ্বংসস্তূপ বানিয়েছে।

একজন মুসলমান পুরুষ তার ক্ষমতার বিচার করে সে কত টাকা এবং বীর্য বার করতে পারে সেই নিরিখে। একজন মুসলমান নারী নিজেকে দেখে পুরুষের বীর্যে তা' দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে এবং একটা আসবাব যেটা সেই পুরুষ টাকা দিয়ে কিনেছে। পুরুষটি নিজেই ঠিক করে কখন বস্তুটিকে অধিকার করতে হবে এবং কখন বীর্য ঢালতে হবে; এ এমন একটা সম্পর্ক যেখানে মানবিক অনুভূতির কোন মূল্যই নেই।

মানবিক অনুভূতির মূল্যহীনতার কারণে মুসলমান পরিবারে ভালবাসার সঙ্কটে শিশুরাই প্রথম শিকার হয়।

যখন আমার বাবা আমার মাকে বিয়ে করেন তখনই তিনি পাঁচ সন্তানের পিতা; চার মেয়ে এবং এক ছেলে। তাঁর অজুহাত ছিল তাঁর স্ত্রী দুরারোগ্য যক্ষ্মায় ভুগছেন। আমার ঠাকুর্দা আমার মায়ের অনুভূতির কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে এই বিয়েতে রাজী হন, তখন আমার মায়ের বয়স মাত্র ষোল। আমার বাবার বয়স ছিল চল্লিশ। ঠাকুর্দার যুক্তি ছিল বাবা সুপরিচিত পরিবারের আর্থিকভাবে সম্পন্ন মানুষ। সে কারণে আমার মা বা দিদিমার মতের কোন গুরুত্বই দেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন মহিলাদের মত জানার কোন প্রয়োজনই নেই যেমন কোন আসবাবের কাছে কেউ কোন প্রশ্ন করে না। শুনেছি বাবার প্রথম স্ত্রী অবহেলিত এবং বিস্মৃতভাবে মারা যান শহর থেকে দূরে এক হাসপাতালে যেখানে যক্ষ্মারোগীদের আলাদা ভাবে রাখা হত। আমার মা, বাবা এবং তাঁর পাঁচ সন্তানের সাথে বাস করতে এসেছিলেন। তাঁর বড়মেয়ে আমার মায়ের থেকে এক বছরের বড় ছিল। এই আবর্তে পড়ে মা দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন এবং বুঝতে পারতেন না তিনি কি একজন স্ত্রী, না কি পাঁচ সন্তানের মা অথবা বাবার সন্তানদের একজন, যাকে তিনি সমকক্ষ সঙ্গী মনে করেন।

দশ বছর সময়কালে তিনি আট সন্তানের জন্ম দেন। যদিও আমার বাবা ছিলেন শান্তিপ্রিয় শান্ত মানুষ এবং মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন, আমি মাকে একদিনের জন্যও খুশী দেখিনি। তিনি সংসারের কাজে খুব একটা দক্ষ ছিলেন না এবং চার সৎমেয়ের সাথে তাঁর দিনরাত্রি ঝগড়া হত।

তুমুল হট্টগোল এবং মানুষে ঠাসা পরিবারে আমি জন্মাই এবং আমার শৈশব সেখানেই কাটে। আমার মা এবং চার সৎবোনের সম্পর্ক আমার অতি অশান্তির কারণ ছিল, দুই বিপরীত পক্ষের মধ্যে পড়ে আমি যেন ছিঁড়ে যেতাম। আমার বোনেরা বিয়ে হয়ে গিয়ে মায়ের দুর্ব্যবহার থেকে পালিয়ে বাঁচল। আমার সবথেকে ছোট সৎবোনের বিয়ের এক বছর পরে যখন মনে হচ্ছিল আমাদের জীবন শান্তির জীবন হতে চলেছে, হঠাৎই আমার বাবা গাড়ী দুর্ঘটনায় মারা যান আর আমার মা যেন সবকিছু হারিয়ে ফেললেন।

আমি আমার বাবার স্ত্রীকে কখনও দেখিনি—এমনকি আমার মাও দেখেননি—কিন্ত আমি জানিনা তাঁর স্মৃতি কেন আমার হৃদয়কে মুচড়ে দেয়। আমি জানিনা কোথায় তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে। আমার মনে পড়ে না কখনও তাঁর কোন সন্তান তাঁকে দেখতে গিয়েছে। আমার বাবা এবং তাঁর কোন সন্তান কখনও তাঁর কথা কিছু বলত না। কিন্তু আমার কাকার স্ত্রীকে মায়ের কাছে তাঁর কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন কিভাবে তাঁর শেষ দু'বছর কেটেছিল সন্তানদের ছেড়ে একা রাজধানীর হাসপাতালে বাড়ী থেকে অনেক দূরে।

ছোটবেলায় আমি নবী মহম্মদের একটা বিয়ের গল্প পড়েছিলাম। স্ত্রীর সাথে বিছানায় যাওয়ার মূহুর্তে তিনি স্ত্রীর তলপেটে একটি সাদা দাগ দেখতে পান এবং তৎক্ষণাৎ তাকে পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনা নিয়েই গল্প। আমার সেই বয়সে নবীর বিয়ের এই গল্প মিলে গিয়েছিল বাবার অসুস্থ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার ঘটনার সাথে। যিনি একা অবস্থায় মারা যান দু'বছর পর যে সময়ে তিনি কখনও তাঁর সন্তানদের দেখেননি। আমি আমার বাবার প্রতি ঘৃণা বোধ করেছিলাম, নবীর প্রতি নয়, কারণ—ভেবে দেখুন—দৈত্য আমাকেও বন্দী করে ফেলেছে।

মহম্মদের মৃত্যুর পর পাথরখণ্ড শতাব্দীর পর শতাব্দী নেমেই চলেছে। এখন সৌদি শেখেরা আমাদের উপর প্রতিদিন শত শত ফতোয়া ছুঁড়ে মারছে। কোরানের অসংখ্য আয়াতে মেয়েদের কথা আছে, কিন্তু আয়াত এবং যে কাহিনীগুলির কথা বলেছি তার ফলে তৈরী হওয়া ভয়ঙ্কর সমস্যা কমানোর জন্য একটি আয়াতও নেই। একটি আয়াতে আছে: "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র: তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী শস্যক্ষেত্রে গমন কর" (২:২২৩)। আল-জালালাইনের* কোরআন ভাষ্য অনুযায়ী, এর অর্থ নারী তোমাদের জন্য সন্তান বপনের ক্ষেত্র, তোমরা তোমাদের যেমন ইচ্ছা সেটা কর। এই ব্যাখ্যাতেই আছে পুরুষ তার বীর্য বপন করতে পারে যেকোন অবস্থাতেই এবং নারীকে সেই "বপন কার্যে" সহযোগীতা করতে হবে। সুতরাং একজন নারী জমির মত—মাটি—পুরুষ হল কৃষক, যে সেই জমি চাষ করে এবং বীজ বপন করে। মাটি কখনও আপত্তি জানাতে পারবে না যখন কৃষক চাষ

করবে, সে বীজ বপনের সময় এবং স্থানও ঠিক করতে পারবে না। পুরো ঘটনাটা ঘটে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী। মাটি কি প্রতিবাদ করতে পারে? মাটি কি স্থির করতে পারে সে কিভাবে কর্ষিত হবে বা কিভাবে বীজ বপন করা হবে? চৌদ্দ শতাব্দী ধরে মুসলিম নারীরা ইসলামের মাটি এবং মুসলিম পুরুষরা তদের পদদলিত করেছে এবং কৃষকের ভূমিকায় "বীজ বপন" করেছে।

নারী কখনো তার সীমার বাইরে পা রাখতে পারবে না, পুরুষ তার বিষয়ে কোন অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করবে না। ভালবাসার বন্ধনের পরিবর্তে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই অস্বাভাবিক কৃত্রিম সম্পর্ক জন্ম দিয়েছে অসংখ্য প্রজন্মের। নরনারীর মধ্যে সুস্থ ভালবাসার সম্পর্ক কোনভাবেই কৃষক এবং জমির সম্পর্কের সাথে মেলে না। যে সম্পর্ক পারস্পরিক অনুভূতির প্রতি সমান সম্মানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সে সতেজ মন, উদ্যম এবং আবেগ সমৃদ্ধ প্রজন্ম সৃষ্টি করতে পারে না। একজন নারী কখনই পুরুষের লাঙল দ্বারা কর্ষিত হওয়ার একখণ্ড জমি নয়। নারী একজন সম্পূর্ণ মানুষ যার মন, আত্মা এবং অনুভূতি আছে আর পুরুষ কখনই কৃষক নয় যে নারীকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে।

এ কেমন নবী যে তার সীমিত বুদ্ধি নিয়ে নির্দেশ দেয় পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক কৃষক ও জমির সম্পর্কের অনুরূপ? আমার মতে, সেই নবী একজন ব্যর্থ কবি যার আয়াত ছাড়াই আমরা ভালভাবে বাঁচতে পারি। সেই নবী গ্রামের তুচ্ছ দৈত্য যে অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে নারী ও পুরুষকে অসম অবস্থানে বসায়। কেন? আরবের মরুভূমির মানুষ তাদের দৈত্যের সৃষ্টি করেছিল ভয় থেকে বাঁচার জন্য। এবং সে কারণেই দৈত্য সমতাকে পরিত্যাগ করে নারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, কারণ নারী হল ব্যর্থতা এবং অসম্মানের অন্যতম উৎস।

আমি যখন পড়তে শিখি, তখন কোরআন প্রথম বই, যা আমি খুলেছিলাম। আমি কোরআনকে এখন যেভাবে বুঝি তার থেকে সদয় এবং সহনশীল ভাবে কেউ কখনো ব্যাখ্যা করেছে বলে মনে পড়ে না। আজ বেশীর ভাগ মুসলমান আমাকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে। তাদের অভিযোগ, আমি কোরআন থেকে সেই আয়াতগুলি

তুলে আনি যেগুলি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, যেমন একটা বাক্স থেকে সবথেকে ভাল চেরীফলগুলি আমি বেছে নেব। স্বাভাবিক ভাবেই আমি এই উপমাটি পছন্দ করি এবং এতে আমার বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতি হয় এমন কিছু দেখি না। ঈশ্বর যে বাক্স পাঠাবেন তাতে একটাও খারাপ চেরী থাকা সম্ভব নয়। যদি ঈশ্বর থেকে থাকেন, তাহলে একেবারে প্রাথমিক নীতিগত শর্তই হল ঈশ্বর হবেন চরম শ্রেষ্ঠ। আমি মনে করি, পরম পূর্ণতার সামান্য ত্রুটিও ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ধ্বংস করে। একজন ঈশ্বর যিনি নারীকে কুৎসিৎতম উপায়ে জোর করে দমন করেন, তিনি পরম শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্য নন। ঈশ্বর প্রেরিত বাক্স থেকে যদি আমি পচা চেরীফল পাই তাহলে সেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ করার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে।

মুসলিম দেশগুলিতে নারীর অবস্থান যেন এক মানবীয় মহাদুর্ঘটনা, যা বিশ্ব বহু শতাব্দী অবহেলা করেছে; এখন সেই অবহেলার চরম মূল্য দিচ্ছে। একজন অবদমিত এবং দাসীতে পরিণত কোন নারী কখনও আবেগ এবং মানসিতায় সুসমঞ্জস মানুষের জন্ম দিতে পারে না। অদৃশ্য মুসলিম নারী সন্ত্রাসের ডিম পেড়েছে এবং এখনও পাড়ছে, তাদের প্রয়োজনীয় উত্তাপ দিয়ে সন্ত্রাসবাদীর জন্ম দিচ্ছে। যে নারী টেলিভিসন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বকে বলে: “আমার তিন ছেলে শহীদ হয়েছে, আশা করি চতুর্থজনও হবে”, সে সম্পূর্ণ মাতৃত্বহীন একজন নারী। আরও যখন সে বলে: “আমার ছেলেরা এখন স্বর্গের কুমারীদের সাথে বিয়ের উৎসব পালন করছে”, আমরা ধরেই নিতে পারি সে তার বুদ্ধি এবং বিবেক সবই হারিয়েছে। কে এই মহিলার মাতৃত্ব, মন এবং বিবেক থেকে একে বঞ্চিত করেছে? মানুষের প্রথম জীবনে যারা তাকে শিক্ষা দেয় তাদের পাতা ফাঁদে পুরুষ, নারী উভয়েই পড়ে। মানুষকে যা হতে বলা হয় সে সেটাই হয়। একজন মানুষ তার সত্ত্বার একটা পরিচিতি বহন করে, যে সত্ত্বার চরিত্র নির্ভর করে একটা বিশ্বাসের উপর। এই বিশ্বাস গঠিত হয় সে যেখানে জন্মেছে সেখানকার প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে। নিজের অগোচরেই সে তার সত্ত্বা এবং বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্টের যথার্থতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

কারো নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস তার পরবর্তী জীবনে পরিবর্তন করা অসম্ভব না হলেও অতি কঠিন। বিশেষত সে যদি একই পরিবেশে জীবন যাপন করে যে পরিবেশ তার বিশ্বাসকে গঠন করেছিল। আমি একটা কৌতুহলোদ্দীপক পরীক্ষার কথা পড়েছিলাম। পরীক্ষাটা করেছিলেন একজন মনোবিজ্ঞানী। তিনি একটি মেয়ে শিম্পাঞ্জীকে তার জন্মের পর থেকেই পালন করেন। সে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে পরিবারের একজনের মতই বড় হয়েছিল। পরিবারের সবাই যা যা করত শিম্পাঞ্জীটিও তাই করত। প্রত্যেকেই তার সাথে এমন ব্যবহার করত যেন সে তাদেরই একজন। যখন সে বড় হল তখন একদিন মনোবিজ্ঞানী তাকে বেশ কিছু ছবি দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করতে বললেন। প্রথম ভাগে থাকবে যেগুলি মানুষ নয় তার ছবি—যেমন বই, টুপি, ফুল, অথবা পাখি—দ্বিতীয় ভাগে শুধু মানুষের ছবি থাকবে। ছবিগুলোর মধ্যে শিম্পাঞ্জীর নিজেরও একটা ছবি ছিল। শিম্পাঞ্জীটি ছবিগুলি ভাগ করতে শুরু করল এবং তার নিজের ছবিটি রাখল মানুষের ছবির ভাগে। কারণ সে নিজেকে মানুষ মনে করেছিল। কেন? কারণ তার জন্ম থেকেই তার সাথে মানুষের মত ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলিম দেশে নারীরা ঐ শিম্পাঞ্জীর মতই ফাঁদে পড়ে থাকে এবং সমাজ তাদেরকে যে চোখে দেখে তার বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। সমাজ তাদেরকে ভাবে পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট এবং কম বুদ্ধির অধিকারী। তারা নিজেদের নিকৃষ্ট বলেই মেনে নিয়েছে এমনকি তার স্বপক্ষে কথাও বলে।

ইসলামি শিক্ষা মেয়েদের এমনভাবে ছেঁটে দিয়েছে যে তারা তাদের বুদ্ধি এবং বিবেক হারিয়ে ফেলেছে। এই শিক্ষার প্রভাব পুরুষ এবং নারী উভয়ের উপরেই সমান। এখন আর শুধু পুরুষরাই মেয়েদের এই অবস্থার জন্য দায়ী নয়, মেয়েরাও তাদের অবস্থার স্বপক্ষে সওয়াল করে। নারীরা নিজেদের পুরুষের জন্তু বলে মনে করে। তারা এই পরিস্থিতি মেনে নিয়েছে এবং এখন আর সেখান থেকে বেরোতে পারে না।

কোরানের আয়াত এবং নবীর রীতি নীতি বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তার সাথে যুক্ত হয়েছে ফতোয়া, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি। এগুলিই যথেষ্ট নারীর

প্রতিকৃতিকে বিকৃত করর জন্য এবং তাদের বোঝানোর জন্য যে এই বিকৃত প্রতিকৃতিই পবিত্র। ইসলাম নারীকে ভাবে অমঙ্গল, এবং যে শিক্ষা তারা পায় তার ফলে তারা বিশ্বাস করে যে তারা সত্যিই অমঙ্গল; প্রকৃতপক্ষে তারা ভাবে এটাই স্বর্গীয় নির্দেশ। সমস্যাটি এখন আর শুধুমাত্র ইসলামি শিক্ষার নয়। মুসলিম নারীর এই ভাবনা তাদের মনে স্থায়ীভাবে গেঁথে গেছে, তারা এই শিক্ষার পক্ষে বলেও। কোন পরিস্থিতিই বদলানো সম্ভব নয় যতক্ষণ না যারা সেই পরিস্থিতিতে বাস করে তারা তার দোষগুলি বুঝতে পারে এবং তাকে বদলানোর চেষ্টা করে।

একটা কৃমিকীট মাটিতে বাস করে এবং প্রায়শই পদপিষ্ট হয়। সে যেখানে বাস করে তার বাস্তবতাসম্বন্ধে অবহিত নয়, সেকারণে সে প্রতিবাদ করে না। মুসলিম দেশে নারীরা কৃমিকীটের মত, পুরুষের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়। তারা বিশ্বাস করে যে এইরকমভাবে জীবন কাটানোর জন্যই তাদের সৃষ্টি, সেকারণেই তারা একে ত্যাগ করবে এটা ভাবা যায় না। নবীর বহু উক্তিতে নারীদেরকে বুদ্ধিবৃত্তি এবং নৈতিক দিক থেকে নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। একটি হাদিসে মহম্মদ তার অনুসারীদের কাছে বলছেন: "হে নারীরা, নরকবাসীদের অধিকাংশই তোমরা, তোমরা কিছু পেলে কৃতজ্ঞ হও না, কষ্টে অধৈর্য হও, যখন দূরে থাকি তখন অভিযোগ কর"। এক মূহুর্ত্ত কল্পনা করুন বারবার একথা শুনতে কেমন লাগে, ড্রাম পেটানোর মত করে আপনার মস্তিস্কে এটা ঢোকানো হবে যতক্ষণ না সেটা আপনার অস্তিত্বে মিশে যায়। ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী নারীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অথবা ধৈর্য ধরতে অক্ষম এবং অভিযোগ করতে অভ্যস্ত। মগজধোলাই হওয়া এই মহিলারা কেমন মানুষ যারা এমন অভিযোগ মানার স্তরে নামতে পারে?

ইসলামে নারীরা কেবল তাদের দুর্বল করা বিশ্বাসের দাসই নয়, তারা পুরুষের হুকুমের চাকর এবং দাসীও বটে। অন্য একটা হাদিসে মহম্মদ বলেছেন: "স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন নারী কাউকে খাওয়াতে পারবে না, যদি না খাবারটি প্রায় পচে গিয়ে থাকে। যদি সে অনুমতি নিয়ে খাওয়ায় তাহলে তার পুরস্কার স্বামীর পুরস্কারের সমান হবে; আর যদি অনুমতি না নিয়ে খাওয়ায় তাহলে স্বামী পুরস্কার

পাবে এবং স্ত্রী পাপের শাস্তি ভোগ করবে"। মগজধোলাই হওয়া এই মহিলারা কেমন মানুষ যাদের নিজের বাড়ীতে কাউকে এক টুকরো রুটি খাওয়ানোর অধিকার নেই এবং কেবলমাত্র স্বামীর অনুমতি নিয়ে যদি কোন দুঃস্থ মানুষকে খাওয়ায় তবেই সে ঈশ্বরের পুরস্কার পাবে? এই শিক্ষা শুধু নারীর দাসত্বের বন্ধনকেই শক্ত করেনি, পুরুষের ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

মুসলিম পুরুষরা বিনা কারণে দাম্ভিক। তার দৈত্য তাকে সহকারী হিসেবে নিয়েছে এবং তাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছে। এই ক্ষমতার কোন সীমা নেই এবং নারীর বুদ্ধিমত্তা ও আবেগের প্রতি কোন সম্মানবোধও নেই। এমনকি একান্ত গোপন এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে, যেমন যৌনক্রিয়াতেও, ইসলাম নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য দেয় না। অন্য একটা হাদিসে মহম্মদ বলেছেন: "যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে এবং স্ত্রী প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ফেরেস্তারা সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দেয়"। এ কোন ঈশ্বর যে তার ফেরেস্তাদের আদেশ দেয়, যে নারী স্বামীর বিছানায় যেতে অসম্মত হয়, তাকে অভিশাপ দিতে? সে কি একটা দৈত্য নয়? যখন স্বামীকে মান্য করা এবং ঈশ্বরকে মান্য করার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন স্ত্রীর প্রথম মান্যতা স্বামীর প্রতি। এর অর্থ, স্বামীর অসম্মতিতে স্ত্রী রোজা রাখতে বা নামাজ পড়তে পারবে না। হাদিসে মহম্মদ বলছেন: "একজন নারী তার স্বামীর অনুমোদন ব্যতীত রোজা রাখতে বা নামাজ পড়তে পারবে না"।

মুসলিম নারী পুরুষের ক্রীতদাস হয়ে জীবন যাপন করে এবং সেটাই চলতে থাকবে যতদিন না তারা তাদের ভুল বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসবে। আপনি কল্পনা করতে পারেন, একজন নারী দাসত্বের কোন পর্যায়ে পৌঁছায় যখন সে এই হাদিসটি বিশ্বাস করে: "একজন পুরুষের অধিকার আছে ভাবার যে, যদি তার নাক থেকে রক্ত, শ্লেষ্মা বা পূঁজ বেরিয়ে আসে তাহলে স্ত্রী জিভ দিয়ে তার নাক পরিস্কার করে দেবে"। আপনি কল্পনা করতে পারেন, পুরুষের কতটা দম্ভ হলে সে বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাকে অধিকার দিয়েছেন যে স্ত্রী জিভ দিয়ে তার নাকের ময়লা পরিস্কার করে দেবে?

২০০৫ সালে যখন শেষবার আমি সিরিয়ায় যাই, আমার ছোটবেলার এক বন্ধু দামাস্কাসের শহরতলীতে তার বাড়ী আমাকে নিমন্ত্রণ করে। খাওয়ার টেবিলে আমার সাথে ছিল আমার বন্ধুর পরিবার এবং তার এক বন্ধু হালিমা। আমার বন্ধুর বন্ধু একজন চল্লিশোর্ধ এক মহিলা। তার জীবনের গল্প যেন তার মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠছিল, সে মুখ দুঃখে ভরা। "যখন আমি শুনলাম রীমার বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ," সে বলল, "আমি ওকে বললাম ও যেন যে কোনও ভাবে তোমার সাথে দেখা করিয়ে দেয়। আমি তোমার বই পড়েছি, আমি তোমাকে ভালভাবে জানি এবং এটাও জানি তুমি কি করতে পার আর কি পার না। আমি তোমার কাছ থেকে কিছু চাই না। আমি তোমাকে বলব তুমি শুধুমাত্র আমার কথা শোন কারণ এখানে এমন কেউ নেই যে বিশ্বাস করে আমার কিছু বলার মত কথা আছে"।

সে তার গল্প আমাকে শোনাল। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন গল্প ওখানকার সমাজের প্রতিটি স্তরে মিশে আছে। অন্য সংস্কৃতির মধ্যেও এমন পুরুষের দ্বারা নারীকে ব্যবহারের কথা শোনা যায়; কিন্তু এখানে কোরানের ছোঁয়া লেগে আছে। এটা এমন গল্প যা শুনতে শুনতে মানুষ বড় হয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আর এ নিয়ে ভাবার কোন কারণ দেখে না....

হালিমার তিন সন্তান। তার ছোটবেলা এবং কৈশোর কেটেছে বাবার কাছে, যিনি একদিনের জন্যও তাকে নারী বা মানুষ হিসেবে কোন সম্মান দেননি। সে তার কিশোর বয়সেই ওমর নামে একজন লোকের সাথে বিয়ে করে পালিয়ে যায় খারাপ অবস্থা থেকে মুক্তির আশায়, কিন্তু দেখা গেল নতুন আশ্রয় আরো খারাপ। বিয়ের পরে, ওমর প্রতিরাত্রেই মদ খেয়ে ফিরত এবং তাকে মারধর করত। সে এই প্রত্যহিক মারধরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, ঠিক ওমর যেমন মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল।

কিন্তু হালিমা সাধারণ মেয়ে নয়। সে একজন শিক্ষক, আত্মবিশ্বাসী এবং সেইসঙ্গে সাবধান। তার যন্ত্রণা চূড়ান্ত হয়ে উঠল যখন তার মাতাল স্বামী তার বেতনের উপর নির্ভর করে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে চাপ দিতে শুরু করল। সে তার জমা ধার পরিশোধ করবে কারণ পাওনাদাররা প্রচণ্ড অধৈর্য হয়ে উঠেছে। হালিমা

চেষ্টা করেছিল ওমর সত্যি বলছে কি না তা জানার, পাওনাদারদের নাম জানতে, যাতে সে নিজেই ধার শোধ করতে পারে। তাহলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে হবে না; কিন্তু সে পারে নি।

ওমরের মতে নারীরা বিনা প্রতিবাদে স্বামীর আদেশ পালন করতে বাধ্য এবং স্বামীর কোন ব্যাপারে তার নাক গলানোর কোন অধিকার নেই। হালিমাকে বেল্ট দিয়ে মারতে মারতে সে মাঝে মাঝেই বলত: "নরকের মাগী, ভুলে গিয়েছিস নবীর কথা— ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করুন এবং শান্তি দিন—: 'আমাকে যদি কাউকে কারো সামনে নত হতে বলতে হয় [ঈশ্বর ব্যতীত] তাহলে আমি কোন নারীকে তার স্বামীর কাছে নত হতে বলব কারণ স্ত্রীর উপরে স্বামীর সেই অধিকার আছে'। আমি তোমাকে আমার সামনে নতজানু হতে বলিনি, শুধু বলেছি তোমার বেতনের জামিনে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে!" হালিমা ঋণ নিয়েছিল এবং ওমর টাকাটা পকেটস্থ করে বাড়ী থেকে বেরোনোর সময় হালিমাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল সে নবী এবং স্বামীর আদেশ পালন করে ঈশ্বরের সোয়াব অর্জন করেছে।

হালিমার টাকাটা নেওয়ার পর ওমর প্রায়ই অকারণে বাড়ী ফিরত না, হালিমার সন্দেহ হল। একদিন সকালে প্রতিবেশী সেলিম এসে বলল, "কেমন আছ, হালিমা? শোন, তোমাকে একটা বলতে চাই। কাল সকালে ওমর যখন বাড়ি থেকে বেরোবে, দেখো ওর কাছে যেন পাশপোর্ট না থাকে"। বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘুরে চলে গেল হালিমা কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই।

ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত হালিমাকে মেরে ওমর সেদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল আর ফেরেনি। পাঁচ মাস আগে দামাস্কাসের এক নাইটক্লাবে মরক্কোর এক নর্তকীর সাথে ওমরের পরিচয় হয়, ওমরের কথায় নর্তকীর সাথে তার ভাই-বোনের সম্পর্ক। যখন নর্তকীর চুক্তি শেষ হয়ে গেল, সে দেশে ফিরে গেলে ওমর তার সাথে যোগাযোগ রাখত "তার উপর ভাইয়ের নজর রাখতে এবং সে ভাল আছে কি না জানতে"। যেইমাত্র ওমর টাকাটা হাতে পেল, সে মরক্কোর টিকিট কাটল হালিমা এবং

তাদের সন্তানদের ছেড়ে, ঋণে ডুবিয়ে। হালিমা বেতনের টাকা থেকে ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করত, যা বাকী থাকত তাতে সন্তানদের যথেষ্ট খাবার জুটত না।

এখানেই গল্পের শেষ নয়। তার মোট বেতনই উবে যাওয়ার অবস্থা হল যখন সে আবিস্কার করল টেলিফোনের বিল ৭০,০০০ সিরিয় পাউণ্ড (গড়ে একজন সিরিয় মানুষের দশ মাসের আয়)। যার সমস্তটাই খরচ হয়েছে ওমরের মরক্কোতে ফোন করে "বোন"-এর খবর নিয়ে মন শান্ত করতে। হালিমা বিলের টাকা না মেটাতে পারত কারণ তার ফোনের কোন দরকার ছিল না। টেলিফোন কোম্পানী লাইন কেটে দিলে তার কোন ক্ষতি ছিল না। নাটক অন্য দিকে মোড় নিল যার ফলে হালিমার জীবনের অন্য এক পুরুষের লাভ হল। ফোনটি রেজিস্টারড ছিল তার বাবার নামে। মেয়েকে সাহায্য করার পরিবর্তে তিনি তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে সে বিল পরিশোধ করবে, তারপর তিনি ফোনের লাইন ফিরিয়ে দেবেন।

হালিমার জন্য একটাই ভাল দিক ছিল যখন দামাস্কাস টেলিফোন কোম্পানী দয়াপরবশ হয়ে মাসে মাসে তার বেতনের একটা অংশ নিতে রাজী হল। ফলে সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আরও কমে গেল। হালিমা দিনের ভাগে স্কুলে কাজ করত পাওনাদারদের দাবী মেটাতে। স্কুল শেষে বাড়ী থেকে বাড়ী দৌড়ে প্রাইভেট টুইশনের কাজ করত যদি তিনটে ক্ষুধার্থ মুখের খাবার জোটানো যায়। আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল যখন দেখলাম তার সুন্দর চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছে। আমি তার কাঁধে মৃদ চাপড় দিলাম, মনে মনে বললাম, "দুঃখ কোরো না, হালিমা। তুমি একটা অসম্ভব মূল্য দিয়েছ, কিন্তু তুমি তোমার ঈশ্বর এবং নবীকে সন্তুষ্ট করেছ। এটাই জগতের নিয়ম, যেখানে সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী। ধৈর্য ধর, হালিমা, স্বর্গ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে!" আমি মুখে কিছু বলিনি। কিছু বলারও ছিল না। আমার কাছে সে শুধু চেয়েছিল যেন আমি তার কথাগুলো শুনি।

হালিমা আমাকে একটা উপহার দিয়েছিল। খুলে দেখি সিরিয়ায় তৈরী দুটো জামা। তার উপহারে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম, আমার দেশের সুন্দর স্মারক এবং আমার দেখা এক নারীর বেদনার নিদর্শন; যে নারীর চোখের জলের সামনে আমি

ছিলাম অসহায় দর্শক। আমার একটা অভ্যাস, যখন আমি কোন প্রিয় মানুষের কাছ থেকে উপহার পাই, উপহারের উপরে তারিখসহ তার নাম লিখে রাখি, সেই সঙ্গে একটা বাক্য যাতে আমার মনে পড়ে কি পরি্প্রেক্ষিতে সেটা দেওয়া হয়েছিল। আমি একটি জামা ভাঁজ করে তার উপরে লিখলাম: হালিমা, সিরিয়া, ১২ এপ্রিল, ২০০৫ । কিন্ত আমি কোন বাক্য খুঁজে পেলাম না যা সংক্ষেপে বিষয়টিকে প্রকাশ করতে পারে, একমাত্র এলেনের রুজভেল্টের উক্তি ছাড়া: "তোমার সম্মতি ছাড়া কেউ তোমাকে হারাতে পারে না"।

হালিমার স্বামী তাকে তীব্র অপমান করেছে এবং ধ্বংস করে দিয়েছে, কিন্তু সে এটা করেছে তার সম্মতিতে। তার স্বামীর ঔদ্ধত্য এবং স্বেচ্ছাচারীতা যা একজন মুসলিম পুরুষ হিসেবে শিখেছে সে তো ছিলই, তার সঙ্গে আর একটা শক্তিশালী বিষয় ছিল হালিমার দাসীসুলভ মানসিকতা যা তার স্বামীর নবী তাকে আদেশ করেছে। হালিমার নতুন শিক্ষা প্রয়োজন। ওমরের নতুন শিক্ষা, যদি সে কখনও তার মরক্কোর নর্তকীকে ছেড়ে স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে, অবশ্যই হবে হালিমার পরিবর্তনের ফলে। আমরা ওমরকে তার ঔদ্ধত্য থেকে মুক্ত করতে পারব না যতক্ষণ সে এই হাদিশটি পড়বে এবং বিশ্বাস করবে: ""একজন পুরুষের অধিকার আছে ভাবার যে, যদি তার নাক থেকে রক্ত, শ্লেষ্মা বা পূঁজ বেরিয়ে আসে তাহলে স্ত্রী জিভ দিয়ে তার নাক পরিস্কার করে দেবে"। কিন্তু আমরা হালিমাকে তার শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারি তার আত্ম-প্রতিকৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে। যদি তা ঘটে এবং যদি সে তার দাস মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে পারে, যে মানসিকতা বহু শতাব্দী ধরে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে, তাহলে সে নিজে জিভ দিয়ে পরিস্কার করার পরিবর্তে ওমরকে বলতে পারবে তার নিজের ময়লা নিজে পরিস্কার করতে।

হালিমার মত মেয়েদের তার অবস্থা পরিবর্তনের কথা বোঝানো যাবে না, যদি না তারা অন্যের অবস্থার সাথে নিজের অবস্থা তুলনা করার সুযোগ পায়। সংক্ষেপে বললে এটাই ঘটে যখন কোন মুসলিম নারী পাশ্চাত্য দেশে বাস করতে আসে,

যেখানে নারীর অধিকার সুরক্ষিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নতুন পরিবেশকে দেখে সে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করে। কিন্তু যেসব মুসলিম নারীরা পাশ্চাত্যদেশে নিজেদের জীবনকে সেখানকার মত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে গড়েছেন এবং সেই সমাজে নারীর সমস্ত অধিকার ভোগ করেন; সচরাচর স্বীকার করতে রাজী নন নতুন সমাজ তাদের জন্য কি করেছে। বরং তারা গর্ব করে বলে এখন তারা যে অধিকার ভোগ করে তা ইসলামের দেওয়া অধিকারের থেকে কিছুমাত্র আলাদা নয়। কখনও কখনও তারা এতদূর দাবী করে যে পশ্চিমী দেশ নারীকে শুধু যৌন কাজের জন্য ব্যবহার করে এবং তার মনুষ্যত্বের কোন মূল্যই দেয় না। আমি মুসলমান রমণীদের সাথে কথা বলেছি যারা এখন আমেরিকায় বাস করে এবং আমেরিকার নারীদের সমান অধিকার ভোগ করে। তাদের অধিকাংশই জোরের সাথে বলে আমেরিকার জীবন কোনভাবেই তাদের দেশের জীবনের থেকে আলাদা নয়। এই অদ্ভুত মন্তব্য শুনে আমি বারবার স্তম্ভিত হয়েছি এবং মাথা নাড়তে নাড়তে ভেবেছি এই নারীরা এবং আমি বোধ হয় আলাদা গ্রহে বাস করি।

নিউ জার্সি থেকে পেনসিলভানিয়া যাওয়ার পথে ট্রেন বদল করার জন্য ট্রেন্টনে নেমেছিলাম। স্টেশনের হলঘরে অন্য যাত্রীদের সাথে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে ছিলাম। আমার ডানদিকে বাদামভর্তি একটি ট্রলি ছিল, তার পাশে মাঝারি উচ্চতার কালো চামড়ার চওড়া কাঁধওয়ালা একটি লোক দাঁড়িয়েছিল যাকে প্রথম দর্শনে আমেরিকার আদিবাসী ভেবেছিলাম। ট্রলি রেখে সে দু'এক পা এগিয়ে আরবিতে আজান দিতে শুরু করল: "আল্লাহু আকবর। আল্লাহু আকবর। নামাজের সময় হয়েছে"।

কাউকে আমার মাতৃভাষা বলতে শুনে আমি খুশী হলাম এবং তার সাথে একটু কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলাম। সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "আল-সালামু আলেইকুম!" ("আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!")

সে বিস্মিত হয়ে উত্তর দিল, "ওয়ালেইকুম আল-সালাম!" ("আপনার উপরেও শান্তি বর্ষিত হোক!")।

আমি তাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আরবিতে কথা বলেন?"

সে উত্তর দিল, "আমি আরবি পড়ি। এ আমার কোরানের ভাষা"।

"আপনি বুঝতে পারেন?"

সে এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে বলল, "হ্যাঁ...হ্যাঁ। আপনি কি ইসলামে আসতে চান?"

"কিন্তু আমি একজন মুসলমান," আমি বললাম।

তার চোখ জ্বলন্ত কয়লার মত হয়ে গেল: "আপনি মুসলমান নন, এবং ইসলামে বিশ্বাস করেন না!"

তার উত্তরে আমি চমকে উঠলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে বিচার করার আপনি কে?"

কর্কশ গলায় অভদ্রভাবে সে বলল, "আপনি কি পাগল? একজন মুসলিম নারী তার মাথা ঢেকে রাখে, বাড়ীতে থাকে আর ছেলে মেয়েদের পালন করে। অবিশ্বাসীদের দেশে সে কখনও পুরুষদের মাঝে ঘুরতে আসে না। ঈশ্বরকে ভয় করুন, বাড়ী যান আর সন্তানদের যত্ন নিন!"

আমি সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে বললাম, "হ্যাঁ, আমি পাগল, কারণ আমি একজন ধর্মীয় উন্মাদের কাছে ভাল কিছু আশা করেছিলাম। নির্বোধ! যদি তোমাদের নারীরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের ঠিকভাবে মানুষ করত, তাহলে পাকিস্তান ইসলামের সুইজারল্যাণ্ড হয়ে যেত আর তোমাদের পশ্চিমী দেশের দরজায় ভিক্ষা করতে হত না"। তারপর আমি তাকে ছেড়ে আরবিতে বলতে বলতে আসলাম, যে ভাষা সে পড়তে পারে না, বোঝেও না, শুধু তোতা পাখীর মত আওড়ায়; "আমি তোমার নির্বুদ্ধিতায় বিচলিত হই নি। আমার আমেরিকার জন্য দুঃখ হয় যে তোমার মত নির্বোধদের আমেরিকাকে দূষিত করতে দেয়"।

পাশ্চাত্য দেশে যেসব নারী পুরুষ বাস করে তাদের প্রতি আমার কোনও আশা নেই। সোজা কথায় তারা ভণ্ড। তারা একই সাথে দুই জগতের ভালোটুকু ভোগ

করতে চায়। তারা পশ্চিমী জীবনযাত্রার অবাধ স্বাধীন জীবন যাপন করে, একই সাথে দেশে ফিরে আত্মীয়দের কাছে ভান করে তারা নিষ্ঠার সাথে ইসলামের শিক্ষা পালন করে এবং পশ্চিম দেশে তা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে।

২০০৩ সালে, দেশ ছাড়ার পর প্রথমবার সিরিয়ায় ফিরে আমার সাথে এক সিরিয় মহিলার দেখা হয় যিনি আমেরিকায় বাস করেন যার সাথে আমার দেশে ফেরা একসাথে মিলে গিয়েছিল। একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাদের দেখা হয়। ভাল করে পরিচয় হওয়ার আগেই আমি শুনলাম তিনি কয়েকজন মহিলাকে বলছেন, “আমেরিকাতে কয়েকজন পণ্ডিত এবং মনোবিজ্ঞানী পবিত্র কোরআন পাঠের মাধ্যমে মানসিক সমস্যা দূর করার একটা উপায় বের করেছেন”। তার চতুর্দিক থেকে প্রশ্নের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এবং তিনি নির্দ্বিধায় বর্ণনা করতে থাকলেন আমেরিকায় জীবন কেমন, মানুষ কিভাবে আধ্যাত্মিক বোধ হারিয়ে ফেলছে, তাদের জীবন চালিত হয় লোভ এবং পার্থিব জিনিসের দ্বারা, কেমনভাবে তারা জীবনের অর্থ খোঁজে এবং ইসলামের শিক্ষায় তারা এখন তা খুঁজে পাচ্ছে। এই ধরণের মুসলমানরা শুধু আমেরিকার পক্ষেই বিপজ্জনক নয়, তাদের নিজের দেশের পক্ষেও বটে। মুসলিম দেশগুলির মানুষ এক ভয়ঙ্কর মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে। পাশ্চাত্য সম্বন্ধে যা তারা দেখে এবং শোনে তাতে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় আবার নিজের দেশের অবস্থাতেও তারা অত্যন্ত অসুখী। একই সময়ে যারা পাশ্চাত্য দেশে বাস করে তাদের কথা শুনে প্রভাবিত হয়, এবং বিভ্রান্ত বোধ করে। তাদের নিজেদের সংস্কৃতি, যা তাদের শেষ করে দিয়েছে; এবং পশ্চিমী সংস্কৃতি, যাকে সেই দেশে বাস করা মুসলিমরা নিন্দা করে; এই দু'য়ের দোটানায় ভোগে। আমি আলোচনায় যোগ দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন তিনি আমেরিকান সমাজে থাকেন, কেন তার তিন সন্তানসহ ফিরে যাচ্ছেন না তার নিজের “আধ্যাত্মিক” সমাজে। তিনি ঘৃণাভরে কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বললেন যে যদিও অদূর ভবিষ্যতে ফিরতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য এখনই ফিরতে পারছেন না।

আমি সেখানেই আলোচনা শেষ করলাম এই ভেবে যে তার সাথে কোন যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছন অসম্ভব। আমি অনেক ঘটনা দেখেছি এবং শুনেছি যেখানে এই দ্বন্দ্ব প্রকট। আমার মনে আছে কয়েক বছর আগের একটা খুব মজার ঘটনা। প্রেসিডেন্ট গদ্দাফি কয়েকজন প্যালেস্টিনীয় যুবককে লিবিয়া থেকে বহিস্কার করেছিলেন প্যালেস্টাইন এবং ইজরায়েলী সরকারের অসলো চুক্তির প্রতিবাদে। প্যালেস্টিনীয়রা লিবিয়া এবং মিশরের সীমান্তে অপেক্ষা করছিল যদি জাতিসজ্ঘ দয়া করে তাদের সমস্যা সমাধান করে দেয়। আমার মনে আছে একটা দৃশ্যে প্যালেস্টিনীয়রা গদ্দাফির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাচ্ছিল আমেরিকার পতাকা জ্বালিয়ে। তাদের একজন জ্বলন্ত পতাকাটা দোলাচ্ছিল। তার গায়ের জামার উপর লেখা "শিকাগো বুলস"।

মুসলিম দেশের নারীরা, যারা তাদের পাশ্চাত্যের বোনেদের ভণ্ডামি থেকে দূরে থাকে, বোঝে পাশ্চাত্যের নারীরা তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতা প্রয়োগ করে কি পেয়েছে এবং শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মন কত সমৃদ্ধ হয়েছে। মুসলিম দেশের নারীরা স্বীকার করতে বাধ্য যে পশ্চিমী সংস্কৃতি হল পুরুষ নারীর একসাথে সমানভাবে কাজ করার ফল এবং এও মানবে, যে সমাজে অর্ধেক মানুষকে ছোট করে দেখা হয়, অত্যাচার করে দমিয়ে রাখা হয়, সে সমাজ কোন ক্ষেত্রেই সফল হতে পারে না বা কোনরকম উন্নতি করতে পারে না। অজ্ঞতা থেকে এই নারীদের মুক্ত করাই একমাত্র চাবি সেই দরজা খোলার যে দরজা ইসলাম তাদের মুখের উপর শক্ত করে বন্ধ করে রেখেছে। আমরা যদি এই দরজাগুলি খুলতে পারি, একমাত্র তখনই ইসলামি সন্ত্রাস দূর করতে প্রথম ধাপ এগোতে পারব।

মুসলিম নারীরা যেদিন সিদ্ধান্ত এবং পছন্দের পার্থক্য বুঝবে, সেদিন দাসত্বকে গৌরবান্বিত না করে স্বাধীনতাকে সম্মান করতে পারবে। যখন আমরা মাথা ঢাকার বিষয়টি আলোচনা করি, যা মুসলিম নারীদের গোটা জগৎ থেকে লুকিয়ে রেখেছে এবং একই সমাজে বাস করা পুরুষ ও নারীর মধ্যে লোহার দেওয়াল তুলেছে, এই নারীরা প্রতিবাদ করে বলে যে মাথা ঢাকার বিষয়টি তাদের নিজেদের

নেওয়া সিদ্ধান্ত এবং সমগ্র বিশ্বকে একে সম্মান করতে হবে। এটা তাদের সিদ্ধান্ত হতে পারে কিন্তু অবশ্যই তাদের পছন্দ নয়। আরব দেশগুলিতে নারীরা এই শিক্ষায় আটকে থাকে শুধুমাত্র ভয়ে।

নবী মহম্মদ তার সম্পর্কিত ভাই আলীকে একটি হাদিসে বলেছেন: "যে রাত্রে ফেরেস্তা আমাকে স্বর্গে নিয়ে যায় আমি নরকের পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম নারীদের সমস্ত প্রকারে অত্যাচার করে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে। সেই দৃশ্যে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, তাদের যন্ত্রণা এত তীব্র ছিল। আমি দেখলাম একজন নারীকে চুলে ঝুলিয়ে তার মস্তিষ্ক সিদ্ধ করা হচ্ছে, একজনকে বুকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আমি দেখলাম একজন নারীর মাথাটা শূকরের আর দেহটা গাধার। আমি একজন নারীকে দেখলাম যার চেহারা কুকুরের মত, তার মুখের মধ্যে আগুন ঢুকে পিছন দিয়ে বেরিয়ে আসছে কারণ ফেরেস্তারা আগুনের লাঠি দিয়ে তার মাথায় মারছিল"। হলিউডের কোন চিত্রপরিচালক যিনি অত্যাচারের দৃশ্যে ভরা ভয়ের ছবি তৈরীতে বিশেষজ্ঞ, তিনিও কি এর থেকে আরও ভয়ঙ্কর দৃশ্য কল্পনা করতে পারবেন? কেমন করে একজন মুসলিম নারী তার মাথা ঢাকতে অস্বীকার করবে যখন সে বিশ্বাস করে, ঈশ্বর তাকে বুক থেকে ঝুলিয়ে রাখবে, মুখে আগুন প্রবেশ করাবে এবং পিছন থেকে বার করবে? সে পারবে না এবং সে নিজেকে মাথা ঢাকা থেকে মুক্ত করতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজেকে ভয়মুক্ত করতে পারবে।

যখন আমরা ঐ নারীকে তার দৈত্যের কবলমুক্ত করতে পারব, তখন সে তার ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে এবং তখন সে নতুন চোখে এই শিক্ষাকে দেখবে যে শিক্ষা তাকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। এটা হল বিষয়টির একটা দিক। অন্য দিক হল, যদি মুসলিম মেয়েদের মাথা ঢাকা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিষয় হয় এবং সারা বিশ্বকে তাকে সম্মান জানাতে হয়; তাহলে প্রশ্ন আসে: যে মেয়েরা তাদের মাথা ঢাকে না তাদের সিদ্ধান্তকে কি ইসলাম সম্মান করে? কেন মুসলিম নারীরা লস এঞ্জেলেসের রাস্তায় বোরকা পরে ঘোরে, যা তাদের মাথা থেকে

পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে রাখে, অথচ পাশ্চাত্যের নারীরা যখন সৌদি আরব ভ্রমণে যায় তাদের বাইরে যেতে হলে বোরকা পরতে হয়?

মুসলিম সমাজে যে নারী তার মাথা ঢাকতে অস্বীকার করে তাকে কি সম্মানের চোখে দেখা হয়? অথবা তার সিদ্ধান্তের জন্য বিরাট মূল্য দিতে হয়? দু'বছর আগে যখন আমার আমেরিকান বন্ধু জেসিকার সাথে সিরিয়ায় গিয়েছিলাম, তখন সিরিয়ার একটা শহর তার্তুস-এর কাছে একটা ছোট দ্বীপে গিয়েছিলাম। প্রায় তিরিশ বছর বয়স্ক আমদের গাইডের সাথে দ্বীপের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সেখানে স্থানীয় লোক আর ভ্রমণার্থীদের বেশ ভীড়। জেসিকা বলল: "মনে হচ্ছে সিরিয়ায় শহরের থেকে এই দ্বীপে অনেক বেশী মহিলা মাথা ঢেকে রাখে"।

আমি গাইডের দিকে ফিরে জজ্ঞাসা করলাম, "এই দ্বীপের সব মহিলা কি মাথা ঢেকে রাখে?"

সে একটুও দ্বিধা না করে বলল, "হ্যাঁ, কয়েকজন বেশ্যা ছাড়া"। তার উত্তর বাস্তবতার প্রতিফলন ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা মুসলিম সমাজের প্রতিটি নারী এড়াতে চেষ্টা করে। এটাই হিজাব পরার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। একজন নারী বে্শ্যার সমান হওয়ার থেকে মাথাটা ঢাকবে।

যখন আমি চতুর্থ বৎসরের মেডিকেল ছাত্রী, আমি যে হাপাতালে ট্রেনিং-এ ছিলাম তার কাছে বাসস্টপে একদিন দেখি দু'টো ছোট ছেলে, তাদের বয়স প্রায় ছয় এবং আট। দু'জনের হাতে একটা করে ছোট পাখী, একটা একটা করে পালক টেনে ছিঁড়ছে। পখীদু'টো যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে আর পালানোর চেষ্টা করছে। দৃশ্যটা আমাকে খুব বিচলিত করে তুলল এবং আমি ছেলে দু'টোর কাছে গিয়ে ভদ্রভাবে বললাম, "তোমরা এটা কোরো না, থাম"। বড় ছেলেটা তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল, মনে হল সে দৃষ্টি আমার দেহের প্রতিটি কোষ ভেদ করে যাচ্ছে, কঠিন গলায় বলল, "পাখীর পালক ছেঁড়ায় কোন দোষ হয় না। দোষ হয় তোমার মত মেয়ে মাথা না ঢেকে লোকজনের মাঝে ঘুরে বেড়ালে। যাও, বাড়ী গিয়ে চুপ করে থাক!"

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে হবে যে শিক্ষা মুসলিম ছেলেদের দৈত্য বানায় সেই শিক্ষা থেকে তাদের রক্ষা করে। একটু চিন্তা করে দেখুন: একটা আট বছরের ছেলে যে দৃষ্টিতে ভুল এবং ঠিক বিচার করে, সেটাই সমস্যা এবং সেজন্য চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। ছেলেটার চোখে মাথা না ঢেকে রাস্তায় চলা একজন মহিলার সম্মান রাস্তার একটা কুকুরের থেকে বেশী নয়। এই ছেলেটির মহিলাটির সম্বন্ধে কিছু জানার প্রয়োজন নেই, এমন কি সে যদি ভালো ডাক্তারীর ছাত্রীও হয় তবু তার মন্তব্য করতে বাধে না যে সে একটা বেশ্যা যদি না সে মাথা ঢেকে রাখে। আমাদের এটাও ভাবা দরকার, ছেলেটি পাখীটার প্রতি যা করছে সে বিষয়ে কোন অপরাধবোধ অনুভব করতেও সে অক্ষম। এটাও একটা বড় সমস্যা।

মহম্মদ আত্তা একদিনে সন্ত্রাসবাদী হয়নি। সে আকাশ থেকে পড়েনি বা গাছ থেকেও পড়েনি। আট বছর বয়সে সেও হয়তো কোন অপরাধবোধ ছাড়াই পাখীর পালক ছিঁড়েছে এবং হিজাব ছাড়া কোন মহিলা সম্বন্ধে তার ধারণা ঐ ছেলেটির আলটপকা মন্তব্যের থেকে বেশী বিচারবোধ সম্পন্ন ছিল না। সে এমন এক সমাজে জন্মেছে যার মূল্যবোধ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে সে আত্মীকরণ করেছে। অতি অল্প বয়সে সে নিশ্চয়ই কোরানের এই আয়াতটি পড়েছে: "যারা আল্লাহ ও তার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অথবা দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি হত্যা, শূলে চড়ানো অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে ফেলা"(৫:৩৩)। একটা ছেলে যে শেখে ঈশ্বর বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে দেয়, সে একটা জীবন্ত পাখীর পালক ছিঁড়তে দ্বিধা করে না। বড় হওয়ার পর সে "অবিশ্বাসী" মানুষে ভর্তি প্লেন ছিনতাই করতে পারে এবং সেটা নিয়ে "অবিশ্বাসী" পূর্ণ উঁচু বাড়ীকে আক্রমণ করতে পারে। সেই ছেলেটা তার ঈশ্বরকে আত্মীকরণ করবে এবং একদিন সে নিজেই ঐ ঈশ্বর হয়ে উঠবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই শিক্ষা অল্পবয়সীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রায় দু' বছর আগে অ্যানাহেইম মসজিদ, অরেঞ্জ কান্ট্রি, ক্যালিফোর্নিয়া বাচ্চাদের একটি কোরআন মুখস্ত করার প্রতিযোগীতার আয়োজন করেছিল, বিজয়ীদের জন্য পুরস্কারও ছিল। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। যে আমেরিকা সরকার সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য ইরাক,

আফগানিস্তানে নিজের সৈন্যদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, সেই সরকার এবং আমেরিকার জনগণ চোখ বুঁজে আছে তাদের বাড়ীতেই আমেরিকার শিশুরা সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা গলাধঃকরণ করছে। সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী আক্রমণের কয়েক সপ্তাহ পর, লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি ইসলামি প্রতিষ্ঠান লস অ্যাঞ্জেলেস ইউনাইটেড স্কুল ডিস্ট্রিক্ট "পবিত্র কোরানের অর্থ" (The Meaning of the Holy Qu'ran) নামে কিছু বই দান করে। তবে ইহুদী এবং মুসলমান নেতাদের একটা জরুরী মিটিং-এর পর বইগুলি তুলে নেওয়া হয় এবং ইসলামি প্রতিষ্ঠানটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ সেখানে কিছু কথা ছিল যা অন্য ধর্মের মানুষকে অসম্মান করে। দ্য লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস (The Los Angeles Times) ফেব্রুয়ারী ১২, ২০০২ সংবাদটি ছাপে এই শিরোনামে, "তুলে নেওয়া কোরানের পরিবর্তে নতুন সংস্করণ দেওয়া হবে"।

সংবাদটিতে উল্লেখ ছিল যে মিস্টার দাফের দাখিল, ওমর ইবন আল খাট্টাব ফাউণ্ডেশনের প্রধান, টাইমস-কে ই-মেইলে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের উপহারের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম এবং মুসলমান সম্বন্ধে ধারণাকে আরও উন্নত করা যে সময়ে ইসলাম এবং মুসলমান সম্বন্ধে ভুল ধারণা তুঙ্গে, এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একটা সুযোগ দেওয়া যাতে তারা বাইবেল এবং অন্য ধর্মগ্রন্থের পাশাপাশি কোরআনকেও পড়তে পারে"। মিস্টার দাখিল ক্ষমাও চেয়েছিলেন এইভাবে: "আমরা অন্য ধর্মের মানুষদের অনুভূতিকে আঘাত করতে বা কোন অস্বস্তি সৃষ্টি করতে চাইনি"। সালাম আল-মারায়াতি, মুসলিম পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল এর মুখপাত্র ব্যাখ্যা করে বললেন "বিশ্বাস ও সদিচ্ছার কারণে এবং মানুষের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার কারণে আমরা বইগুলি ব্যবহার না করতে রাজী হয়েছিলাম"। লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী "মিস্টার আল-মারায়াতি এবং অন্য মুসলমান নেতারা মিটিং-এ রাজী হয়েছিলেন স্কুল আধিকারিকদের সাথে মিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোরানের নতুন সংস্করণ বার করবেন"।

তখনকার মতোই এখনও আমার মনে প্রশ্ন আসে: কোরানের অন্য সংস্করণ বলতে ওরা কি বোঝায়? মিস্টার আল-মারায়াতি তার নতুন সংস্করণে কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন কোরানের ১৪৮ পৃষ্ঠায় যে আয়াত আছে তার? তিনি কি আমাদের সন্তানদের বলবেন যে ঐ আয়াতটি বর্তমান সময়ে আর প্রযোজ্য নয়? তখন থেকে আমি খুব খুঁটিয়ে সংবাদ দেখতাম, কিন্তু কখনও দেখিনি মিস্টার আল-মারায়াতি তার নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরেছেন। আমি এটাও জানি না, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব" বলে তিনি কতটা সময় বুঝিয়ে ছিলেন। প্রতিবেদনটি লিখেছিল মিটিংটি হয়েছিল বন্ধ দরজার পিছনে। কেন প্রকাশ্যে আলোচনা হয়নি? মিস্টার আল-মারায়াতি কি সমস্ত মুসলিম দেশগুলির কাছে প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন লস অ্যাঞ্জেলেসের স্কুলগুলি থেকে বইটি তুলে নেওয়া হয়েছিল? তিনি কি পৃথিবীর সমস্ত স্কুল থেকে বইটি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন? যা নৈতিকভাবে লস অ্যাঞ্জেলেসে গ্রহণযোগ্য নয় তা কোথাও নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, এমনকি সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যেও নয়; কারণ নৈতিকতা স্থান কাল ভেদে পরিবর্তিত হয় না। মিস্টার আল-মারায়াতি কেন লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বইটি তূলে নিলেন অথচ অন্যদেরকে পুরস্কার হিসেবে বিতরণ করতে দিলেন অ্যানাহেইমের মসজিদ সংলগ্ন স্কুলের মুসলিম শিশুদের মধ্যে যারা মুখস্থ করায় দক্ষতা দেখিয়েছিল?

দুর্ভাগ্যক্রমে এটাই একমাত্র ঘটনা নয় যে, একজন মুসলমান ইংরাজী-বলা শ্রোতাদের কাছে একরকম বলে এবং আরবি-বলা শ্রোতাদের কাছে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। সেপ্টেম্বর ১১ আক্রমণের অব্যবহিত আগে একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে প্রধান এবং একমাত্র বক্তা ছিলেন মুসলিম গোষ্ঠীর এক বক্তা। তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর উপস্থিত অনেকেই তাকে প্রশ্ন করছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: "ডক্টর, আপনি কি বিশ্বাস করেন আমাদের যে ইসলামি বইগুলি আছে সেগুলি কোন শান্তিপ্রিয় এবং অহিংস প্রজন্ম সৃষ্টি করতে পারে?" বক্তা ভালই জানতেন আমি কে এবং আমার অবদান কি; তিনি উত্তর দিলেন: "অবশ্যই না!" অর্থাৎ ইসলামি বইগুলির পরিবর্তন এবং আরও গভীরভাবে বিচার করা প্রয়োজন।

কিন্তু যখন লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি আরবিভাষার সংবাদপত্রের প্রকাশক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তার বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ করা যাবে কি না, তিনি আপত্তি করলেন। আমি তাকে বলতে শুনলাম , "না না, ওটা করবেন না। কিন্তু আমার কোন আপত্তি নেই যদি লেখেন, "এর মধ্যে কিছু বইয়ের পুনরায় বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে"। প্রকাশক ভদ্রলোক চেষ্টা করেছিলেন ছাপার আগে বক্তার সম্মতি পেতে, কারণ তিনি ভালই বুঝতে পেরেছিলেন যে বক্তা গোপন আলোচনা সভায় যা বলেছেন সেটা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা যা তিনি প্রকাশ্যে বলতে প্রস্তুত।

কেন পশ্চিমী দেশগুলি মুসলমানদের থাকতে দেয়, যারা তাদের মধ্যেই বাস করে, পশ্চিমী ভাষাতে কথা বলার সময় অনুগ্র ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু মুসলিম বিশ্বে তার দেশীয় ভাষায় বলার সময় কখনও মৌলবাদী ইসলামি মতের সমালোচনা করে না। এ গল্প হিমশৈলের চূড়া মাত্র যা পশ্চিমী দেশে ক্রমবর্ধমান ইসলামিকরণকে নির্দেশ করে, বিশেষত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে।

*আল জালালাইন কোরআন পাঠের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাফসির (ব্যাখ্যা) কারকদের অন্যতম ।

ইসলাম এক বদ্ধ পাত্র

ইসলাম এক বদ্ধ পাত্র। এর ছিপি কোন বাতাস চলাচল করতে দেয় না। নিজেকে রক্ষা করতে এবং এর চিরন্তন অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে এই মতবাদ মানুষকে লৌহমুষ্ঠিতে ধরে রাখে এবং ব্যক্তিমানুষ এবং সমাজের সম্পর্ককে দমনমূলক আর স্বেচ্ছাচারী করে রেখেছে। সমাজে ব্যক্তির কোন স্বাধীনতা নেই এবং নিজের মতপ্রকাশের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, বিশেষত সেই মত যদি প্রচলিত মত না হয়। ইসলাম তার অনুসারীদের মৌলিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে—নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা, এবং তাদের স্বাধীনতা উপভোগ করার ইচ্ছাকে হত্যা করেছে। ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে ইসলাম জীবনের বড় এবং ছোট, প্রতিটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম স্থির করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষের প্রত্যেক জীবনাচরণে সূক্ষ্ম বিষয়কেও নিয়ন্ত্রণ করে এবং একান্ত ব্যক্তিগত মূহুর্তকেও অনুশাসনে রাখে—এমন কি গোসলে* যাওয়ার সময়ে ডান পায়ের আগে বাম পা ফেলতে হবে সে আদেশও দেয়।

এই সমাজে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক এমনভাবে সাজানো হয় যে, একজন মানুষ একই সাথে প্রভু এবং দাস তৈরী হয়। তার থেকে দুর্বলদের কাছে সে প্রভু, আবার অন্যজন যখন তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী তখন সে দাস। ইসলামে ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্কের প্রকৃতি শাসক এবং শাসিত, স্বামী এবং স্ত্রী, পিতা এবং পুত্র, প্রভু এবং ক্রীতদাসের সম্পর্কের থেকে কিছুমাত্র আলাদা নয়। এ এক দমনমূলক সম্পর্ক যেখানে প্রভুর টেনে দেওয়া সীমারেখার বাইরে একটি পদক্ষেপও করা যাবে না। নারী পুরুষের সম্পত্তি, সন্তান পিতার সম্পত্তি, ক্রীতদাস প্রভুর

সম্পত্তি, এবং শ্রমিক মালিকের সম্পত্তি। এ সমস্তই শাসকের সম্পত্তি, যে ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে শাসন করে।

যতদিন দাস তার প্রভুর অধিকারকে মেনে নেবে এবং প্রভুর পবিত্রতাকে অমান্য করতে অস্বীকার করবে, ততদিন দমনের রাজত্ব বেঁচে থাকবে এবং শাশ্বত চেহারা নেবে। মুসলিম সমাজে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান দমনমূলক প্রভুত্বের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান সমাজ জন্মলগ্ন থেকেই দাস সমাজ এবং আজ পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই রয়ে গেছে। এই সত্য অনুভব করতে একজন গবেষক বা মানবাধিকার কর্মীকে মুসলমান সমাজে গিয়ে বাস করতে হবে। যদি তিনি তা করেন তাহলেই তিনি সম্পর্কের চরিত্রটি বুঝবেন যা সমাজটির কাঠামো। আপনি যদি লক্ষ্য করেন মুসলিম সমাজে মানুষ কিভাবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে—এমনকি একজনের সাথে অন্য একজনের সম্পর্ক—তবে আপনি দেখবেন তারা প্রভু এবং ভৃত্য। সহজ সরল দৃষ্টিতেই আপনি অনুভব করবেন দু'জনের মধ্যে কি ঘটে।

মানুষের মন এমনভাবে গঠিত যে উভয়পক্ষের পদমর্যাদা অনুযায়ী সে হীণতা বা প্রভুত্ব অনুভব করে। যখন দুজনের দেখা হয়, দু'জনেই কোন অজানা উপায়ে বুঝে যায় তাদের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী। দুর্বল পক্ষ সম্পূর্ণভাবে অস্ত্র ত্যাগ করে, সবলপক্ষ পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয় এবং শর্ত আরোপ করা শুরু করে। মুসলিম সমাজে খুব অল্প সম্পর্কই পারস্পরিক সম্মানবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি ব্যক্তিগত পর্যায়েও প্রত্যেক পক্ষই অপরপক্ষের দুর্বলতা এবং শক্তি বিষয়ে অবহিত। যখন দু'জন মানুষের দেখা হয় উভয়েই সহজ হিসেব কষে বুঝে নেয় কে বেশী শক্তিশালী এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রভু বা দাসের ভূমিকা পালন করে।

এই বিষয়ের সত্যতা আমি দেখেছি সামাজিক অনুষ্ঠানে মানুষের আচরণ লক্ষ্য করে। একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হল, কয়েক মিনিটের মধ্যে উভয়েই জেনে ফেলে অন্যজন কি করে, সে কোন পরিবারের, সে কত ধনী, তার ধর্ম কি অথবা সে কোন জাতের মানুষ। এই প্রাথমিক ব্াক্যালাপই ঠিক করে দেয় একজন

অন্যজনের সাথে কেমন ব্যবহার করবে। দু’জনের মধ্যে যত কম পার্থক্যই থাক, একজন অন্যজনের উপর প্রাধান্য করবে, এখান কোন মধ্যপন্থা নেই।

একজন ব্যক্তি কোন একটা সম্পর্কে প্রভু হতে পারে আবার একই ব্যক্তি অন্য ক্ষেত্রে দাস। অপর পক্ষের শক্তিই ঠিক করে দেবে দু’টোর মধ্যে কোন ভূমিকা সে পালন করবে। আমার একজন আত্মীয় সিরিয় গোয়েন্দা বিভাগে এক উচ্চ পদস্থ অফিসারের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। যখন আমি তার সাথে দেখা করতে যাই তখন তার আচরণ আমি নিজের চোখে দেখেছি। অল্প কয়েক মিনিট সময়কালের মধ্যে আমি তাকে সর্বময় প্রভু এবং দাসের ভূমিকা পালন করতে দেখলাম। যখন তার টেলিফোন বাজল এবং তিনি বুঝলেন যে অপর প্রান্তে তার উর্ধতন অফিসার, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং অফিসের সবাইকে চুপ থাকতে ইশারা করলেন। তিনি ঘামতে শুরু করলেন, বললেন, “জি, স্যার। আপনি আদেশ করুন, আমি আপনার বিশ্বাসী চাকর। আমি অক্ষরে অক্ষরে আপনার আদেশ পালন করব এবং সমস্ত ঘটনা নিখুঁতভাবে জানাবো”। ফোন রেখে তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের দিকে ফিরে চিৎকার করে বললেন, “এ্যাই খানকির ছেলে, শোন; আমি তোকে যে কাজে পাঠাচ্ছি, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ঠিক হওয়া চাই, নইলে তোর কপালে দুঃখ আছে। লোকটি বলল, “জি, স্যার। আপনি আদেশ করুন, আমি আপনার বিশ্বাসী চাকর”। যদি কেউ একটু ভাবেন যে পৃথিবীর কোথাও গোয়েন্দা দফতরে এমন ঘটনা ঘটে, তবেই মুসলিম সমাজের বাস্তব চেহারাটি তিনি বুঝতে পারবেন। কেউ যদি আরবের মুসলিম ইতিহাস পড়েন তিনি অনুভব করবেন সমাজের দু’টি পক্ষের মধ্যে কি ভয়ানক দমনের সম্পর্ক।

আমেরিকার বাহিনী ইরাকে প্রবেশ করার কয়েকমাস পর আমি আমেরিকান এবং আরবি সংবাদপত্র দুটোই পড়তাম। ইরাকের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস –এর একটি সাক্ষাৎকারে একজন আমেরিকান সৈনিক বলছেন, “এই ইরাকীদের আমি একেবারেই বুঝতে পারি না। কোন একটা চাকরীর জন্য লোকে দরখাস্ত করতে এসেছে। আমি তাদের ঠিকভাবে লাইনে দাঁড়াতে

সাহায্য করছি, কিন্তু তারা এলোমেলোভাবে জটলা করে এবং কোন নির্দেশ মানে না। কিন্তু যখন একজন ইরাকী সৈনিক এসে লাঠি দিয়ে তাদের বেদম পেটায় তখন তারা ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। ওরা কি ভাবে আমি সেটাই বুঝি না! মনে হয় ওরা একটা জিনিসই বোঝে তা হল 'পিটুনি'। হ্যাঁ, বস্তুত প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি শক্তিশালী পক্ষ এবং একটি দুর্বল পক্ষ প্রয়োজন কোন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য।

যখন আপনি শান্তভাবে কোন মুসলমানের সাথে কথা বলেন, সে ধরেই নেয় যে আপনি দুর্বল। আমেরিকান প্রবাদ "কথা বল মৃদুভাবে এবং সঙ্গে রাখ বড় একটা লাঠি"; দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ প্রবাদ মুসলমানদের ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসে না। বরং এটা বলাই সঠিক যে (যতদিন না আমরা চিন্তার পরিবর্তন করতে পারছি), "জোরের সাথে কথা বল এবং সঙ্গে রাখ বড় একটা লাঠি"; অন্যথায় আপনি হবেন দুর্বল পক্ষ এবং হারবেন। এমন সমাজে গণতন্ত্র বিস্তারলাভ করবে না যতদিন না সেই সমাজে বাস করা মানুষদের নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত করা যাবে, কারণ তারা প্রভু এবং দাসের ভূমিকা ছাড়া কোন কাজই করতে পারে না। এমন সমাজে মানুষ, যারা দু'টোর মধ্যে যে কোন একটা ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত, তাদেরকে মানুষ হিসেবে কাজ করা শিখতে হবে; নিজে দাস হয়ে বা অন্যকে দাস বানিয়ে নয়। তাদেরকে শিখতে হবে, একটা প্রকৃত সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই অন্যকে সম্মান করবে, অন্যজনের অধিকার ও দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেবে, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং পারস্পরিক দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করবে না।

মহম্মদ তার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য তার অনুসারীদের মনে অস্বস্তির কাঁটা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার সাথে তার নিজের প্রতি বাধ্যতাকে সংযুক্ত করে। তারপর তিনি এই "দ্বৈত পবিত্রতা"র সাথে এক তৃতীয় পক্ষকে যোগ করলেন শাসকের রূপে যার মাধ্যমে তিনি বাকী সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

মহম্মদ বুঝেছিলেন যে তার এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সংযোগের সেতু শাসক, এবং সেই কারণে শাসককে মান্য করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। একটি হাদিসে বলেছেন: "যে আমাকে মানে সে ঈশ্বরকে মানে, এবং যে শাসককে

মানে সে আমাকে মানে। যে আমাকে মানে না সে ঈশ্বরকেও মানে না, যে আমার নিযুক্ত শাসককে মানে না, সে আমাকেও মানে না"। এর বিশ্বাসযোগ্যতা্ প্রমাণে পাহাড়চূড়া থেকে আয়াত নেমে এল: "আল্লাহ এবং তার রাসুলকে এবং তোমাদের মধ্যে যারা নির্দেশের মালিক তাদের মান্য কর" ((৪:৫৯)। কোরানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী "তোমাদের মধ্যে যারা নির্দেশের মালিক"-এর অর্থ মুসলিমদের 'শাসকবর্গ'।

মুসলমানরা যেন তাদের শাসককে সন্দেহমুক্তভাবে এবং শর্তহীনভাবে মান্য করে, সেজন্য মহম্মদ একটি হাদিসে তাদেরকে বলেছেন, "তোমাদের শাসককে মান্য কর, যদি সে তোমাদের অত্যাচার করে এবং সম্পত্তি কেড়ে নেয় তবুও"। এই প্রশ্নহীণ আনুগত্যের বিরুদ্ধে কিছু মুসলমান বিদ্রোহ করতে পারে এই ভয়ে তিনি এর যাথার্থ্য দিলেন অন্য একটি হাদিসে: "যদি কোন শাসক গভীর ভাবে চিন্তা করে কোন আদেশ দেন এবং সিদ্ধান্তটি সঠিক হয়, তবে তাকে দু'টো পুরস্কার দেয়া হবে। যদি তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করে কোন সিদ্ধান্ত দেন এবং সিদ্ধান্তটি ভুল হয়, তবে একটি পুরস্কার দেয়া হবে"।

মহম্মদ মুসলমানদের এটা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, শাসক চিন্তার জন্য সময় ব্যয় করেছেন এবং গভীর চিন্তার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তার সদ্ধান্ত ঠিক বা ভুল দুটোই হতে পারে, কিন্তু যেটাই হোক, ঈশ্বর তাকে পুরস্কৃত করবেন। কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তার সিদ্ধান্ত মুসলমানদের স্বার্থ ভালভাবে রক্ষা করবে। যখন তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নেন, ঈশ্বর তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেন, ভুল হলে একগুণ দেন।

যখন সাদ্দাম হুসেইন ইরাকের উত্তরে কুর্দদের রাসায়নিক দিয়ে ঝলসে দিয়েছিলেন এবং দক্ষিণে শিয়াদের নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, মুসলিমদের ধর্মীয় আইনে তিনি কোন অপরাধ করেননি। শরিয়া অনুযায়ী, শাসক হিসেবে তিনি গভীরভাবে ভেবেচিন্তে তবেই ঝলসে দেওয়া বা শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মহম্মদের আইন অনুযায়ী তার (সাদ্দাম হুসেইনের) একমাত্র শাস্তি হচ্ছে ঈশ্বর তাকে দু'বারের বদলে একবার পুরস্কৃত করবেন। অর্থাৎ, তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও সেটা

নিয়ে প্রশ্ন তোলার কাউকে পাওয়া যাবে কি? হয়ত ইরাকের কুর্দদের জ্বালিয়ে শেষ করা হয়েছিল ইসলাম এবং মুসলিমদের স্বার্থেই। ইসলামের ইতিহাসে কখনও কোনও মুসলিম ধর্মপ্রচারক কোনও মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেনি, কারণ এই সর্বাত্মক বিশ্বাস যে শাসকের প্রতি আনুগত্য ঈশ্বর এবং নবীর প্রতি আনুগত্যেরই বর্দ্ধিত রূপ। এর একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে: কোন এক মুসলিম গোষ্ঠীর ধর্মপ্রচারক অন্য কোন গোষ্ঠীর শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারে।

একজন মুসলমান কিভাবে তার শাসকের কবলমুক্ত হতে পারে যখন সে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে তার আনুগত্য করা প্রয়োজন? সে কিভাবে এই আনুগত্য অস্বীকার করবে, যে আনুগত্য তার নবীর প্রতি এবং সেইসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি? সে করতে পারে না।

ইসলাম প্রকৃতপক্ষে এক স্বেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারী শাসনব্যবস্থা। এর জন্মলগ্ন থেকে তাই ছিল এবং আজও তাই রয়ে গেছে।

একজন শাসক তার প্রজাদের অত্যাচার করে এবং তাদের অর্থসম্পদ লোপাট করে, এর চেয়ে দাসত্বের কুৎসিততম রূপের আর কি কোন উদাহরণ আছে কোন সম্পর্কের মধ্যে; যেখানে প্রজাদের কোন অধিকারই নেই শাসকের অন্যায্য আচরণের প্রতিবাদ করার? শাসক তার কাজ করে ঐশ্বরিক আদেশবলে আর প্রজারা তাকে মান্য করে ঐশ্বরিক আদেশে। আমেরিকা মুসলিম বিশ্বে একনায়কতন্ত্র সৃষ্টি করেনি। আমার কোন সন্দেহ নেই আমেরিকা কিছু অত্যাচারী মুসলিম শাসককে সমর্থন করেছিল, যেমন সাদ্দাম হুসেইন—কিন্তু সে তাকে সৃষ্টি করেনি। সাদ্দাম হুসেইনের জন্ম হয়েছিল ইসলামি সংস্কৃতির গর্ভে। মুসলমান জনগণই তার স্রষ্টা, যে জনগণ ইসলামি ধর্মীয় আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে যেমন প্রভু তাদের প্রয়োজন তেমন নেতা সৃষ্টি করে। পৃথিবীর কোন শাসক জনগণের উপর অত্যাচার করতে পারে না যদি না সেই জনগণ শিক্ষাগতভাবে, সংস্কৃতিগতভাবে, মানসিকতায় এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে অত্যাচারিত হতে প্রস্তুত থাকে। মুসলিম পরিবারে একটি শিশুর উপর অত্যাচার শুরু হয় যে মূহুর্তে সে প্রথম দিনের আলো দেখে তখন থেকে, এবং তার

সাংস্কৃতিক গঠন প্রক্রিয়া সারাজীবন ধরে চলতে থাকে যতদিন না তার এমন অবস্থা হয় যে যদি সে তার শাসকের সম্মুখীন হয় সে এতটাই হতবাক হবে যে তার কিছু করার ক্ষমতা না থাকে।

ইসলামে শিশুরা হল সম্পত্তি, দায়িত্ব নয়। ইসলাম শিশু এবং তার পিতামাতার সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং জোর দিয়েছে পিতামাতার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার উপর।

একটি বালকের তার পিতার সাথে সম্পর্ক প্রভাব ফেলে তার পরিপার্শ্বের সকল বয়স্ক মানুষের সাথে সম্পর্কের উপর। সে এই সম্পর্ক বাড়ী থেকে সাথে করে নিয়ে যায় পথে, মসজিদে, স্কুলে এবং সমাজের প্রতিটি জায়গায়। এটি তাকে সাহায্য করে ঠিক একই সম্পর্ক (অন্ধ আনুগত্যের) গড়ে তুলতে যেখানে সে মনে করে কোন বয়স্ক বা তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে গড়া উচিত।

একটি শিশু তার শিক্ষকের, প্রতিবেশীর, আত্মীয়দের ক্রীতদাস—যখন সে বড় হয় তখন তার উর্ধ্বতন মানুষ এবং চারপাশের প্রভাবশালী মানুষের ক্রীতদাস। চেতনে বা অবচেতনে সে এই দাসত্বকে মেনে নেয়, যা ঈশ্বর, তার নবী এবং তার উপর কর্তৃত্বকারী মানুষের প্রতি তার আনুগত্যকে প্রকাশ করে। একটি বালক বাড়ী থেকে স্কুলে যায় অত্যাচারিত হয়ে এবং প্রতিবাদ করার সামান্যতম ক্ষমতা বঞ্চিত হয়ে, বা শুধুমাত্র "না" এই শব্দটুকু উচ্চারণ না করে। স্কুলে সে প্রতিদিন যা শোনে বাড়ীতেও তাই শোনে: ঈশ্বরের আদেশ যে পিতামাতা এবং যারা ক্ষমতায় আছে তাদের আনুগত্য করতে হবে, এবং সে বড়ীতে যা শুনেছে সেই অনুযায়ী আচরণ করে। যা কিছু সে শেখে তা তার মনে এমনভাবে গেঁথে যায় যে তার মনে এমন কোন প্রশ্ন জাগে না যা এই আনুগত্যের বৈধতা নিয়ে সামান্যতম সংশয় প্রকাশ করে। ইসলাম পুত্রের প্রতি পিতার দায়িত্ব হিসাবে একটিমাত্র বিষয়ে গুরুত্ব দেয় যেখানে ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য জড়িত। মহম্মদ একটি হাদিসে বলেছেন: "তোমাদের

সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজ পড়তে নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সেও যদি সে তা না করে তাহলে প্রহার কর"।

এখানে আবার আমরা দেখি মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যেও অত্যাচারের সম্পর্কের প্রকাশ: মানুষ যদি নামাজ না পড়ে তাকে জোর করে তা করতে বাধ্য করা হবে! আমার একজন ইরানী মুসলমান বন্ধু আছেন যিনি আমেরিকাতে বাস করেন। তিনি বিভিন্ন ধরণের অবসাদ এবং মনস্তাত্বিক সমস্যায় ভোগেন যা বর্তমান চিকিৎসায় সারে না। একদিন তিনি এ বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করার সময় বললেন: "আমার শৈশব এখনও আমাকে যন্ত্রণা দেয়। আমার বয়স যখন সাত বছর, আমার বাবা আমাকে পাঁচটায় জাগিয়ে দিতেন ভোরের নামাজের জন্য। আমাদের কোন বাথরুম ছিল না। তিনি আমাকে জোর করে শূন্য ডিগ্রীর নীচে তাপমাত্রায় বাইরে পাঠাতেন বাড়ীর কাছে কূয়োর জলে ওজু করার জন্য। আমার মনে আছে একদিন আমি কূয়ো থেকে জল তুলে বালতির জলে একবার হাত ডুবিয়েই দৌড়ে ঘরে ফিরেছিলাম বাবাকে বোঝাতে যে আমি নিয়ম মতই ধুয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে জানালা দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি তার চামড়ার বেল্ট নিয়ে নির্দয়ভাবে আমাকে মারলেন। আমি এত জোরে চিৎকার করছিলাম, আমার মা একটু দূর থেকে দেখে কেঁদে ফেললেন"।

আমার ইরানী বন্ধু আরও বললেন: "আমি আমার বাবার চেয়েও ঈশ্বরকে বেশী ঘৃণা করি। আমার বাবা এবং আমি দুজনেই ঐ আল্লাহ নামের অপরাধীর শিকার"।

সাদ্দাম হুসেইনও তার শিকার।

সাদ্দাম হুসেইন কি সম্পূর্ণভাবে মনে করতেন না যে তিনি পৃথিবীতে ঈশ্বর এবং নবীর প্রতিনিধি? তিনি কি বিশ্বাস করতেন না যে কুর্দ এবং শিয়াদের শেষ করে দেওয়া উচিত কারণ তারা তাকে মানেনি, এমন কি ঈশ্বর তাদের শাসককে মান্য করতে আদেশ দেওয়া সত্বেও? কেন আমরা সাদ্দাম হুসেনের বিচার করব ঐ "ঈশ্বর"-এর বিচার করার আগে? কেন সাদ্দাম জেলে কষ্ট পাবে যখন ঐ "ঈশ্বর"

আরামে আমাদের গ্রামের পাহাড়চূড়ায় বসে অপেক্ষা করবে পরবর্তী শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য? মুসলিমরা তাদের দেশে একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করার জন্য আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল, আমেরিকা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এবং কলঙ্কমোচনের জন্য সাদ্দাম হুসেইনকে সিংহাসনচ্যুত করে। সিংহাসন গেল ঠিকই কিন্তু উদ্দেশ্য পূরণ হল না। ইরাকের মানুষ এখনও সেই "ঈশ্বর"-এর দুঃস্বপ্ন দেখে, যে আদেশ করে শাসককে মানতে। আমেরিকা হিসাবে ভুল করেছিল, এখন একটা প্রশ্ন এড়ানো যায় না: রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিরাময়ে আমেরিকা কি কিছু করতে পারে?

উত্তর হল আমেরিকা শুধু পারেই না, তার সেটা করা উচিত। আমি এখানে রাজনৈতিক বা সামরিক বিষয় নিয়ে কিছু বলছি না—আমি রাজনীতিবিদ নই বা সামরিক সমস্যা সম্বন্ধে কিছু জানি না। কিন্তু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমেরিকার স্বার্থেই সমতা ফেরানো প্রয়োজন, কমপক্ষে আচরণ-বিজ্ঞান এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য যতটুকু প্রয়োজন। ইরাকে একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করার ভুল সংশোধনের জন্য যদি আমেরিকা ইরাক-যুদ্ধকে ব্যবহার করে থাকে আরব দুনিয়ায় গণতন্ত্রের বিকাশের উদ্দেশ্যে, তাহলে আমাদের প্রশ্ন: আমরা জনসাধারণের উপর গণতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়ার আশা কিভাবে করতে পারি, যে জনগণ গত চৌদ্দ শতাব্দী ধরে বিশ্বাস করে এসেছে যে তারা ঈশ্বরের আদেশে শাসককে মান্য করতে বাধ্য, এমনকি সেই শাসক যদি তাদের অধিকার হরণ করতেই থাকে তবুও? দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা ইরাকে যা ঘটতে দেখছি, সেখানেই এই প্রশ্নের উত্তর মেলে।

এই সমস্যার জন্য কোন গণতান্ত্রিক নেতার প্রয়োজন নেই। এ এক জাতির সমস্যা এবং একটা ধর্মীয় আইন যার নির্দেশ এবং শিক্ষা ঐ জাতির মস্তিস্কের পরতে পরতে মিশে গেছে এবং তাদের জিনে(gene) স্থায়ীভাবে গেঁথে গেছে। এখানে অন্য একটি প্রশ্ন উঠে আসে: সমাধান কি, ইরাকের যুদ্ধে আমেরিকার কাছে কি কি পথ আছে? উত্তর হল, কোন জটিলতায় না গিয়ে সরল সমাধান: একমাত্র পথ দৈত্যকে ক্ষমতাচ্যুত করা। দৈত্যের হাত থেকে ধর্মপ্রচারকদের মুক্ত করা, ধর্মপ্রচারকদের হাত

থেকে শাসককে মুক্ত করা, মানুষকে শাসকের হাত থেকে মুক্ত করা, নারীকে পুরুষের হাত থেকে মুক্ত করা, ক্রীতদাসকে প্রভুর হাত থেকে মুক্ত করা—সংক্ষেপে মানুষকে ভয় থেকে মুক্ত করা। যে মানুষ চিরকাল দৈত্যের পূজা করে এসেছে সে কোন স্বাধীনতা পেতে পারে? যদি আমেরিকা মুসলমানদেরকে তাদের শাসকের একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্ত করতে চায়, তাহলে দৈত্যের একনায়কতন্ত্র থেকে তাদের মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

মুসলিমদের ভয় থেকে মুক্ত করতে বিশাল সামরিক বাহিনী এবং নৌবহরের প্রয়োজন। প্রয়োজন চিকিৎসা এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষাগার এবং আচরণ-বিজ্ঞান, সামাজিক মনস্তত্ত্ব এবং সমাজবিদ্যার বিশেষজ্ঞদের। বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ড. ওয়েন ডায়ার (Dr. Wayne Dyer) এবং ড. ফিল ম্যাকগ্র (Dr. Phil McGraw) থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গবেষকরা কাজ করেন, তাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে মুসলিমদের দৈত্যের হাত থেকে মুক্ত করতে। এই আচরণ-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞরা তাঁদের প্রস্তাবে বিজ্ঞানভিত্তিক এবং নৈতিকতার সঠিক মাত্রার উপর গুরুত্ব দেবেন, জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন রাজনৈতিক যাথার্থ্যকে।

বহু মনস্তত্ত্ববিদ এবং আচরণ-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদের উপর টেলিভিশনের ভয়ঙ্কর দৃশ্যের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন যে দু'য়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমি গভীর পর্যবক্ষণে দেখেছি তাঁরা যে বিষয়ে গবেষণা করেছেন তার মধ্যে ভয়ঙ্করতা এবং পাঠ্যবস্তুর সম্পর্ক নিয়ে কোন আগ্রহ দেখাননি।

কোন মানুষের বিশ্বাস গঠনে টেলিভিশনের ভূমিকা সম্পর্কে পূর্বে যা বলা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে বলা হবে সেই প্রেক্ষিতে আমি বিশ্বাস করি না যে বইয়ের প্রভাবের থেকে টেলিভিশনের প্রভাব বেশী গুরুত্বপূর্ণ হবে। একথা আরও বেশী সত্যি যখন সেই বই একটি ধর্মীয় বই এবং সকল জ্ঞানের উৎস হিসাবে যারা সেটা প'ড়ে অভিভূত বোধ করে। কোন সন্দেহ নেই আমেরিকা এবং অন্য পাশ্চাত্য সমাজে শিশুদের মধ্যে হিংসা একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা যার জন্য যথেষ্ট গবেষণা এবং গভীর

চিন্তা প্রয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু কোন সমাজেই এই সমস্যা ইসলামি আতঙ্কবাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। আমেরিকা এবং গোটা সভ্য পৃথিবীকে এই সমস্যার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এর মোকাবিলার জন্য গবেষণার মাধ্যমে এর পিছনের কারণ খুঁজে বার করা দরকার, যাতে পৃথিবীকে রক্ষা করা যায়, মুসলমান জনগোষ্ঠীসহ।

আরব ঐতিহ্যকে জানা যায় আরবি বই থেকে। আমি বলি "আরবি", "মুসলিম" নয়; এটা নিশ্চিত করার জন্য যেন ছাত্ররা ইসলামের প্রাথমিক উৎস থেকে পড়তে পারে। কারণ যদি কোন গবেষক ইসলামকে জানতে আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় লেখা বই পড়ে, সে হয়ত সত্যকে জানবে না। যদিও আমি নিজে কখনও এমন বই পড়িনি তবু আমি একথা বলছি। আমার অনারব মুসলিমদের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি থাকার ফলে এবং কোরআনের ইংরাজী অনুবাদ পড়ে এই বিশ্বাস জন্মেছে। যুক্তরাষ্ট্রে আমার জীবন বহু অনারব মুসলিমের সাথে পেশাগত এবং সামাজিক মেলামেশার সুযোগ দিয়েছে, আর এই সম্পর্কের ফলে আমি গভীরভাবে জেনেছি ইসলাম এবং তার শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের গভীরতা কতটা। আমি নিশ্চিত যে আরব এবং অনারব মুসলিমের মধ্যে বিশাল পার্থক্য।

কোরআন একটি আরবি বই এবং ইসলাম অন্য ভাষায় এর অনুবাদ নিষেধ করেছে। অর্থাৎ বহু অনারবি-ভাষী মুসলমান আরবি বইটি পড়ে আরবি ভাষা আদৌ না জেনেই। তারা কোন অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দগুলি শুধু উচ্চারণ করে মাত্র, যা একটা অর্থহীণ বিষয়। অন্য কিছু ক্ষেত্রে তারা কোরআন পড়ে তাদের ভাষার অক্ষরে(transliteration), যেমন একজন আমেরিকান যখন ল্যাটিন অক্ষরে লেখা মাদ্রাসা শব্দটি উচ্চারণ করে সে জানেই না আরবিতে শব্দটির অর্থ কি। যদিও কোরআন অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হয়েছে, সেই অনুবাদগুলি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত নয়। আমি আগেই বলেছি ইসলামে কোরআনের অনুবাদ নিষেধ। এই নিষেধের কারণে অনুবাদকরা তাদের কাজকে উল্লেখ করেন "কোরানের অর্থের ইংরাজী অনুবাদ" বলে। স্বাভাবিকভাবেই, তাদের রচনায় তারা অর্থ প্রকাশ করেন সর্বোচ্চ রাজনৈতিক বিশুদ্ধতার সাথে।

আপনি যখন ইংরাজীতে কোরআন পড়েন, আপনি আক্ষরিক অনুবাদ পড়েন না, বরং আপনি পড়েন অনুবাদক যে অর্থটি বইতে লিখেছে। মহম্মদের জীবন, আচরণ এবং চিন্তা বিষয়ে অনারব মুসলিমরা তাদের ভাষায় যে আরবি বইয়ের অনুবাদ করেছেন এবং আর অন্য যে সব অনুবাদ প্রচলিত, কোনটিই মূল রচনার প্রতি বিশ্বস্ত নয়। রচনাগুলি সংক্ষেপিত এবং অনুবাদক যেমনভাবে বিষয়টি নৈতিকভাবে উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন তেমনভাবে অনুদিত। আমার কাজের সূত্রে তিনজন অনারব মুসলিম মহিলা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল। কাজের প্রয়োজনে আমাদের দীর্ঘ সময় একসাথে থাকতে হতো এবং সেই সময়ে অন্যান্য কথার মাঝে ইসলাম এবং তার শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হত। এইসব কথাবার্তার মধ্যে আমি যা বুঝেছি তাতে অবাক বোধ হতো।

ইসলামের শিক্ষার বিষয়ে তাদের জ্ঞান সীমিতই শুধু নয়, তা আমার জানার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা আমার থেকেও বেশী ধর্মোন্মত্ত এবং আবদ্ধ পরিবেশে বড় হয়েছে। অনারব মুসলমানরা আরবিতে নামাজ পড়ে কোন অর্থ না বুঝে। তারা তোতাপাখির মত বারবার আউড়ে যায়। যখন তারা কোরআন পাঠ করে তখনও একই অবস্থা। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে বহু খ্রীষ্টান যারা আরবদেশে বাস করেন তারা অনারব মুসলমানদের থেকে অনেক ভালভাবে ইসলামকে জানেন। আরও বড় কথা, খ্রীষ্টানরা যারা আরবদেশে বাস করেন তারা আচরণগতভাবে বা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে মুসলিম সংস্কৃতির দ্বারা অনেক বেশী প্রভাবিত অনারব মুসলমানদের চেয়ে।

এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় কেন ইসলামি সন্ত্রাসবাদ আরবদেশের ফসল। কোরআন, নবীমহম্মদের জীবন ও বাণী এবং তার সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়েছে সেসব বিষয়ে আরবের মুসলমানদের জ্ঞান অনেক গভীর। ফলে ইসলামি শিক্ষার প্রয়োগ তাদের কাছে অনেক বেশী দৃশ্যমান অনারব মুসলমানদের থেকে। যখন একজন আরবি-ভাষী মুসলমান নামাজ পড়ে সে বোঝে প্রার্থনার অর্থ, কিন্তু একজন অনারব মুসলমান না বুঝে শুধু উচ্চারণ করে।

একজন মুসলমান প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পড়ে এবং প্রতিবার কোরআনের প্রথম সুরা ফাতিহা পাঠ করে বারবার। এই সুরাতে খ্রীষ্টানদের বর্ণনা করা হয়েছে "যারা বিপথগামী" বলে এবং ইহুদীদের বলা হয়েছে "যাদের প্রতি তোমার অভিশাপ(গজব) বর্ষিত হয়েছে"। এ থেকে আমরা দেখছি মুসলমানরা একবারের নামাজে খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের বারবার অভিশাপ দেয়, আর সেই নামাজ তারা দিনে পাঁচবার পড়ে। অনারব মুসলমানরা জানে না যে তারা খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের অভিশাপ দিচ্ছে কারণ তারা আরবিতে নামাজ আদায় করে, নামাজে কি বলছে তা না জেনে। এর অর্থ, তারা নামাজ আদায় করার মাধ্যমে যে পরিমান ঘৃণা হৃদয়ঙ্গম করে তা আরব মুসলিমের ঘৃণার থেকে কম, কারণ তারা(আরবরা) জানে তারা কি বলছে।

যুক্তরাষ্ট্রে আমি যে অনারব মুসলমানদের দেখেছি তাদের অধিকাংশই নামাজে যে আয়াত তারা প্রতিদিন বহুবার উচ্চারণ করে তার অর্থ জানে না। কিন্তু আপনি যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর কোন আরব বালককে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেন সে আপনাকে বলে দেবে যে, তারাই খ্রীষ্টান যারা বিপথগামী এবং ইহুদী তারাই যারা ঈশ্বরের অভিশাপ অর্জন করেছে। আতঙ্কবাদ জন্মগ্রহণ করেছে আরব দুনিয়ায় এবং সৌদি আরব থেকে অন্য মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়েছে আরবের আদর্শগত এবং অর্থনৈতিক সাহায্যে। ইসলামি আতঙ্কবাদ আরব দ্বারা পরিচালিত, এবং যে অনারবরা নেতৃত্বের ইচ্ছা পোষণ করে তারা আরব দ্বারা প্রশিক্ষিত।

আফগানরা তাদের এই প্রবাদের জন্য বিখ্যাত, "আমরা শান্তিতে থাকি যখন আমরা যুদ্ধ করি"। যুদ্ধ করার এই প্রবণতা আফগান সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত, সম্ভবত আফগান সমাজের আদিবাসী প্রকৃতির কারণে। কিন্তু তারা কখনও বিশ্বব্যাপী ইসলামি আতঙ্কবাদী কর্মকাণ্ডের উৎস হয়ে ওঠেনি যতদিন না তারা আরব মুজাহিদিনের ভয়ঙ্কর সংস্পর্শে এসেছে; যারা সঙ্গে এনেছিল আতঙ্কবাদী দর্শন এবং আরবের টাকা। ইরশাদ মনজি, বর্তমান সময়ে ইসলামকে নিয়ে সমস্যা (The Trouble with Islam Today) বইয়ের লেখিকা যিনি ভারতীয় মুসলমান, তাঁর সাথে এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় তিনি আমার ধারণা পছন্দ করেননি এবং অসন্তুষ্ট

হয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, “তাহলে আপনি যা বলছেন তা থেকে কি আমি এই বুঝব যে অনারব মুসলমানরা আরব মুসলমানদের থেকে কম ইসলামিক?”

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলাম, “না, তারা কম ক্ষতিগ্রস্ত”।

অনারব মুসলমানরা আরব মুসলমানদের থেকে কম ইসলামিক নয় যদি তাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস এবং ভক্তি মানদণ্ড হয়। কিন্তু তাদের ইসলামের সাথে সংযোগের মাত্রা মাপতে আমরা যদি তাদের মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতির মাত্রা দিয়ে মাপি, যে ক্ষতি তাদের শিক্ষার কারণে ঘটেছে, তাহলে তারা কম ইসলামিক। সাধারণভাবে বলতে গেলে, অনারব মুসলমানরা ইসলামের সহিংস শিক্ষায় ততটা গভীরভাবে ডোবে না যতটা আরব মুসলমানরা ডোবে। আমি অস্বীকার করিনা যে অনেক অনারব মুসলমান আছে যারা ইসলামের শিক্ষার সাথে যথেষ্ট পরিচিত এবং তার প্রয়োগে আরব মুসলমানদের থেকেও বেশী উৎসাহী। আমি শুধু এটা বোঝাতে চাইছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষা আরব মুসলমানের মনে অনেক বেশী গভীরভাবে প্রবেশ করেছে অনারব মুসলমানদের থেকে। ইসলামি আতঙ্কবাদ প্রতিহত করার পরিকল্পনায় এই বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে। যদিও আরব মুসলমান সারা পৃথিবীর মুসলমান জনসংখ্যর ২০ শতাংশের বেশী নয়, তবু ইসলামের সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে তাদের থেকেই। আরব ইসলামের সংস্কার অনেক বেশী কঠিন অনারব মুসলমানদের সংস্কার করার চেয়ে, কিন্তু সেটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারাই উৎস জনগোষ্ঠী। এই কাজ শুরু করতে হবে আরবের টাকা পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামকে “আরবিকরণ” করার আগে যেমন আফগানিস্তানে তারা করেছে।

এখানে পূর্বের একটি বিষয়ে ফিরে আসি: হিংসা এবং পাঠ্য বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে আচরণ-মনস্তত্ত্বের পরীক্ষাগারে সন্ত্রাসবাদ প্রক্রিয়ার উপর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা। আরবে শুরু থেকেই মুসলিম সংস্কৃতিতে হিংসাকে সর্বস্তরে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতি নিজেকে চাপিয়ে দেয় ভাষার মাধ্যমে, যেহেতু কোন

সম্প্রদায়ের মানুষ ভাষার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত, সেকারণে সংস্কৃতির সাথেও জড়িত।

আমি ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত নই, কিন্তু আমি মনে করি, পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতেই যথেষ্ট প্রকাশপদ্ধতি এবং শব্দ আছে যার দ্বারা ঐ ভাষার মানুষেরা একে অপরকে বুঝতে পারে এবং নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। প্রতিটি ভাষাতেই হ্যাঁ-বোধক এবং না-বোধক প্রকাশ আছে। মুসলিম সংস্কৃতি ভাষাকে এমনভাবে ব্যবহার করে যে না-বোধক প্রকাশভঙ্গীর উপর বেশী জোর পড়ে, যা স্বভাবতই মানুষকে নেতিবাচক মানসিকতায় গড়ে তোলে। এই বিষয়টি এক মূহুর্তে স্পষ্ট হবে যদি কেউ ভাষাতত্ত্বিক গবেষকের চোখে কোরআন বা নবীর বাণীগুলি পড়ে।

আমরা কোরানের একটি অধ্যায় পড়ি এবং বাক্যাংশগুলি লক্ষ্য করি। যদি আমরা সবথেকে দীর্ঘ অধ্যায় সুরা “বাকারাহ” (The Cow ২:১—২৮৬) নিই, আমরা কি দেখি? “তারা অবিশ্বাসী...তারা বিশ্বাস করে না...ভয়ঙ্কর দুর্যোগ...তারা ঈশ্বরকে প্রতারণা করে...তাদের অন্তরে ব্যাধি...তারা মিথ্যা বলে...তারা দুর্নীতিপরায়ণ...এরা তারাই যারা নির্বোধ...তাদের অত্যাচারে..তারা সঠিক পথে চালিত হয়নি...ঈশ্বর তাদের আলো কেড়ে নিয়েছেন...বোবা, কালা এবং অন্ধ...তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া হয়েছে...আগুনকে ভয় করে...ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করে...ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে...তাদের রক্তপাত হবে...শয়তান তাদের পতনের কারণ...তারা আগুনের জন্য নির্দিষ্ট...আমাকে ভয় কর...ঈশ্বরের কঠিন বিচার পাবে...আমরা ফারাও-এর লোকদের ডুবিয়েছিলাম...তোমরা ভুল...তোমাদের উপর বজ্রাঘাত হয়েছে...ঈশ্বরের অভিশাপ...তোমরা পরাজিতদের দলে থাকবে...তোমাদের হৃদয় পাথরের মত শক্ত...তারা দুঃখে পতিত হোক...অপমানজনক শাস্তি...তোমরা অন্যায়কারী...,” ইত্যাদি। উপরন্তু হত্যা এবং তার প্রতিশব্দ এসেছে কমপক্ষে পঁচিশবার এই অধ্যায়ে, যেটি পঞ্চাশ পৃষ্ঠার থেকে বেশী দীর্ঘ নয়।

আমরা যদি কোরানের ইতিবাচক অংশগুলি না ধরি যাদের শেষে নেতিবাচক ধারণা প্রযুক্ত হয়েছে, তারপরও ভাষাতাত্ত্বিক ভঙ্গী থাকে যার প্রভাব ইসলামি শিক্ষার

উপর যথেষ্ট এবং তার অত্যন্ত ইতিবাচক প্রকৃতিতেও নেতিবাচক হিংসাপ্রবণ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। যদি কোন আচরণ-বিজ্ঞানী(Behavioral Scientist) আরব মুসলিমের সাধারণ কথাবার্তা লক্ষ্য করেন, তিনি বিস্মিত হবেন সেই আলাপচারিতায় কিভাবে না-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যখন একজন আরব মুসলিম আপনাকে বলতে চায় "আজ দিনটা সুন্দর", সে বলে, "আজকের থেকে গতকালের আবহাওয়া খারাপ ছিল"। খুব ভদ্রভাবে বললে, কোরআনে হ্যাঁ-বাচক শব্দের যথেষ্ট অভাব আছে যেমন শব্দ কানে মৃদুভাবে প্রবেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লিখিত অধ্যায়ের একটি আয়াত আমরা পড়ি: "তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে যা ঈশ্বর বর্ধিত করেছেন, তারা ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করবে মিথ্যা বলার জন্য" (২:১০)। একজন মুসলমান আমার মন্তব্যে আপত্তি করতে পারেন এই বলে: "এই আয়াতে ঈশ্বর সত্যবাদিতার গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন মিথ্যা বলার শাস্তির উপর জোর দিয়ে"। আমার জবাব: "ঈশ্বর কি সত্যের গুরুত্ব বোঝাতে আরও ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন না?"

ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করেছে। মহম্মদের যে হাদিসে এই নিষেধাজ্ঞা আছে তা পরীক্ষা করলে আমরা কি দেখি? "যে সুদ গ্রহণ করে সে যেন তার মায়ের সাথে সঙ্গম করে"। "যে সুদ গ্রহণ করে সে যেন তেত্রিশবার ব্যভিচার করে"। "যে সুদ গ্রহণ করে সে তার মত ষে সাপ গলাধঃকরণ করে"। "যে সুদ গ্রহণ করে সে শেষ বিচারের দিনে পাগলের মত দাঁড়াবে এবং শয়তানের মত অভিশপ্ত হয়ে ঘুরবে"। আমি এখানে ব্যবহৃত ভাষাকে দেখি এবং নিজেকে প্রশ্ন করি কিভাবে কেউ মনস্তাত্ত্বিকভাবে, নৈতিকভাবে, মানসিকভাবে একজন সুস্থ মানুষকে এই ধরণের শব্দ এবং প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে বিকৃত করতে পারে। "মায়ের সাথে সঙ্গম করে", "ব্যভিচার করে", "সাপ গলাধঃকরণ করে", "পাগলের মত দাঁড়াবে এবং শয়তানের মত অভিশপ্ত হয়ে ঘুরবে"; এই কথাগুলি কি সুদ নিষিদ্ধ করার বার্তা দেওয়ার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়? মুসলমানরা যা পড়ে তারা তারই অপরিবর্তনীয় ফসল। তারা নেতিবাচক মানুষ, এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে তাদের এই নেতিভাব স্পষ্ট।

আম্মান থেকে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার পথে প্লেনে সময় কাটানোর জন্য পাশে বসা আরব মহিলার কাছ থেকে একটা বই নিয়ে পড়ছিলাম। বইটির নাম আরবের প্রেমিক (Arab Lovers)। এতে মুসলিম যুগের প্রথম কয়েক শতাব্দীর আরবদের প্রেম এবং আবেগের গল্প লেখা। বড় হরফে ছাপা মাঝারি মাপের একটা বই। আমি আশা করেছিলাম সুন্দর ভাষায় লেখা কিছু অসাধারণ গল্প পড়ে আনন্দ পাব। কিন্তু আমার আগ্রহ চলে গেল বারবার একটা কথার ব্যবহারে: "তারপর সে তরোয়াল বার করে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুণ্ডুটা কেটে ফেলল"। আমি অবাক হয়ে গেলাম দেখে যে প্রথম ষাট পাতার মধ্যে পঁচিশবার কথাগুলি এসেছে। এটা যদি সত্যি হয় যে কোন প্রেম এবং আবেগের গল্পের বইয়ে মুসলমানরা এভাবে কথা বলে, তাহলে যে কোন মানুষ বুঝবে যখন তারা জিহাদের কথা বলে বা ঈশ্বরের ধর্ম বা তার মাহাত্ম্য রক্ষার প্রয়োজনের কথা বলে তখন কি ঘটে। আরবের মুসলমান জগতে হিংসা এবং যুদ্ধের ভাষা ছড়িয়ে আছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। সাদ্দাম হুসেইনের ইরাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের পাটীগণিত বইয়ে একটি অঙ্ক ছিল: "আমাদের সাহসী যোদ্ধারা ইরাণী শত্রুপক্ষের ১৫০০ জনকে হত্যা করে, ১৮০০ জনকে আহত করে এবং ১৫০ জনকে বন্দী করে। নিহত, আহত এবং বন্দীসহ শত্রুপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ কত?" লাশ গণনা না করে কি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রকে পাটীগণিত শেখানো যায়?

১৯৭৩ সালে আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে মরক্কোর সামরিক বাহিনী সিরিয়ার বাহিনীর সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধের পরে মরক্কোর সেনাদের বীরত্বের প্রশংসা করে গুজব ছড়িয়েছিল, যদিও সেটা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। সিরিয় লোকেরা এগুলি আবিষ্কার করেছিল এই যুদ্ধে মরক্কোর অংশগ্রহণকে প্রশংসা করার জন্য। সকল বয়সের শ্রেণীতে শিক্ষকরা ছাত্রদের কাছে তাদের বীরত্বের কথা প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। আমার মনে আছে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার শিক্ষক কিভাবে ঐ সৈনিকদের বীরত্বের বিশাল বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি ঐ সৈনিকদের একজনকে দেখেছেন যার পকেটে বহু আঙ্গুল, কান, জিভ এবং চোখ যেগুলি নিহত ইজরায়েলী সেনাদের দেহ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।

তারা যখন এইসব “গৌরবময় কাজ”-এর কথা আমাদের বলছিলেন আমরা আনন্দে হাততালি দিয়েছিলাম।

কিছু মানুষ হলিউডের বিরুদ্ধে আমাদের সংস্কৃতিতে আরও বেশী হিংসা ডেকে আনার অভিযোগ করে। হলিউডের সিনেমা আমেরিকান সিনেমা শিল্পের গোটা ইতিহাসে মুসলিম আরব ঐতিহ্যের হিংসার ভগ্নাংশও সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। যে শিশুটি টেলিভিশনে হিংসাত্মক ছবি দেখে তার সাথে অন্য শিশুর পার্থক্য আছে যে তার শিক্ষকের কাছে সে বিষয়ে শোনে বা তার প্রতিদিনের জীবনে চারপাশে হিংসাত্মক ঘটনা দেখে। মুসলিম সমাজ-জীবনের প্রতিটি স্তরে হিংসার সংস্কৃতি দৃশ্যমান। সেই সঙ্গে আছে না-সূচক শব্দ এবং হিংসাত্মক প্রকাশভঙ্গীতে পূর্ণ এক ভাষায় ডুবে থাকার নেতিবাচক প্রভাব।

ইসলামি সংস্কৃতি হিংসাকে ডেকে আনে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে, বাকীটা গোপনে।

আমি আগেই বিশদে বলেছি কোন পটভুমিতে ইসলামের জন্ম: শুষ্ক পরিবেশ, অতি অল্প প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রতিদিনের জীবন অজানা ভয়ে ঢাকা, অধিবাসীরা বেঁচে থাকার উপায় হিসাবে ডাকাতির উপর নির্ভরশীল। এমন পরিবেশের দর্শনই হল “মার অথবা মর”। পরিবেশের মর্মবাণীকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, নেতিবাদ এবং হিংসাকে ব্যবহার করেছে এবং তাকে বৈধতা দিয়েছে, গৌরবান্বিত করেছে।

কোরআনে বর্ণিত ঈশ্বরের সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই আছে যেগুলি ঐ পরিবেশের মানুষদের থাকে। তিনি অত্যন্ত বদরাগী, মেজাজে হিংস্র, অদূরদর্শী, খামখেয়ালী, অমান্য হওয়ার ভয়ে ভীত। তার নির্দেশসমূহে তার ভয় পরিস্ফূট এবং তিনি আক্রমণ করেন অতি নির্দয়ভাবে। যারা তার বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের উপর তিনি ভয়ানক প্রতিশোধ নেন এবং সবাইকে বলেন তাকে সাহায্য করতে যেন তিনি নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। যারা তাকে মান্য করবে তিনি তাদের স্রোতস্বিনী নদী এবং অজস্র ফলে ভরা স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দেন; এবং যারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তাদের ভয়

দেখান যে নরকের আগুনে তাদের ঝলসানো হবে, তাদের চামড়া বদলে দেওয়া হবে আবার নতুন করে ঝলসানোর জন্য। কোরআনে আছে: "যারা আমাদের প্রত্যাদেশ অমান্য করবে আমরা তাদের নরকের আগুনে পোড়াব এবং যখনই তাদের চামড়া পুড়ে শেষ হবে তখনই আবার নতুন চামড়া দেওয়া হবে" (৪:৫৬)। একবার আমি এক মুসলিম শেখকে আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে শুনেছিলাম। তিনি একজন শ্রোতাকে বলছিলেন: "যখন তারা তোমাদেরকে পর্বতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তাদের বল: 'আমার প্রভু তাকে গুঁড়িয়ে দেবেন'" (২০:১০৫)। আমি রাগে প্রায় চুল ছিঁড়ছিলাম যখন তাকে সবিস্তারে ঈশ্বরের ধ্বংস করার ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে শুনছিলাম, যেন তিনি ইরাকে সাদ্দাম হুসেইনের কুর্দ এবং শিয়াদের বীভৎসভাবে ধ্বংস করার ঘটনা বর্ণনা করছিলেন।

কোরআন "শক্তি" এবং "ক্ষমতা"র ধারণার কোন প্রভেদ করে না। দু'টোকে অদ্ভুতভাবে গুলিয়ে ফেলে এবং ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রকাশ শুধু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। দুই ধারণার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কি? একজন মানুষের ক্ষমতা আছে যখন সে পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যে কাজ করা প্রয়োজন তা করতে পারে। সে শক্তি প্রয়োগ করবে তখন যখন সে ক্ষমতাহীন। অন্যভাবে বললে, ক্ষমতা শান্তির প্রতিভু, শক্তি হিংসার।

আরবরা ইসলামের জন্মদাত্রী পরিবেশে বাস করত, পরিবেশের প্রতিকূলতার সামনে তারা ছিল ক্ষমতাহীন, যা তাদের জীবন ও মঙ্গলের অন্তরায় ছিল। তারা এতটাই অসহায় বোধ করত যে তারা একটা শক্তির প্রয়োজন অনুভব করেছিল এবং এক ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছিল যে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করবে। যখন আরব পুরুষ তার ক্ষমতা হারাল সে প্রয়োজন অনুভব করল এক শক্তিশালী ঈশ্বরের। সে তার প্রয়োজন অনুসারে এক শক্তিশালী ঈশ্বরকে সৃষ্টি করল—কিন্তু সেই ঈশ্বর ক্ষমতাবান ছিলেন না। একজন ক্ষমতাবান ঈশ্বর, একজন ক্ষমতাবান মানুষের মত রাজ্যশাসন করেন ভালবাসা, শান্তি, সহানুভূতি এবং দয়া দিয়ে,—হত্যা, অনমনীয়তা আর আভ্যন্তরীন যুদ্ধ দিয়ে নয়। একজন ক্ষমতাশালী ঈশ্বর কখনো ভয় পান না যে তার প্রভাব বা উদ্দেশ্য

কোন বিদ্রোহের দ্বারা ছোট হতে পারে। তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি হিংসা প্রয়োগ করেন না। এটাই মুসলমান ঈশ্বর এবং প্রকৃত ঈশ্বরের পার্থক্য, অবশ্য যদি কেউ থেকে থাকে! ইসলামের ঈশ্বর বলপ্রয়োগ করে, কিন্তু তার কোন ক্ষমতা নেই।

আমরা একটু চিন্তা করে দেখি: কে বেশী শক্তিশালী, মাদার টেরেসা না কি পাহাড়চূড়ায় বসে থাকা দৈত্য? অবশ্যই মাদার টেরেসা দুজনের মধ্যে বেশী শক্তিশালী কারণ কোন বলপ্রয়োগ না করেই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে পারতেন। কিন্তু কার বলের পরিমাণ বেশী, দৈত্য না কি মাদার টেরেসা? স্বাভাবিকভাবেই দৈত্য, কারণ মানুষকে ধ্বংস করতে সে তার দাঁত-নখ ব্যবহার করে। আমরা কোরআনের এই আয়াতটিকে দেখি: “হে নবী, বিশ্বাসীদের অস্ত্র হাতে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কর। যদি তোমাদের বিশজন ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে তারা দু'শোজনকে পরাস্ত করবে; আর যদি একশোজন থাকে, তারা এক হাজার অবিশ্বাসীকে ধ্বংস করবে; কারণ তাদের কোন বোধশক্তিই নেই” (৮:৬৫)। একজন ঈশ্বর কখন তার অনুসারীদের যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন? তিনি তা করেন যখন তিনি শান্তিপূর্ণভাবে তার বাণীর প্রসার ঘটাতে অক্ষম। মানুষ যখন তার ঈশ্বরকে আত্মীকরণ করে, তারা অন্যদেরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করে যখন তারা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং শান্তিপূর্ণভাবে কর্তব্যসাধনে অক্ষম হয়। অর্থাৎ শক্তিই ক্ষমতার একমাত্র বিকল্প! যতক্ষণ একজন মানুষের ক্ষমতা থাকে, সে ধর্মীয়, বিজ্ঞানভিত্তিক বা দর্শনসংক্রান্ত যেমনই হোক; সে আমাদের ক্ষমতার অস্ত্র দিতে পারে, শক্তি প্রয়োগে উৎসাহিত করবে না। কোন মতবাদ, ধর্মীয় হোক বা না হোক, নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম, সেই মতবাদে বিশ্বাসীদের তাকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয় না।

আমি আগেই লিখেছি, ইসলাম ঈশ্বরের উপর যে বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে সেগুলি এইরকম “ক্ষতিসাধনকারী”, “প্রতিশোধ গ্রহণকারী”, “বাধ্যকারী”, “রক্ষক”, এবং “উদ্ধত”। যে কেউ এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিচার করবে তার মনে হবে এগুলি এমন একজনের জন্য যে ক্ষমতাহীণ এবং কোন কাজ করতে সে বলপ্রয়োগ করে। সিরিয়ার লেখক নাবিল ফায়াদ বলেছেন: “যে মতবাদ যত ভঙ্গুর, তার সমর্থকরা তত

বেশী ভীতিপ্রদ"। কোন ভাল মতবাদের কোন রক্ষকের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই তার সাফল্য এবং স্থায়ীত্বকে নিশ্চিত করতে পারে। কোন দুর্বল মতবাদ নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়, এবং শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে পড়ে থাকে কারণ কারোরই তাকে প্রয়োজন নেই। মতবাদ হল পণ্যের মত, ইতিহাসের বাজারে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে এবং চাহিদা ও যোগানের নিয়ম অনুসরণ করে। এই প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে আমরা ভাল মতবাদই চাই এবং আমাদের প্রয়োজনই তাদের অস্তিত্ব এবং স্থায়ীত্বকে নিশ্চিত করে।

একজন ক্ষমতাহীণ মানুষ যে কোন খারাপ মতকে সমর্থন করে যা তাকে বলপ্রয়োগের সুযোগ দেয় এবং তাকে রক্ষা করতে জীবন পর্যন্ত বাজী রাখে। এমন মানুষকে আপনি কখনোই তার মতের দুর্বলতা বোঝাতে সক্ষম হবেন না যতক্ষণ না আপনি তাকে ক্ষমতা ফিরে পেতে সাহায্য করছেন। মুসলিমরা যে বাস্তবতায় বেঁচে থাকে তার সাধারণ বিশ্লেষণেই ইসলামি শিক্ষার অসারতা স্পষ্ট হয়। এই শিক্ষা ধৈর্যশীল, উর্বর, সৃষ্টিশীল মানুষ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। আরব জগতে সময় থমকে আছে, ক্যালেণ্ডার আটকে আছে সপ্তম শতাব্দীতে। মুসলমানরা সবকিছু হারিয়েছে, পরিচয় বাঁচাতে আছে শুধু ইসলামি শিক্ষা যা তারা আগের থেকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছে। মুসলমান এবং যে শিক্ষা তারা বিশ্বাস করে, পরস্পরকে এক চক্রাকার পথে তাড়া করে চলেছে। শিক্ষা তার পশ্চাদ্ধাবন করে, সে সেই শিক্ষা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায় না অনুসরণ করার। তারা তাকে সর্বনাশের কিনারায় নিয়ে যায়, কিন্তু তার ব্যর্থতা শুধু সেই শিক্ষার উপর নির্ভরতাকেই বাড়িয়ে দেয়।

*ইসলামে প্রচলিত প্রথা হল যখন আপনি কোন ঘরে প্রবেশ করবেন, ডান পা প্রথমে ফেলবেন; একমাত্র শৌচালয় ছাড়া, কারণ তাকে মনে করা হয় "অপবিত্র জায়গা"।

ইসলাম এক বন্ধ বাজার

শুরু থেকেই ইসলাম গায়ের জোরে তার শিক্ষাকে সমর্থন করে এসেছে। সে শক্তিপ্রয়োগ করেছিল কারণ তার প্রয়োজন ছিল ক্ষমতা দখলের। যেসব মত তার কার্যক্রমের সাথে মেলে না তাদের দূর করতে সে শক্তি ব্যবহার করেছিল, এবং মানুষকে দৃঢ়ভাবে আটকে রেখেছিল খাঁচায়। সে উৎকর্ষতার সূত্র, এবং চাহিদা ও যোগানের নিয়ম বাতিল করেছিল। তার বাজারে তার পণ্য ছাড়া আর কোনও পণ্যকে সে ঢুকতে দেয়নি। কোরআন এবং নবী মহম্মদের জীবন, কর্ম ও বাণীই ছিল জ্ঞানের একমাত্র উৎস এবং আইনের ভিত্তি। ইসলাম এই উৎসগুলিকে শক্তিপ্রয়োগ করে চাপিয়ে দিয়েছিল এবং অন্য কোন কিছুকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়নি। সময়ের সাথে উৎসগুলি তাদের প্রভাব হারিয়ে ফেলে, কারণ তারা নতুন যুগের মতবাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি।

যখন কোন মতবাদ সময়ের উপযোগী থাকে না, সে তার উৎকর্ষতা হারায় এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। সে যত বেশী ভঙ্গুর হয়, ততই সে তার অনুসারীদের সময়কে অবহিত হওয়ার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে। মুসলিমরা তাদের নীতির খাঁচায় বন্দী, তাদের শিক্ষার কারণে তারা অসহায় বোধ করে। পক্ষান্তরে, এই অসহায়তাবোধের কারণে আরও বেশী করে তারা ঐ শিক্ষার উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আরব মরুর বাসিন্দারা তাদের অনুর্বর পরিবেশের কারণে এত ভীত ছিল যে তারা কোন চিন্তাধারাকে উন্নত বা প্রাণবন্ত করতে অক্ষম ছিল। যে ভয় মুসলিমদের বেষ্টন করে রেখেছিল সেই ভয়ই তাদের আজকের দিনে পৌঁছে দিয়েছে। একই ভাবনা দিয়ে মানুষ কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না যে ভাবনা প্রথমে সেই

সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। চৌদ্দটা শতাব্দী মুসলমানদেরকে তাদের শিক্ষার অসারতা বোঝাতে পারেনি এবং আজও তারা মানে না যে তাদের ক্ষমতাহীণতা বা পশ্চাৎপরতার জন্য তাদের শিক্ষাই দায়ী। এই শিক্ষা তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বা নৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি ঘটাতে পারেনি এবং তারা একই বাস্তবতায় বন্দী হয়ে আছে, স্থান এবং কাল বদলে যাওয়া সত্ত্বেও।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এই শিক্ষা কাজের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়নি। কাজ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা আবদ্ধ ছিল শুধু যাযাবরের মত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া, ডাকাতি, লুঠের মাল, এবং জীবনযুদ্ধের মধ্যে। ইসলাম তার অনুসারীদের নদী, ফল, মদ এবং দুধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু কূপখননে, ফল উৎপাদনে, বা পশুপালনে উৎসাহিত করেনি। এর শিক্ষা মানুষকে শিখিয়েছে জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং জীবনের সার্থকতা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনায়। এই শিক্ষা পরকালের দৃশ্য এবং স্বর্গের উদ্যান দেখিয়ে প্রতারণা করেছে, তারা এই প্রতারণার উপরে জীবন কাটিয়েছে পরবর্তী জীবনের অপেক্ষায়। আজও তারা সেটাই করে।

কোরানে আছে: "এই স্বর্গ বিশ্বাসীদের জন্য প্রতিশ্রুত। সেখানে বয়ে যাবে বিশুদ্ধ জলের নদী, তাজা দুধের নদী, সুস্বাদু মদের নদী, পরিশুদ্ধ মধুর নদী। সেখানে তারা খাবে সব রকমের ফল এবং লাভ করবে ঈশ্বরের ক্ষমা। তারা কি তাদের মত যারা নরকে থাকবে এবং পান করবে ফুটন্ত জল যা তাদের নাড়ীভূঁড়িকে ছিঁড়ে দেবে?"(৪৭:১৫)। অন্য একটি আয়াতে আছে: "এই পৃথিবীর জীবন খেলা-তামাশা মাত্র। যারা আল্লাহর উপাসনা করে তাদের জন্য পরজীবন অবশ্যই উত্তম" (৬:৩২)। অর্থাৎ মুসলিমের জন্য এই পৃথিবীর জীবন নিতান্তই মূল্যহীণ। তারা ক্ষণকালের জন্য এখানে আছে, এবং ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত আর কোন দায়িত্ব নেই যার ফলে পরজীবনে তারা স্বর্গসুখ উপভোগ করতে পারে।

ঈশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করার আহ্বানই এ দায়িত্বের প্রধান অংশ, কোরানের এই আয়াতে সেটি স্পষ্ট: "যারা ইহকালের বিনিময়ে পরকাল ক্রয় করেছে, আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করে, তাতে মৃত্যুবরণ করে অথবা বিজয়ী হয়, তাদের জন্য আছে উত্তম

পুরস্কার” (৪:৭৪)। মুসলমানরা যুদ্ধ ছাড়া আর কোন দায়িত্বের কথা বোঝে না। তারা আজও বিশ্বাস করে পরকালে স্বর্গে প্রবেশের নিশ্চিত উপায় জিহাদ। যখন মানুষ তার কাজের জন্য কোন দায়িত্ব বহন করে না, তারা মানতে পারে না তারা অন্যায় করতে পারে, ফলে কোন অন্যায়ের জন্য তাদের অপরাধবোধও থাকে না।

ইসলাম মনে করে যুদ্ধের দায়িত্ব সীমার বাইরে একজন মুসলমানের যা কিছুই ঘটে তা ভাগ্য, যার উপরে তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, অতএব কোন দায়িত্বও নেই। ইসলামি শিক্ষা মুসলমানদের এই বিভ্রমে রাখে যে তার ভাগ্য পূর্বনির্দিষ্ট। ইসলামি শিক্ষায় তাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে জীবনে যা কিছুই ঘটে তা পূর্বনির্ধারিত এবং তা বদলানোর কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। কোরানে আছে: “বল: ‘আল্লাহ যা স্থির করে রেখেছেন তার বাইরে কোন বিপদই ঘটবে না’” (৯:৫১)। মহম্মদ একটি হাদিসে বলেছেন: “যদি তোমার কিছু ঘটে, বোল না: ‘আমি যদি এমন করতাম তাহলে এই হত’ বরং বল: আল্লাহ এমনটাই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন সেটাই করেন’”।

ভাগ্যনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি এই আত্মসমর্পণ জন্ম দেয় পরনির্ভরশীল মনোভাবের এবং মানুষ মনে করে তাদের জীবনে যা কিছু ঘটে সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং আদেশ। এই মনোভাব মুসলমানদের বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে সাহায্য করে এবং বহুলাংশে সেই ঘৃণ্য বাস্তবের প্রতি অপরাধ বোধ করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে। মুসলিমরা কখনও আত্ম অনুসন্ধান করতে শেখেনি অথবা তারা যে ভুল করেছে তা স্বীকার করতেও শেখেনি। তারা মনে করে যা কিছু ঘটে সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে এবং তাদের বিশ্বাসের কারণে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করারও প্রয়োজন হয় না অথবা তাদের কৃতকর্মের ফলাফলের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে না।

একটা উদাহরণ দিই: হাসান নাসরাল্লাহ লেবাননের একজন শিয়া মুসলিম ধর্মপ্রচারক। তিনি তার দেশের আইনভঙ্গ করেছেন, সরকারের ইচ্ছার বিরোধিতা করেছেন, এবং তার সমর্থকদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গড়েছেন। অনেকেই মনে করতে পারেন এটাতো একটা সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ কাজ; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে

পৃথিবীতে সামান্য বোধ সম্পন্ন একজনও আছেন যিনি তার দলের যে নাম দিয়েছেন তাকে সমর্থন করবেন। তিনি দলের নাম দিয়েছেন: হেজবোল্লাহ যার অর্থ "ঈশ্বরের দল"। তিনি তার দলের যে নাম স্থির করেছেন তা থেকে তার চিন্তার গতি প্রকৃতি বোঝা যায়। আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি বা না করি সেটা অনাবশ্যক। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে একজন মানুষ ঈশ্বরের উপর একচেটিয়া অধিকার দাবী করছে এবং একটি দলে ঈশ্বরের সাথে নিজেকে এক আসনে বসাচ্ছে। এই লোকটি অন্যের বেঁচে থাকার অধিকারকে সম্মান করে না এবং মানুষের জীবনকে মূল্যবান মনে করে না। সে মনে করে সে পৃথিবীতে এসেছে আল্লাহর ধর্মবিস্তারের জন্য যুদ্ধ করতে এবং সে হত্যা করুক বা নিহত হোক অনন্তকাল স্বর্গের সুখ উপভোগ করবে। সে তার লাভের হিসাব করে শত্রুর ক্ষতির পরিমাপে কিন্তু নিজে যে ক্ষতি স্বীকার করে, সে সম্পদ হোক বা মানুষের জীবন, সে বিষয়ে গ্রাহ্যই করে না।

নাসরাল্লাহ প্রথম থেকেই জানতেন যে তিনি একটা সর্বনেশে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, তবু তিনি এবং তার অনুগামীরা লেবাননকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বিশাল বিপর্যয়ের যুদ্ধে ঠেলে দিল। সেই যুদ্ধে ১০০০ জনের মৃত্যু হল, ৫০০০ আহত এবং ১০ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হল। যুদ্ধবিরতির দিন সন্ধ্যায় তিনি ঘোষণা করলেন তিনি ইজরায়েলকে হারিয়ে দিয়েছেন এবং তার এই জয়কে তিনি উৎসর্গ করলেন লেবানন এবং ইসলামি জাতির উদ্দেশে। এটাই বিজয় সম্বন্ধে মুসলিমদের ধারণা।

নাসরাল্লাহ এবং তার অনুগামীরা একশ' জন ইহুদীকে হত্যা করেছিল, তার মতে এর থেকে বড় জয় আর হয় না। কোরআন বলে: "আল্লাহ স্বর্গোদ্যানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিশ্বাসীদের জীবন এবং পার্থিব সম্পদ কিনে নিয়েছেন। তারা তার জন্য যুদ্ধ করবে, হয় হত্যা করবে অথবা নিহত হবে" (৯:১১১)। অতএব যুদ্ধে মুসলমানদের উদ্দেশ্য, হয় তারা শত্রুকে হত্যা করবে অথবা শত্রু দ্বারা নিহত হবে এবং তারা মনে করে উভয়ক্ষেত্রেই তারা জয়ী। যদি মুসলমান তার শত্রুকে হত্যা করে তবে সে বিজয়ী, কিন্তু শত্রু যদি তাকে হত্যা করে তখন মুসলমানের জয় আরও গৌরবের; কারণ শত্রুর এই কাজ তাকে আরও দ্রুত ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

হাসান নাসরাল্লাহ তার কাজের দায় নিতে অক্ষম, সেকারণে তার কাজের ফলে যা ঘটেছে তার জন্য কোন অপরাধবোধ অনুভব করে না। একহাজার মানুষ মারা গিয়েছে, ৫০০০ আহত হয়েছে, ১০ লক্ষ মানুষ গৃহহীণ হয়েছে—এসবের কোন গুরুত্ব নেই ইজরায়েলের একশ' মানুষ নিহত হওয়ার তুলনায়। এই হল তাদের দর্শন যারা ঈশ্বরের উপর একচেটিয়া অধিকার দাবী করে এবং তার সাথে দল গঠন করে। তারা ঈশ্বরকে সামরিক উর্দি পরিয়েছে, মাথায় হেলমেট চাপিয়ে দিয়েছে এবং টেনে পরিখাতে নামিয়েছে তাদের সাথে শত্রু নিধনের কাজে। এই মানসিকতার বিরুদ্ধে কে লড়তে পারে? যে লোক অন্য মানুষের মৃত্যুর চেয়ে নিজের মৃত্যুকে বেশী চায় তার সাথে কে যুদ্ধ করতে পারে?

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের বড়রা একটা কথা খুব বলতেন: "আমাদের শত্রুরা জীবনকে যতটা ভালবাসে ঠিক ততটাই আমরা মৃত্যুকে ভালবাসি"। যে মানুষ মৃত্যুর সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত সে মানুষ নয়, কারণ একজন মানুষের মনুষ্যত্ব অপূর্ণ যদি না সে জীবনকে সম্মান করে এবং তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা না করে। একজন লেবাননের মহিলা, যে ইজরায়েল এবং হেজবোল্লার সাম্প্রতিক যুদ্ধে দুই মেয়ে, দুই বোন, তার ভাই এবং বাবা-মাকে হারিয়েছে তার বলা কথা লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস অক্ষরে অক্ষরে ছেপেছিল—"আমি এখন সুখী, কারণ তারা সবাই স্বর্গে প্রবেশ করেছে"। যদি সারা পৃথিবী এই জীবনকে ঘৃণা করার সংস্কৃতিকে বদলাতে না পারে এবং মানুষকে আরও মানবিক ও যুক্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে তবে আতঙ্কবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ইসলামের প্রথায় দায়িত্ববোধের কোন জায়গা নেই। চৌদ্দ শতাব্দী পরে মুসলিম জাতি সকল জাতির একেবারে নীচে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের এই অবনতির জন্য তাদের দায়িত্ব স্বীকার করে না, অথচ যে কোন যুক্তিবোধসম্পন্ন মানুষ এর জন্য নিজেদেরকে দোষী ভাবত।

মানুষ তখনই নিজেকে দোষী ভাবে যখন সে দায়িত্ব স্বীকার করে এবং মেনে নেয় যে সে ঠিকমত সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। মুসলমান পুরুষ এমন এক সংস্কৃতির সৃষ্টি যে সংস্কৃতি জানেই না কিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় এবং সেই মানুষ তার ব্যর্থতায় কোন দায়বদ্ধতা অনুভব করে না। আপনি যদি তার সাথে সারা জীবন কাটান তবু অত্যন্ত বিশ্রী ব্যর্থতাতেও কখনও তার মধ্যে কোন অপরাধবোধ দেখবেন না। ব্যর্থতার মুখোমুখি হওয়া এড়াতে মুসলমান পুরুষ "শিকারী ও শিকার" খেলা খেলে। সে নিজে শিকার, এবং সারা পৃথিবী যেন তাকে খেতে আসছে!

ইসলামের শুরু থেকেই মুসলমানরা পৃথিবীকে দু'টো ভাগে ভাগ করে রেখেছে—তারা এবং অন্যরা—এবং আজও তারা সেটাই করে। তারা যুক্তিবোধসম্পন্ন, শান্তিপ্রিয়, এবং প্রবল ধর্মবিশ্বাসী আর অন্যেরা বোধশক্তিশূন্য, নীতিহীন এবং ধর্মবিদ্বেষী আতঙ্কবাদী। তারাই হত্যার শিকার আর অন্যেরা হত্যাকারী। যদিও তারা গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে তাদের এবং তাদের ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রকারী বলে অভিযোগ করে, বস্তুত ইহুদীরাই তাদের বলির পাঁঠা হয়েছে ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে।

মুসলিম শিশুরা তাদের দশ বছর বয়স হওয়ার আগেই যে শব্দটি বারবার শোনে সেটি হল ইহুদী । এটা তাদের শোনা শব্দের মধ্যে সব থেকে কঠিন শব্দও বটে। কারণ তাদের কল্পনায় শব্দটি হত্যা, বঞ্চনা, মিথ্যা এবং দুর্নীতির দৃশ্য জাগিয়ে তোলে। যখন দুজন লোক ঝগড়া করে, একে অপরকে গালি দেয় ইহুদী বলে।

যখন কেউ অন্য কাউকে কুৎসিৎ বলতে চায়, সে বলে তাকে ইহুদীর মত দেখতে। আমরা আমাদের সামরিক ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপরতা, কারিগরী নির্ভরশীলতার জন্য ইহুদীদের "দায়ী" করি। আমরা বিশ্বাস করি ইহুদীরা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে গোটা পৃথিবী তাদের তালে নাচে, এবং আমাদের কবল থেকে মুক্তি চায়। যখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি, আমাদের শিক্ষক জাতীয় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের নিয়ে একটি নাটকের মহড়া দিচ্ছিলেন। তিনি আমাকে গোল্ডা মায়ারের ভূমিকায় নির্বাচন করেছিলেন, যিনি তখন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষক

আমাকে অভদ্র এবং কুৎসিৎ গলায় কথা বলতে বলছিলেন এবং খুব খারাপ পোষাক পরতে বলেছিলেন যাতে তিনি যেমন ভেবেছিলেন আমাকে তেমনই দেখতে লাগে। আমার মনে হল যেন আমার উপর বজ্রাঘাত হয়েছে। আমার শিশুমন এ ঘটনা মানতে পারছিল না। আমি শিক্ষকের পরামর্শে ব্যক্তিগতভাবে অপমানিত বোধ করেছিলাম, যা আমার কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম: আমাকে গোল্ডা মায়ারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে? আমার মনে হল তার এই অনুরোধ আমার সহপাঠীদের সামনে আমাকে অপমান করল, আমি কোনভাবেই তা মানতে পারলাম না। পরদিন সকালে আমি অসুস্থ হওয়ার ভান করলাম এমন কি চেষ্টা করে বমিও করেছিলাম। আসলে কি ঘটেছে সেটা না জেনে মা আমাকে বাড়ীতে থাকতে বললেন, আমি বেঁচে গেলাম একটা ছোট বাচ্চা মেয়ের ক্ষমতার বাইরের কোন কাজ করা থেকে। আজও যখনই ঘটনাটা আমার মনে পড়ে, আমি ঠিক সেদিনের মতই কষ্ট পাই। আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি: এ কেমন নৈতিকতা, একটা শিশু ক্ষোভে, ঘৃণায় ফুটতে থাকবে, আর আপনি তার শিক্ষক হয়ে শিশুটির মানসিক চাপ না বুঝে যে কাজ সে করতে পারবে না বা বুঝবেও না সেটাই তাকে করতে বলবেন? যে ক্ষোভ আমার শিশুমনে জন্মেছিল তা আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে আমার প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত।

আমেরিকাতে আমার প্রথম সপ্তাহে আমি এবং আমার স্বামী হলিউডে গিয়েছিলাম। আমাদের মনে হল এ যেন পৃথিবীর কোন জায়গা নয়, যেন অন্য কোন গ্রহের, যা কোনদিন দেখব বলে ভাবিনি। ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা জুতোর দোকানে গেলাম এবং জুতো দেখতে শুরু করলাম। আমার স্বামী দোকানের ভদ্রলোকের মধ্য প্রাচ্যীয় শারীরিক গঠন দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কোথা থেকে এসেছেন।

উত্তরে তিনি বললেন, “আমি একজন ইজরায়েলের ইহুদী”।

তিনি কি বলেছেন আমি ভাবলাম না। আমার হাতের জুতোটা ফেলে দিয়ে একপাটি পরেই দোকান থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করলাম যেন কোন বন্য প্রাণী আমাকে তাড়া করেছে।

আমার স্বামী অন্য জুতোটি নিয়ে দৌড়ে এসে চিৎকার করে বললেন: "কি হয়েছে, নির্বোধ কোথাকার?"

আমি কাঁপতে কাঁপতে বলললাম: "ও একটা ইহুদী, আর তুমি ওর দোকানে আমাকে বসতে বলছ?"

আমেরিকাতে আসার দু'বছর পরে, তখনও আমার রাগ কমেনি, আমার পুত্রের শিক্ষক বড়দিনের দু'দিন আগে আমাকে ডেকে বললেন, "ওয়াফা, যদিও আমি নিজের ইচ্ছায় ইহুদী, আমি আমার প্রত্যেক ছাত্রকে ক্রিসমাস উপহার দিই। আমি জানি তুমি মুসলমান এবং আমি কোনভাবেই তোমাকে বিব্রত করতে চাই না—আমি যদি তোমার ছেলেকেও উপহার দিই তোমার কি আপত্তি আছে?"

সেসময়ে আমার কোন ধারণা ছিল না "নিজের ইচ্ছায় ইহুদী" বলতে তিনি কি বোঝাচ্ছেন, যেহেতু আমি ভাবতে পারতাম না যে মানুষ তার ধর্ম পছন্দ করে নিতে পারে, কিন্তু আমি যখনই শুনলাম "আমি ইহুদী", আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম এবং কোন উত্তর দিতে পারিনি।

আমি মনে মনে বলছিলাম: আমার ছেলের শিক্ষক একজন ইহুদী? কি দুর্ভাগ্য! আমি তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করলাম যদি তিনি অসন্তুষ্ট হওয়ার মত সামান্য কিছুও করেন তাহলে স্কুল বোর্ডের কাছে তার বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ আনব। কিন্তু মিস স্পার্কস, আমার ছেলের শিক্ষক, গোটা দ্বিতীয় বছরে প্রমাণ করতে পারলেন না যে তিনি স্বর্গ থেকে প্রেরিত দেবদূত ছাড়া অন্য কিছু, যিনি নেমে এসেছেন আমার কানে-কম-শোনা ছেলেকে বিশেষভাবে সাহায্য করার জন্য।

যদিও আমার এমন অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, তবু আমার জন্মভূমিতে বত্রিশ বছর ধরে তৈরী হওয়া ভাবনার পরিবর্তন ঘটেনি, যে ভাবনা অনুযায়ী আমার মনে হত ইহুদীরা অপরাধী যারা শুধু হত্যা আর চুরি করে। একদিন আমার স্বামী বাড়ী ফিরে তার দুর্ভাগ্যের কথা বলছিলেন। তিনি তার গাড়ীটি এক ভদ্রলোককে বিক্রি করেছিলেন এবং ভদ্রলোক একটি পাঁচশ' ডলারের চেক দিয়েছিলেন। চেকটি নেওয়ার পরে তিনি জানতে পারেন ভদ্রলোক ইহুদী। তিনি আমাকে বললেন যে সম্ভবত চেকটি বাউন্স করবে। কিন্তু এটাই গল্পের শেষ নয়। আমি পরের দিন আবিস্কার করলাম যে ভুল করে চেকটি পকেটে থাকা অবস্থায় স্বামীর জামাটি কেচে ফেলেছি এবং কয়েক টুকরো ছেঁড়া কাগজ ছাড়া চেকটির আর কোন অস্তিত্ব নেই। আমার স্বামী পরদিন ক্রেতা ভদ্রলোককে ডেকে ঘটনাটা বললেন। আধঘন্টার মধ্যে তিনি আমার স্বামীর কাজের জায়গায় এসে নগদ পাঁচশ' ডলার দিয়ে মজা করে বললেন, "ওহে! তোমার স্ত্রীকে বিশ্বাস কোরো না! পরেরবার কিন্তু আমি আর টাকা দিতে পারব না"।

আমরা মায়ের দুধের সাথে ইহুদী এবং তাদের সহযোগীদের প্রতি ঘৃণা পান করেছি। আমরা এক ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব বানিয়ে সেই ঘৃণাকে যুক্তিগাহ্য করেছি এবং যে আমাদের মতের বিরোধিতা করেছে তাকে ইহুদীদের দালাল বলেছি। এই ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব মুসলমানদের এমন এক আলখাল্লায় আটকে রেখেছে যার মধ্যে ইসলাম তাদের মনকে বন্দী করে রেখেছে।

বর্তমান অচলাবস্থার বাইরে কোন নতুন চিন্তা বা উপায়ের কথা যে কেউ বলতে চেষ্টা করেছে, তারা তাকে আন্তর্জাতিক ইহুদী ধর্মের দালাল বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি; এই অভিযোগের ভয়ই কোটি কোটি মুসলমানকে তারা যা শিখেছে তা পুনর্বিবেচনা করতে বাধা দিয়েছে। আমার একজন পাঠকের সাথে কিছু ই-মেইল বিনিময় হয়েছিল। তিনি একজন ইরাকে বসবাসকারী মুসলমান বিচারক, আমার লেখার খুব প্রশংসা করতেন। আমার মনে হত তিনি একজন উদারমনের সংস্কৃতিবান মানুষ এবং বহুবার তিনি ইসলামি বিষয় নিয়ে লিখতে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

একবার আমি খুব অবাক হয়েছিলাম যখন তিনি আমাকে ইজরায়েল-প্যালেষ্টাইন সংঘর্ষ নিয়ে কিছু না লিখতে সাবধান করলেন পাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে আমি ইহুদীদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী। আমি তাকে উপদেশের জন্য ধন্যবাদ দিলাম, যদিও তা মানতে অস্বীকৃতি জানালাম এবং ব্যাখ্যা করে বললাম আমি নিশ্চিত যে এই সংঘর্ষের কারণ ধর্মীয় এবং এর উৎপত্তি ইহুদীদের প্রতি নবী মহম্মদের শত্রুতা থেকে।

একটা বার্তায় আমি তাকে কোরানের একটি আয়াত মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যাতে বলা হয়েছে: "ইহুদীরা বলে: 'আল্লাহর হাত শৃঙ্খলাবদ্ধ'। তাদের হাত শৃঙ্খলাবদ্ধ হোক! তারা যা বলে তার জন্য তারা অভিশপ্ত হোক। তাঁর দুই হাতই সর্বদা মুক্ত" (৫:৬৪)।

আমি তাকে জজ্ঞাসা করেছিলাম, "এটা কি যুক্তিসম্মত? যখন এই আয়াতটি আপনি ছেলেকে পড়ে শোনাবেন তখন তাকে কি বলবেন? আপনি কেমন করে তাকে বোঝাবেন ইহুদীদের সাথে আমাদের সমস্যার কারণ ইহুদীদের দ্বারা প্যালেস্টাইন অধিগ্রহণ, যে অধিগ্রহণের চৌদ্দশ' বছর আগে তাদের প্রতি ইসলামের আচরণই প্রকৃত কারণ নয়?" বিচারক ভদ্রলোক আমার সাথে একমত হলেন এবং অনেকটাই বুঝেছেন বলে মনে হল, তবু তিনি বললেন যে তিনি ভয় পাচ্ছেন যদি আমি ঐ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করি তাহলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠবে যে আমি ইহুদী এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত।

ইহুদীদের প্রতি ইসলামের সার্বিক মনোভাবই মুসলমানদের ষড়যন্ত্রের তত্ত্বকে সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। যে কেউই ইসলামের বিশ্বাসযোগ্যতা বা নৈতিকতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে তার বিরুদ্ধেই এই তত্ত্বকে অস্ত্র হিসাবে তারা ব্যবহার করেছে। এই অস্ত্রের সাহায্যেই তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে অনেকাংশে সফল হয়েছে।

প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই শিক্ষিত করতে হবে

যে পরিবেশ ইসলামকে জন্ম দিয়েছিল সেখানে বসবাসকারী মানুষরা ছিল ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, যার ফলে প্রতিটি অনাগত মূহুর্ত তাদের কাছে ছিল যেন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পটভুমি। মানুষ ঘুমাতে যেত এবং জেগে উঠত এই আশঙ্কা নিয়ে যে তাদের গোষ্ঠী অন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হতে যাচ্ছে। তাদের কল্পনায় শুধু একটাই বিষয় মার অথবা মর। যখন ইসলাম এল, সে এই ভয়ের আগুনকে আরও বাড়িয়ে দিল। অন্য গোষ্ঠীর মানুষকে মুসলমানদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রতি বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করল, তারা যেন মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে। অন্যদের সাথে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল অবিশ্বাস আর সন্দেহের উপর। অবিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল কোন সম্পর্ক যুদ্ধে শেষ হতে বাধ্য। অনিশ্চিত পরিবেশে বাস করা মানুষ তার চারপাশের যে কোন উত্তেজক ঘটনাকেই সন্দেহের চোখে দেখে এবং সব ঘটনাকেই তার সন্দেহ আর অবিশ্বাসের প্রমাণ বলে মনে করে।

ইসলাম পূর্ববর্তী সময়ে আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম ছিল পৌত্তলিক, ইহুদী এবং খ্রীষ্টান ধর্ম। যখন মহম্মদ তার বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন, যারা তাকে অনুসরণ করল না তিনি তাদের ভীতিপ্রদর্শন করলেন। তিনি মানুষকে দু'টো দলে ভাগ করলেন। প্রথম দল হল যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলকে বিশ্বাস করে এবং তারা শান্তিতে ও নিরাপদে "শান্তির নীড়"-এ অর্থাৎ স্বর্গে বাস করবে। দ্বিতীয় দল যারা বিশ্বাস করবে না তারা অমুসলিম এলাকায় চিরস্থায়ী যুদ্ধে দিন কাটাবে।

তিনি পৌত্তলিক, ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের উপর তার রাগ উগরে দিয়েছিলেন। এই তিন গোষ্ঠীর প্রতি তার আচরণ ছিল তাদের শক্তি অনুযায়ী। প্রথম থেকেই তিনি পৌত্তলিকদের জন্য মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন বিকল্প রাখেননি যদি তারা নিজেদের ধর্মকে ধরে রাখতে চায়। তিনি বলেছিলেন ওরা দুর্বল, ওদের তুচ্ছ করা যায়। ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী এবং সুসংহত ছিল, সে কারণে নিজের স্বার্থে তাদের সাথে তিনি আপোষের মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাদের প্রতি নরম মনোভাব দেখিয়েছিলেন এবং স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাদের ধর্ম স্বর্গীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত। তাদের প্রতি তার ভয়ঙ্কর মনোভাব ধীরে ধীরে তীব্র হল যখন তার অনুসারী এবং ঐ দুই ধর্মের অনুসারীদের ক্ষমতার সমতা বিলুপ্ত হল।

আপনি যদি ইতিহাস এবং ইসলামের শিক্ষা পড়েন, আপনি অনুভব করবেন প্রাথমিকভাবে খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের প্রতি ইসলাম অনেক নমনীয় এবং কম শত্রুভাবাপন্ন ছিল যেহেতু তারা তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলিকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু যদি কেউ সমালোচকের চোখে খুঁটিয়ে ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন তবে দেখবেন ইসলাম উভয় ধর্মের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং অনুসারীদের উপর পবিত্র কর্তব্য হিসাবে চাপিয়ে দিয়েছে: কেয়ামত(End of Days) পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

ইসলামি শিক্ষা হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম অথবা জোরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্মের কোন উল্লেখ করে না, যদিও সেই সময়ে এই ধর্মগুলির অস্তিত্ব ছিল এবং মানুষ তা পালন করত। সম্ভবত মহম্মদ এদের কথা শোনেন নি। আরও সম্ভাব্য কারণ যে এই ধর্মগুলি মহম্মদ এবং তার অনুসারীদের বিপদের কারণ হয়ে ওঠেনি, সেকারণে তিনি কোনও আগ্রাসী মনোভাব দেখাননি।

ইসলাম ইহুদীধর্ম ও খ্রীষ্টানধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেজন্য মনে হতে পারে যে ধর্মগুলি তুলনামূলকভাবে গ্রহণীয় ছিল এবং অন্যান্য ধর্মের থেকে এই দুই ধর্মের সাথে অনেক বিষয়ে ইসলামের মিল ছিল। কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো। ইসলামের প্রত্যূষকাল থেকে আজ পর্যন্ত তার কোন পরিবর্তন হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম আজও অমুলিমদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, তবে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের প্রতি এই শত্রুতা

বিশেষভাবে তীব্র। এই শত্রুতা বজায় রাখার জন্য ইসলাম মুসলমানদের মনে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের প্রতি সন্দেহ আর অবিশ্বাসের অস্তিত্ব লালন করেছে কোরআনের এই আয়াত দ্বারা: "তোমরা ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের পথ অনুসরণ না করলে তারা সন্তুষ্ট হবে না। বল 'আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সুপথ', এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে তৎপর তুমি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তবে আল্লাহর রোষ থেকে রক্ষার জন্য কেউ থাকবে না" (২:১২০)।

ইসলাম অনুযায়ী, ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরা একই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরকে মুসলিমরাও বিশ্বাস করে কিন্তু এতে তাদের কোন উপকারই হয়নি। ইসলাম তাদের প্রতি আচরণ নির্ধারণ করে মহম্মদের প্রতি আচরণ দিয়ে, ঈশ্বরের প্রতি আচরণ দিয়ে নয়। উপরের ঐ আয়াত অনুযায়ী কোন মুসলমান কোন ইহুদী বা খ্রীষ্টানের সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরী করতে পারে না। আয়াতটি অন্য ধর্ম বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেনি, সেজন্য ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের প্রতি আক্রোশ এত তীব্র, যারা মহম্মদের সময়ে তাকে নবী বলে মানতে অস্বীকার করেছিল।

এই আয়াতটি ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের প্রতি মুসলিমদের আচরণ স্থির করতে নির্ণায়ক ভূমিকা নেয় এবং সেই আচরণকে সন্দেহ আর অবিশ্বাসে ভরিয়ে তোলে। এর ফলে মুসলমানরা নিশ্চিত হয় যে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরা কখনোই মহম্মদকে মেনে নেবে না এবং এই দুই ধর্মের মানুষের সাথে ভবিষ্যতের কোন সমস্যা সমাধানের সুযোগই রাখেনি। যখন আমি স্কুলের শিশু ছিলাম তখন আমাদের ধর্মশিক্ষার শিক্ষক বারবার ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, ওদের অভিপ্রায় ভাল নয়, কারণ তারা আমাদের নবীকে কখনো মানেনি এবং মানবেও না। এভাবেই শিশুবয়স থেকে আমাদের সন্দেহপ্রবণ করে তোলা হয়।

যদি আপনি কারো অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ করেন তাহলে তার সাথে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলা অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন। কোন মুসলমান, সে যতই শিক্ষিত হোক, বাহ্যিকভাবে অন্যদের সাথে মেলামেশা করুক, এই দুই ধর্মের মানুষের প্রতি কখনও নিজেকে পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত করতে পারবে না। তার মনে দৃঢ়ভাবে

গেঁথে আছে সে এমন কারও সাথে প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক করতে পারে না যে মহম্মদকে স্বর্গপ্রেরিত নবী হিসাবে মানে না।

খ্রীষ্টানদের এবং বিশেষত ইহুদীদের সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে সেটাই ইসলামি ঐতিহ্যের বেশীর ভাগ অংশ, যা আমাদের অসীম অবিশ্বাস আর ঘৃণায় ভরে রেখেছে। ইসলামের আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের প্রতি অবিশ্বাস মুসলমানদেরকে এমন এক মানসিক বিকারগ্রস্ত অযৌক্তিক বিশ্বাসহীনতায় নামিয়ে এনেছে যে সেই ঘৃণা গত পঞ্চাশ বছরে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছে, যখন থেকে ইজরায়েল দেশটি জন্মগ্রহণ করেছে। সময়ের সাথে ইহুদীরা এমন এক বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে আমরা আমাদের সমস্ত সমস্যা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এমনকি নৈতিক দুর্ভাগ্যের দায়ও তাদের উপরে চাপিয়ে দিই। ধর্মপ্রচারকদের মদতে আরব শাসকরা এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ফলে লাভবান হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকেই যারা তাদের মতের বিরোধিতা করেছে তার বিরুদ্ধেই ইহুদীদের সাথে মিলে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছে। শিক্ষিত মানুষ, চিন্তাবিদ এবং লেখক—কেউই এই ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব থেকে মুক্ত নয়: যখনই কোন লেখক কোন নতুন ভাবনা নিয়ে আসেন যা প্রচলিত মতের সাথে মেলে না, তখনই গুজব সৃষ্টিকারী যন্ত্র তাকে ইহুদীদের দালাল বলে চিহ্নিত করে।

সিরিয়ার কবি নিজার কাব্বানি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন, "প্যালেস্টাইন ছিল তোমাদের ডিমপাড়া মুরগী, যার মূল্যবান ডিম তোমরা খেয়েছ..."। মুসলমানরা সাধারণত ষড়যন্ত্র তত্ত্বের দ্বারা লাভবান হয়, যার ফলে তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পায় এবং দায়িত্ববোধ থেকেও মুক্তি পায়। প্রত্যেক মুসলমান যদি কোন সরকারী চাকরী পায় সে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করে, যেমন ঘুষ নেওয়া, টাকা চুরি, ক্ষমতার অপব্যবহার। সে এই কাজ করে এই যুক্তি দিয়ে, সে "ইহুদী শত্রু"র বিরুদ্ধে বৃহৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমি যে হাসপাতালে কাজ করতাম সেখানকার কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন নিচের তলার একটি ঘর দিনের বেলা মহিলা ডাক্তার এবং নার্সদের বাচ্চাদের থাকার

জন্য ব্যবহার করা হবে। একদিন সমস্ত বাচ্চা সংক্রামক পেটের অসুখ এবং বমিতে আক্রান্ত হল। সংক্রমণ হয়েছিল অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে তৈরী জলের জন্য, যে জল দুধ তৈরী করতে এবং বোতল ধোওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত। ঐ দিনই প্রশাসনিক ম্যানেজারের সাথে আমাদের একটা মিটিং ছিল। তিনি আদতে ছিলেন হাসপাতালের টেলিফোন অপারেটর এবং রাতারাতি প্রশাসনিক পদে উন্নীত হয়ে গেলেন। তার এই উন্নতির রহস্য হল, তার ভাই সিরিয় সেনাবাহিনীতে উঁচু পদে কাজ করতেন। মিটিং চলাকালীন আমি দূষিত জলে বাচ্চাদের দুধ তৈরী করা এবং অস্বাস্থ্যকর ভাবে বোতল ধোওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করলাম। সেইসঙ্গে প্রস্তাব করলাম একটি ইলেকট্রিক বিশুদ্ধকারী যন্ত্র কেনার জন্য যাতে কুড়ি বোতল জল ধরে এবং সব দোকানেই পাওয়া যায়।

আমি আমার প্রস্তাব শেষ করতে না করতেই ম্যানেজার ভদ্রলোক গুলি খাওয়া বন্য পশুর মত লাফ দিয়ে উঠলেন এবং প্রচণ্ড রেগে চিৎকার করে আমার মুখের উপর বললেন: “ডক্টর, মনে হয় তুমি জান না আন্তর্জাতিক আমেরিকান এবং ইহুদী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের উপর যে অন্যায্য পদক্ষেপ নিয়েছে তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কি। আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত সরকার যে অবস্থান নিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ওরা আমাদের উপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়েছে, আমাদের দৃঢ়ভাবে তার প্রতিরোধ করতে হবে একে অপরকে সাহায্য করে এবং সরকারী খরচ কমিয়ে। তুমি ইলেকট্রিক বিশুদ্ধকারী যন্ত্র কেনার কথা বলছ! হে ঈশ্বর, বর্তমান প্রজন্ম কিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে! আমাদের মা, ঠাকুমারা; ঈশ্বর তাদের আত্মাকে দয়া করুন; বৃষ্টির জল ধরে রাখতেন আমাদের পানের জন্য। আর দেখ, আমরা সিংহের মত। সংক্রমণ আমাদের মারে না, অসুস্থও করে না!” মিটিং থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আমি ভাবছিলাম: আমাদের মা, ঠাকুমারা গাধা আর খচ্চরের পিঠে চড়ত, কিন্তু তুমি, হে প্রভু, তুমি মার্সিডিজ এবং বি.এম.ডব্লিউ (BMW) চড়ে ঘুরে বেড়াও।

আমেরিকাতে অভিবাসী হিসাবে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার পথে আমার বড় বাধা ছিল সাধারণভাবে আমেরিকানদের এবং ইহুদীদের সৎ মনোভাবের আন্তরিকতাতে সন্দেহ। আমেরিকাতে প্রথম কয়েকবছর আমি এক সন্দেহের কুয়াশার মধ্যে কাটিয়েছিলাম, যে মানুষদের মাঝে আমি বাস করি তাদের বিশ্বাস করতে পারতাম না। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তারা আমার ক্ষতি করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে, কারণ আমি মুসলমান। আমি পৌঁছানোর অল্প কদিন পরে, আমার পাশের আমেরিকান প্রতিবেশী এসে নিজের পরিচয় দিয়ে আমার নাম এবং কোন শহর থেকে এসেছি তা জানলেন। আমি যখন জানলাম তিনি একজন পুলিশকর্মী আমি প্রায় জ্ঞান হারাচ্ছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল, একবার যদি উনি জানতে পারেন যে আমি একজন মুসলমান—তিনি আমার ধর্ম কি তা জিজ্ঞাসা করেননি—তিনি আমার উপর চরগিরি করতে শুরু করবেন এবং আমার জীবন নরক করে দেবেন। তিনি সত্যিই আমার জীবন নরক করে দিয়েছিলেন!

আমি তার এবং তার পরিবারের উপর নজর রাখতে শুরু করলাম কোন অভাবিত বিপদের বিরুদ্ধে সাবধানতা হিসাবে। যখনই তার পরিবারের কেউ সামনের বাগানে আসতেন, আমার ভয় হত হয়তো আমাদের পরিবারের উপর চরবৃত্তি করছে। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে বা পরদার পিছন থেকে লক্ষ্য করতাম। সন্দেহে এত যন্ত্রণা পাচ্ছিলাম যে ভেবেছিলাম আমাদের অন্য বাড়ী খুঁজতে হবে। সেই সময়ে একদিন সকালে আমার দরজায় প্রতিবেশীকে দেখে আমি অবাক।

"সুপ্রভাত, প্রতিবেশী। আমি ভাবছিলাম একটা বিষয়ে সম্ভবত আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন"।

"কি বিষয়ে?"

"আমার মালী মেক্সিকোর লোক এবং ইংরাজী বলতে পারে না এবং আমি স্প্যানিস বলতে পারি না। আপনি কি তাকে অনুবাদ করে বলবেন যে আমি তাকে কি করতে বলছি?"

"কিন্তু আমি তো স্প্যানিস বলতে পারি না!"

তিনি আশ্চর্য হয়ে জজ্ঞাসা করলেন, "আপনি স্প্যানিস বলতে পারেন না? আপনি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসেননি?"

"না, আমি সিরিয়া থেকে এসেছি"।

"সিরিয়া? আপনারা সিরিয়াতে স্প্যানিস বলেন না?"

"না, আমরা আরবি বলি"।

"দুঃখিত, আমার জানা ছিল না"।

শতকরা নব্বইজন আমেরিকান ভাবেই না পৃথিবীর মানচিত্রে সিরিয়া কোথায়, অথচ শতকরা নব্বইজন আরব বিশ্বাস করে আমেরিকা তাদের বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করে তাদের উপর চরবৃত্তি করে এবং ইসলামকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে যাতে তাদের তেল এবং অন্য সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেওয়া যায়।

১৯৮৪ সালে সিরিয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক আমার স্বামী এবং আরও কয়েকজন অধ্যাপককে তিনমাসের জন্য ইংল্যাণ্ড পাঠায় ওখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে পড়াশোনার জন্য। ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অধ্যাপক এই প্রতিনিধিদলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি সিরিয়দের এক দুপুরে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়ন করেন। আমার স্বামী ফিরে আসার কয়েকমাস পর ঐ ব্রিটিশ অধ্যাপক সিরিয়ায় আসেন এবং আমার স্বামী যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন সেখানে কয়েকদিন থাকেন। তাঁর অতিথিপরায়ণতার স্বীকৃতি দিতে আমি এবং আমার স্বামী তাঁকে আমাদের বাড়ীর কাছে এক রেস্তোঁরায় নিমন্ত্রণ জানালাম, এজন্য আমার স্বামীর একমাসের বেতন খরচ হল। অধ্যাপকের আগমন আমাদের ছেলের তৃতীয় জন্মদিনের সাথে মিলে গিয়েছিল। আমাদের কেক এবং উপহার কেনা পরের মাসের জন্য স্থগিত রাখতে হয়েছিল।

কিন্তু অর্থনৈতিক চাপই আমাদের একমাত্র সমস্যা ছিল না: নিমন্ত্রণের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমার স্বামীকে যে প্রশ্ন করেছিলেন সেটাই অনেক বেশী সমস্যার কারণ ছিল। তার মধ্যে সবথেকে কষ্টের ছিল: আমাকে নিমন্ত্রণের আগে তুমি কি ভেবে দেখেছ যে এ লোকটি আন্তর্জাতিক ইহুদীদের টাকায় ব্রিটিশ গুপ্তচর হতে

পারে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক গোপন তথ্য চুরির পরিকল্পনা করতে পারে—কে জানে—সামরিক গোপন তথ্যও? আমার স্বামী এবং আমি কয়েকদিন এমন উৎকণ্ঠায় কাটালাম যে প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারানোর অবস্থা। ইহুদীদের দালাল এই অভিযোগ—যদি তা গুজবও হয়—অবশ্যই আমাদের সুনাম, আমাদের ভবিষ্যৎ এমনকি জীবনও ধ্বংস করে দিতে পারে।

যখন আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে এবং আমাদের শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকদের বিশেষত ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের এবং সাধারণভাবে অন্য অমুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা মনে আসে তখন আমি নিজেকে বলি: যদি শিক্ষিত মুসলমানরা আমাদের ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলপাঠ্য বইয়ে অগাধ পরিমাণ ঘৃণার বদলে এমন বিষয় আনতে পারে যা অন্য মানুষের ধর্ম, জাতির উৎস, অথবা জাতীয়তাবাদ নিরপেক্ষভাবে ভালবাসতে শেখায়; তাহলেই গোটা মুসলিম বিশ্বকে পশ্চাৎপরতা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা থেকে বাঁচাতে পারে। এই ঘৃণা আমাদের "শত্রু"কে ধ্বংস করার বহু আগে আমাদেরকেই ধ্বংস করে দেবে। কারণ ঘৃণা হল অ্যাসিডের মত, যার উপর ঢালা হয় তার ক্ষতির থেকে যে পাত্রে থাকে তারই বেশী ক্ষতি করে।

যখন আমি এই শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা করি, বেশীরভাগ মুসলমান অভিযোগ করে যে আমি ইহুদীদের থেকে টাকা পাই এবং বিশাল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে তাদের পক্ষে কথা বলি। আমি এই অভিযোগে বিন্দুমাত্র বিচলিত নই কারণ যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে আমার মুখোমুখি হওয়ার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। আমি ইহুদীদের সমর্থনে কথা বলছি না, মুসলিমদের রক্ষার কারণে বলছি। কেন আরব জগতের সব শিশু এই ঘৃণা গলাধঃকরণ করবে আর হত্যা আর প্রতিশোধের চিন্তায় জীবনের সবথেকে সুন্দর বছরগুলি অপচয় করবে?

আমার তিন সন্তান তাদের প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে আমেরিকার স্কুলে। তারা কেউ কখনো বাড়ী ফিরে বলেনি তাদের শিক্ষক বলেছেন যে মুসলমানরা আতঙ্কবাদী এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তাদের কেউ কখনো শেখেনি খ্রীষ্টানধর্মই

একমাত্র সত্য ধর্ম এবং যে এই ধর্ম পালন করে না সে বিধর্মী এবং শত্রু। তারা কেউই স্কুলে শেখেনি যে ঈশ্বর মুসলমানদের ঘৃণা করেন।

আমি সর্বদাই নিজেকে জিজ্ঞাসা করি: কেন আমার সন্তানেরা, যারা আমেরিকার শিক্ষায় শিক্ষিত, বড় হয়েছে অন্যদেরকে সম্মান করে তাদের ধর্ম, গোত্র বা উৎসের কথা না ভেবে? কেন আমি পরিণত বয়স পর্যন্তও ঘৃণার আগুনে পুড়েছি এবং কেন আমার মাতৃভূমির মানুষেরা এখনও সেই আগুনে পুড়ছে? কেন আমার জন্মভুমির মানুষেরা ভালবাসতে শেখে না, যাতে তারা সৃষ্টিশীল, দক্ষ এবং সুখী হতে পারে অন্য দেশের মানুষের মত, যারা ভালবাসার শিক্ষা দেয়? কেন আমার দেশের মানুষ অন্য মানুষদের সহ্য করতে শেখে না যারা তাদের ধর্ম পালন করে না, যার ফলে তারা সবার সাথে শান্তি আর ঐক্যের সাথে বাস করতে পারে? আমরা অন্যদের ঘৃণা করতে শিখেছি, এবং এই ঘৃণা অন্যদের যতটা ক্ষতি করেছে তার থেকে অনেক বেশী ক্ষতি করেছে আমাদের।

আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, সিরিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ থেকে খাদ্য সাহায্য পেয়েছিল, বহু ট্রাক ভর্তি আমেরিকায় তৈরী নেসলে'র গুঁড়ো দুধ। এই সাহায্যের অন্যতম শর্ত ছিল যে এই দুধ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের বিনামূল্যে দিতে হবে। যদি এই শর্ত যোগ করা না হত তাহলে সিরিয়ার অফিসাররা বরাবরের মত সমস্ত দুধ বিক্রি করে টাকা পকেটস্থ করত। আমাদের শিশুদের মধ্যে দুধবিলি শুরু হল গড়ে প্রতিদিন প্রত্যেক ছাত্রকে এক গ্লাস করে যেটা আমরা স্কুল শেষে পান করতাম। আমার মনে আছে আমাদের শিক্ষক প্রতিদিন আমাদের বলতেন, "চিন্তা করতে পার এখানে কি হচ্ছে? আমেরিকা সিরিয়ার শিশুদের দুধ দান করে পৃথিবীর কাছে মহান সাজছে, ওদিকে ইজরায়েলের শিশুদের ট্যাঙ্ক দান করছে!" আমাদের অনেকেই দুধ পান না করে খেলার মাঠে ফেলে দিত।

আমেরিকা এবং তার দুধের প্রতি যে তীব্র বিদ্বেষের বিষ শিক্ষক আমাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তা ছাড়া আজ আমি আমেরিকার দুধ পান করতে অস্বীকার করার কোন কারণ খুঁজে পাই না। কেন আমরা আমাদের শিশুদের মনে এই বিষ

ঢালি? এই প্রশ্নটাই আমার মনে বারবার আসে যেদিন থেকে আমার নতুন সমাজে আমি সত্যটা আবিস্কার করেছি। আমি সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলি, "এই বিষ ঢালা বন্ধ কর!" আমি ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের রক্ষা করতে এ কথা বলিনা। আমি এটা করি আমার দেশের শিশুদের রক্ষা করতে, ঘৃণার অ্যাসিডে পুড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে যা আমার প্রজন্মকে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে।

আমি এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারি, আমাদের ধর্মশিক্ষার শিক্ষক বারবার ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের নিয়ে নবী মহম্মদের বাণী এবং গল্প বলতেন, এবং আমাদের বিবেক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এই গল্পগুলির কি প্রভাব পড়ত। একটা গল্প আমার স্মৃতিতে গভীরভাবে গেঁথে আছে। একদিন মহম্মদ এবং তার কিছু অনুগামী দূর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলেন। অনুগামীরা নবীকে জিজ্ঞাসা করল: "হে ঈশ্বরের নবী, ও কিসের শব্দ?" তিনি বললেন: "ইহুদীরা তাদের কবরে যন্ত্রণা ভোগ করছে"।(সহী বুখারী, ১২৮৬)

অন্য একটা হাদিসে মহম্মদ বলছেন: "একজন ভণ্ড প্রতারক আসবে এবং নিজেকে ত্রাণকর্তা বলে দাবী করবে, সত্তর হাজার ইহুদী তাকে অনুসরণ করবে, তাদের সঙ্গে থাকবে তরবারি। কিন্তু তখন প্রকৃত ত্রাণকর্তা তাকে ধরে ফেলবে, হত্যা করবে, এবং সকল ইহুদীকে পরাস্ত করবে। প্রত্যেক পাথর এবং গাছ বলবে: 'হে আল্লাহর সেবক, হে মুসলমান, এখানে কিছু ইহুদী লুকিয়ে আছে, এখানে এস এবং তাদের হত্যা কর'"। একমাত্র ব্যতিক্রম হবে লবণ বৃক্ষ, যা ইহুদীদের গাছ। যদি তারা এর পিছনে লুকায়, সে তাদের উপস্থিতি প্রকাশ করে না। বর্তমানে কিছু মুসলমান গুজব ছড়ায় যে ইজরায়েলের ইহুদীরা এই হাদিসের সত্যতা জানে এবং লবণবৃক্ষ লাগাতে শুরু করেছে লুকানোর জন্য।

যখনই মহম্মদ তার অনুসারীদের কোন কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইতেন তিনি বলতেন: "ঈশ্বর ইহুদীদের অভিশাপ দিয়েছিলেন কারণ তারা ঐ কাজ করেছিল"। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি বলেছিলেন: "ঈশ্বর ইহুদীদের অভিশাপ

দিয়েছিলেন কারণ তারা তাদের নবীদের কবরস্থানকে প্রার্থনার জায়গা বানিয়েছিল”(সহীহ মুসলিম, ৮২৩)। একজন লোক একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল: “হে ঈশ্বরের নবী, আমার একটি দাসী আছে যাকে আমি পছন্দ করি এবং একজন পুরুষ যা করতে চায় আমি তার সাথে সেই কাজ করতে চাই, কিন্তু, সে গর্ভবতী হয়ে পড়তে পারে এই ভয়ে আমি তার দেহের বাইরে বীর্যপাত করি। কিন্তু আমি শুনেছি নারীর শরীরের বাইরে বীর্যপাত করা ভ্রূণহত্যার সমান—এ কথা কি সত্য?”

তিনি একটি হাদিসে উত্তর দিলেন: “ঈশ্বর ইহুদীদের অভিশাপ দিন, কারণ তারা এইরূপই বলে! এসব কথা শুনবে না, তোমার যেখানে ইচ্ছা বীর্যপাত কর। যদি ঈশ্বর তাকে গর্ভবতী করতে চান তবে তুমি তার দেহের বাইরে বীর্যপাত করতে পারবে না”। যদি শিক্ষা মানুষের মনকে গঠন করে, তাহলে সমগ্র মনই শিক্ষার ফসল। এমন শিক্ষা কি ধরণের মনকে সৃষ্টি করতে পারে?

মুসলমানরা কি তাদের শিক্ষারই স্বাভাবিক ফসল নয়?

সভ্যতার সংঘর্ষ

সেপ্টেম্বর ১১ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ আমাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল, কিন্তু আমাকে বিস্মিত করেনি। দিন-রাত আমার মনে হত এমন কিছু একটা ঘটবে। আমি এই আশঙ্কা করছিলাম এখানকার আরবি ভাষার সংবাদপত্রে যা লেখা হচ্ছিল এবং সামাজিক মেলামেশায় যা আলোচনা হত তার প্রেক্ষিতে। আরব দুনিয়ায় গোপন বলে কিছু নেই, এবং অদূর ভবিষ্যতে যা ঘটতে যাচ্ছে তা কিছু লক্ষণ বা আভাস থেকে বোঝা যায়। কিন্তু বহু মানুষই সেটা বুঝতে পারে না দু'টোর মধ্যে একটা কারণে: অকারণ অহমিকা অথবা অজ্ঞতা। সেপ্টেম্বর ১১ এর আগে আমেরিকার সরকারের অফিসারদের অহমিকা এবং অজ্ঞতা উভয় কারণেই তারা বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছিল।

একটি প্রচলিত আরব উপকথার গল্পে আছে, একটি লোক ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তখন একজন পথহারানো পথিক তাকে থামতে বলে এবং তাকে তুলে নিতে অনুরোধ করে। অভিজ্ঞতা মরুভূমির আরবদের শিখিয়েছে পথচলতি অপরিচিত সম্বন্ধে সাবধান হতে। তবুও ঘোড়সওয়ারটি লোকটির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে তুলে নিল। অল্প সময় পরে পথিক সওয়ারীকে বলল, "বন্ধু, তোমার ঘোড়াটা খুব সুন্দর"। এর কিছুক্ষণ পর পথিকটি আবার বলল, "বন্ধু, এই ঘোড়াটা সত্যিই খুব সুন্দর"। আরও অনেকটা সময় যাওয়ার পর লোকটি বলল, "ঈশ্বরের দিব্যি, আমাদের ঘোড়াটি সত্যিই খুব ভাল!"

ঘোড়সওয়ার তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল এবং লোকটিকে বলল, "এখনই ঘোড়া থেকে নামো, নাহলে আমি তোমাকে খুন করব। প্রথমে তুমি বললে 'তোমার' ঘোড়াটা

খুব সুন্দর, তারপর তুমি বললে ‘এই ঘোড়াটা’, আর এখন বলছ, ‘আমাদের’ ঘোড়াটি সত্যিই খুব ভাল। আর এক মিনিটের মধ্যে তুমি বলবে ‘আমার ঘোড়া’ এবং আমাকে লাথি মেরে নামিয়ে দেবে!” আমেরিকানদের পথের দস্যু সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই, সে কারণে তারা পথচলতি লোককে ঘোড়ার মালিকানা বিষয়ে কথা বলতে দেয়! তর্কে অথবা ছলচাতুরীতে তারা অভিজ্ঞ নয়। তারা যা বলতে চায় সেটাই বলে অথবা তারা যেটা বলে সেটাই বলতে চায়, এবং তাদের কোন ধারণাই নেই যে লোকদের সাথে তারা লেনদেন করে সেই লোকেরা কতটা দক্ষ কোন কথা বলতে যা তারা সত্যিই বোঝাতে চায় না এবং যা বোঝাতে চায় তা তারা বলে না।

আইন একা কোন সমাজকে রক্ষা করতে পারে না। আইনকে কার্যকরী হতে হলে, মানুষের একটা নৈতিক ভিত্তি থাকতে হবে এবং কোন জাতিকে আইন তৈরী বা প্রয়োগের আগে নৈতিকতার একটা বিশেষ মাত্রায় পৌঁছাতে হবে। সমাজের নৈতিকতাই আইন তৈরী করে এবং তার প্রয়োগকে নিশ্চিত করে। সমাজে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক বেশ জটিল এবং যে আইন সেই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই আইন কোন ঘটনাবিশেষের সমাধান করতে সক্ষম নাও হতে পারে। একমাত্র নৈতিকতাই সেটা করতে পারে। যখন আমি একটা আদিম সমাজ থেকে সভ্য সমাজে এলাম, দুইয়ের বিশাল পার্থক্য দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তখন থেকেই আমি খুঁজতে শুরু করেছিলাম, আজও খুঁজছি, এই পার্থক্যের কারণ কি।

আমার অনুসন্ধান থেকে আমি নিশ্চিতভাবে বুঝেছি মুসলমান সমাজে আমরা যা দেখি সেটা সরকার, কর বা প্রাকৃতিক সম্পদ এমন কি আইন সংক্রান্ত সমস্যা নয়: এটা নৈতিকতার সমস্যা। আমাদের মুসলমান সমাজ পরিচালিত হয় ধর্মীয় আইন দিয়ে যা গায়ের জোরে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং নির্ভর করা হয় ভয়ের উপরে যার দ্বারা সেই আইনকে রক্ষা করা বা চিরন্তন রূপ দেওয়া যায়। আমি আগেই বলেছি ইসলামের জন্ম হয়েছিল শুষ্ক, অনুর্বর, জনবিরল পরিবেশে যেখানে মানুষকে বাঁচার জন্য যুদ্ধ করতে হত। ইসলাম সেই পরিবেশ এবং যুগের প্রথাকে গ্রহণ করেছিল,

সম্পূর্ণভাবে শুষে নিয়েছিল; তারপর আর তাকে সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে দেয়নি।

সংস্কৃতি ধর্মকে ঘিরে রাখে এবং সময়ের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নেয়। আমেরিকার সংস্কৃতি খ্রীষ্টানধর্ম ও ইহুদীধর্মের দ্বারা প্রভাবিত—এবং, আজও তাই—কিন্তু সে সময়ের সাথে নিজেকে পরিবর্তিত করে নেয় এবং সেই সঙ্গে ধর্মেও পরিবর্তন আসে। সংস্কৃতিই ধর্মের অবয়ব গঠন করে, উল্টোটা নয়। যখনই ধর্ম মানুষের জীবনে মাথা গলায় এবং তাদের গ্রাস করে, তখনই সে তার আধ্যাত্মিকতা হারায় এবং মানুষের সতত পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার অক্ষমতা প্রকাশ পায়। মুসলমান ধর্মপ্রচারকরা টেলিভিশনের পর্দায় আমাদের সাথে তর্কে এসে ঋতুস্রাব, ব্যাঙ্কের উপযোগীতা, পাকিস্তানের আণবিক বোমা এবং সুনামীর(Tsunami) প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা এক নিঃশ্বাসে বলেন।

ইসলাম যে সব মানুষের সংস্পর্শে এসেছে তাদের সবার সংস্কৃতিকে পদানত করেছে, কিন্তু অন্যদের থেকেও তার নিজের দেশীয় আরব সংস্কৃতির সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছে ফেলেছে। এই সংস্কৃতি এখন আর তার আসল পরিচয়জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না। চৌদ্দশ' বছর ধরে ইসলামী আইন তার চরিত্র বদলে দিয়েছে। জর্ডনে জন্মগ্রহণ করা এবং বড় হওয়া একজন খ্রীষ্টান আচরণ এবং চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে একজন পাকিস্তানী মুসলমানের থেকে অনেক বেশী ইসলামী। আমি আগে যেমন বলেছি, ইসলাম সমস্ত মুসলমানের সংস্কৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, কিন্তু যেহেতু কোরআন আরবি ভাষায় লিখিত এবং অন্য ভাষায় এর অনুবাদ নিষিদ্ধ, সেকারণে সে অন্য সংস্কৃতির সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করতে পারেনি যেভাবে আরব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পেরেছে।

অনারব মুসলমানেরা তাদের সংস্কৃতির কিছু অবশিষ্ট অংশকে ইসলামীকরণের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছে। এই অবশিষ্টটুকু, যদিও তা খুব সামান্য এবং বিক্ষিপ্ত, তবু সেটাই অন্য জাতিগুলিকে আরবদের থেকে আলাদা করেছে। আরবরা যেহেতু ইসলামের দ্বারা অনেক গভীরভাবে প্রভাবিত, তারাই গভীরভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসলামের জন্ম থেকে তিরিশ বছর আগে পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বজায় ছিল অর্থাৎ যতদিন না সৌদি ওয়াহাবি অক্টোপাস তার সন্ত্রাসবাদী মতবাদ এবং টাকা নিয়ে এইসব দেশ এবং অনারব মুসলিম দেশের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করেছে, যেমন ইন্দোনেশিয়া।

ইসলাম একটি আইনি নিয়মাবলী যার সৃষ্টি এমন এক যুগে যখন ডাকাতি এবং লুঠের মানসিকতাই কর্তৃত্ব করত, ফলে মূল বিষয় ছিল ডাকাতি এবং লুঠের মাল। নৈতিকতার কোন ভিত্তি তৈরীর কোন ক্ষমতাই তার ছিল না; বরং প্রাক-ইসলামী আরবে যে সূক্ষ্ম নৈতিক গুণগুলি ছিল তাদের উপরে মারণ আঘাত হেনেছিল।

অন্তরা আল-আবসি, ইসলাম পূর্ব আরবের একজন বিখ্যাত কবি। আত্ম-গৌরব মূলক এক কবিতায় তাঁর গুণের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণ হল “লুঠের মাল থেকে দূরে থাকা”। তাঁর সময়ের পরে আসে ইসলামী যুগ যা ডাকাতি ও আক্রমণকে সংস্কৃতির স্বাভাবিক অঙ্গ করে তোলে এবং লুঠের মাল ভাগের ক্ষেত্রে নবী মহম্মদ এবং ঈশ্বরকে একাসনে বসিয়ে তাদের জন্য এক পঞ্চমাংশ বরাদ্দ করে।

এই আইনি নিয়মে যত অনুশাসনই থাক সে তার মানসিকতার সীমাবদ্ধতাকে এড়াতে পারে না। মানুষ মানুষকে খুন করেছে যাতে সে নিজে নিহত না হয়, অন্যের উপর ডাকাতি করেছে নিজে না খেয়ে মরার ভয়ে। মহম্মদ ছিলেন যোদ্ধা, চিন্তাবিদ নন। তিনি তার অনুসারীদের জন্য কোন নৈতিক উত্তরাধিকার রেখে যাননি যার উপরে ভিত্তি করে তারা সমাজ গঠন করতে পারে। এমন কি তিনি এই আইনের সীমার বাইরে একবিন্দু জায়গাও রাখেননি যাতে অনুসারীরা তাদের স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারে, হয়ত বা সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে অথবা নিজেদের জন্য নৈতিক বিধি সৃষ্টি করতে পারে।

মহম্মদের জীবনের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা কাহিনী লিখিত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত চলে আসছে, তা সবই তার ডাকাতি এবং সেই সম্পর্কিত কথা। তিনি যে

জগতে বাস করতেন তার বাস্তবতা থেকেই তার শিক্ষার উদ্ভব এবং সেটাই অবিসংবাদিত ফসল।

যদি আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নবীর জীবনী পড়েন, দেখবেন সেখানে নৈতিকতার প্রভাব লেশমাত্রও নেই। কেউ কেউ প্রতিবাদ করতে পারে যে বিষয়টিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারে নৈতিকতা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না। সংস্কৃতির মত সময় এবং স্থান ভেদে নৈতিকতা পরিবর্তিত হয় না, সকল সময়ে, সর্ব ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযুক্ত হয়। নৈতিকতা চিরন্তনভাবে সর্বত্র পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। যা বেভারলি হিলসে নৈতিক তা আফ্রিকার উপজাতিদের কাছেও নৈতিক এবং বিপরীত ভাবেও সত্যি। সংস্কৃতি জাতিভেদে বা দেশভেদে পৃথক হতে পারে, কিন্তু নৈতিকতা সর্বকালে সর্বত্র সমান।

নৈতিকতা হল কিছু স্বাভাবিক নিয়ম যা মানুষকে ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখে। প্রকৃতি যখন এগুলিকে সৃষ্টি করে তখন সে মানুষকে তার যুক্তিবোধ এবং সহজাত ক্ষমতা দিয়ে ন্যায় এবং অন্যায়ের পার্থক্য শেখায়, যাতে তারা এই নিয়মগুলি পালন করে। এই নিয়মগুলি মানবজাতিকে নিরাপদে বাঁচতে সাহায্য করে।

সমস্ত অনুভূতির মধ্যে ভয় মানুষের জীবনীশক্তির পক্ষে সবথেকে বেশী ধ্বংসাত্মক। যখন মানুষ ভয়ে আক্রান্ত হয় তখন তার ভুল বা ঠিক তফাৎ করার ক্ষমতা থাকে না। কারণ তখন তার সব কাজই ভয়ের প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। মরুভূমির যে পরিবেশ ইসলামকে জন্ম দিয়েছিল, সেখানকার মানুষের চিন্তায়, আচরণে ভয়ের স্পষ্ট প্রতিফলন। মানুষ কখনই নিরাপদ বোধ করত না। এই নিরাপত্তাহীনতা থেকেই সমস্ত প্রথার উদ্ভব, যা স্থান এবং কালকে উপেক্ষা করেছে ধ্বংসাত্মক মানসিকতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ।

মহা দুর্ঘটনা ঘটল যখন অগ্রগতির সাথে ইসলাম এই প্রথাগুলিকে ঐশ্বরিক স্বীকৃতি দিল এবং যারা এটা মেনে নিল এবং যারা নিল না তাদের মধ্যে স্থাপন করল ক্ষুরধার তরবারি। যে কেউ প্রকাশ্যে এই ইসলামি প্রথা বা নীতিকে অস্বীকার করল

তাকেই বিধর্মী বলে হত্যা করা হল। ইসলাম তার অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ভয়কে ব্যবহার করল, তাদের উষর মরু পরিবেশের ভয়ের সাথে যোগ করল তরবারির ভয়, এর ফলে মুসলমানরা ঠিককে ঠিক এবং ভুলকে ভুল বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল।

কোন সমাজের মানুষ যখন যৌক্তিক বা সহজাতভাবে ঠিক এবং ভুলের পার্থক্য করার ক্ষমতা হারায় তা সমগ্র মাবনজাতির পক্ষে এক অভিশাপ। সমস্ত ধর্মই মানুষের ঠিক বা ভুল বলার ক্ষমতাকে ছোট করে দেখেছে যখন তারা মানুষকে ঈশ্বরের শাস্তির ভয় দেখিয়েছে, তখন কি কেউ সেই শিক্ষাকে অস্বীকার করতে পারে?

অন্যান্য ধর্মের থেকে ইসলাম একটি বিষয়ে আলাদা, সে তার অনুসারীদের নরকের ভয়ের সাথে মৃত্যুভয় যোগ করে দেয় যে মৃত্যু তাদের অতি দ্রুত নরকে পৌঁছে দিতে পারে। মানুষ ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তির চেয়ে মৃত্যুকে বেশী ভয় করে। তাদের গলায় তরবারির কোপের ভয়ে মুসলমানরা মহম্মদের শিক্ষাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছিল। মহম্মদ একটি হাদিসে তার অনুগামীদের বলেছেন: "উটের মূত্র পান কর, এর দ্বারা সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়"। মুসলিমরা পৃথিবীর সবথেকে বিখ্যাত মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেও আজও বিশ্বাস করে উটের মূত্রে রোগ সারে। তাদের এই বিশ্বাস কোন বৈজ্ঞানিক বোধ থেকে আসে না, আসে তরবারির ভয় থেকে।

চৌদ্দশ' বছরে কোন মুসলমান ঠিক এবং ভুলের পার্থক্য করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সাহস দেখায়নি এবং তার বিশ্বাসী সঙ্গীদের বলেনি: "উটের মূত্র পান কোরো না!" প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রদের পড়ান: "নবী মহম্মদ এক ইহুদী নারী সাফিয়াকে বিবাহ করেন যেদিন তার স্বামী, পিতা এবং ভাইকে হত্যা করা হয়েছিল" এবং এই বিবাহের নৈতিকতা এবং বৈধতা নিয়ে কোনপ্রকার আলোচনা করেন না। মুসলমানরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে নবী মহম্মদ যা কিছু বলেছেন এবং করেছেন তা সবই ঈশ্বরের প্রেরণায়। ইসলাম এই কথা এবং কাজগুলি

নৈতিকতার মানদণ্ডে যে সর্বকালে এবং সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে সঠিক সে বিষয়ে সন্দেহ করতে কাউকে অনুমতি দেয় না।

এই প্রসঙ্গে ইবন আল আথীর, একজন আরব মুসলিম ঐতিহাসিকের লেখা মহম্মদের জীবনী থেকে একটা ঘটনা বলি। "মহম্মদ, ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করুন এবং রক্ষা করুন, পাঁচজন লোককে পাঠিয়েছিলেন কাব বিন আল-আসরাফকে হত্যার জন্য, যিনি মহম্মদকে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক লেখা লিখতেন এবং কুরাইশ জনজাতিকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন। পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিলেন কাব-এর ভাই আবু নাইলা। মহম্মদ তাদের সঙ্গে বাকি' আল-গারকাদ নামক জায়গা পর্যন্ত গেলেন এবং তাদের বিদায় জানালেন, বললেন,'ঈশ্বরের নামে যাও। ঈশ্বর তাদের সাহায্য করুন'। তারপর বাড়ী ফিরে গেলেন।

যখন পাঁচজন কাব-এর তাঁবুতে পৌঁছল, আবু নাইলা তাকে ডাকল এবং কাব বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে বাইরে এল, সে কোন বিপদের আশঙ্কা করেনি কারণ সে তার ভাইএর গলা শুনেছিল। কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যা করল.তারা তার মাথাটা কেটে নিয়ে বাকি' আল-গারকাদে(যেখানে মহম্মদ তাদের বিদায় জানিয়েছিলেন) ফিরে গেল এবং বলল 'আল্লাহু আকবর'। মহম্মদ, ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করুন এবং রক্ষা করুন, শুনলেন এবং তাদের বললেন,'আল্লাহু আকবর'। কারণ তিনি জানতেন তারা কাবকে হত্যা করেছে। যখন তারা পৌঁছেছিল তখন মহম্মদ, ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করুন এবং রক্ষা করুন, নামাজ পড়ছিলেন। তিনি তাদের বললেন "তোমরা সম্মনের সাথে সফল হয়েছ" এবং তারা কাব-এর মাথাটা তার হাতে দিল।

যখন একজন মুসলমান এই গল্পটি পড়ে, সে যতই শিক্ষিত হোক, সে এতে এমন কিছু দেখে না যার ফলে তার মনে প্রশ্ন আসে: "এ গল্পে ঈশ্বরের কি উদ্দেশ্য আছে যা তিনি নবীর উপর ন্যস্ত করেছিলেন?" যখন সন্ত্রাসবাদীরা কোনরকম বিবেক দংশন ছাড়াই ইরাক এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে বন্দীদের শিরচ্ছেদ করে তখন গোটা পৃথিবী প্রশ্ন করে: "ওরা এটা কেন করে?" যারা নিজেদের অনুগ্র বলে দাবী

করে সেই মুসলিমরা বলে: "এই সন্ত্রাসবাদীরা ইসলামের শিক্ষাকে ভুল বুঝেছে"। কিন্তু আমার প্রশ্ন: "মহম্মদের সঙ্গীসাথীরা যে কাব বিন আল-আশরাফকে হত্যা করেছিল এবং তার মাথা মহম্মদের হাতে দিয়েছিল, এই ঘটনাও তারা ভুল বুঝেছে?"

যদি মহম্মদ যা বলেছিলেন তা জারকোয়াই ভুল বুঝে থাকেন, যেমনটা অনেক মুসলমান দাবী করে, তাহলে মহম্মদ যা করেছিলেন সেটাও ভুল বুঝেছেন? কাব-এর হত্যার মত শত শত ঘটনায় নবীর জীবনী ভর্তি, যেগুলি মুসলিম জগতে—একমাত্র না হলেও—শিক্ষার প্রধান উৎস। উমম কিরফা একজন নারী, বেশীরভাগ মুসলমান ঐতিহাসিক এটা মানেন, যার বয়স ছিল একশ' বছরের উপরে, মহম্মদের অনুসারীরা তার আদেশে দু'টো উটের সাথে ঐ নারীর দুই পা বেঁধে বিপরীত দিকে চালিয়েছিল যতক্ষণ না তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল; কারণ তিনি মহম্মদের বিরুদ্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন। মুসলমানরা এই হত্যাকাণ্ডকে গর্বের চোখে দেখে, তারা এই ঘটনাকে মহম্মদের অনুসারীদের ইসলামের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ হিসাবে মনে করে। মহম্মদের তরবারি এবং কর্মের এই সাংস্কৃতিক সঞ্চয় চৌদ্দশ' বছর ধরে প্রত্যেক মুসলমানের, সে যেখানেই থাকুক, "নৈতিক দিকনির্দেশিকা" হয়ে আছে।

একটা আরব প্রবাদ আছে: আপনি কাদায় ডুবে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন কিন্তু মানুষের মধ্যে ডুবে যাওয়া কাদাকে সরাতে পারবেন না। ইসলাম জগতের মানুষ সর্বাঙ্গ দিয়ে কাদাকে শুষে নিয়েছে এবং নৈতিক সমস্যায় ভুগছে। তাদের ভীষণভাবে প্রয়োজন তারা যে পাপগুলি করে তার জন্য অপরাধ বোধ করার ক্ষমতা। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন: এই সমস্যার জন্য ইসলাম কি করতে পারে? ইসলাম চিরকাল যা ছিল এখনও তাই রয়ে গেছে: ইসলাম জগতে একমাত্র না হলেও শিক্ষার প্রধান উৎস হল ইসলামের শিক্ষা, আর মানুষ সেই শিক্ষারই ফসল।

যখন আমি মুসলিম বইগুলি গভীরভাবে পড়ি যে বই ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাবার প্রধান উপায়, তখন আমার সন্দেহ হয় আমেরিকা এবং

বাকি বিশ্ব যেভাবে সন্ত্রাসবাদকে দমন করতে চাইছে তা কতটা কার্যকর হবে। আমেরিকানরা ইরাকে গিয়েছিল গণহত্যাকারী অস্ত্রের খোঁজে, এবং জানিয়েছিল যে তারা কিছু পায়নি। তারা পায়নি অর্থ এই নয় যে সে অস্ত্র ছিল না, কিন্তু অনুসন্ধানকারীরা জানত না কোথায় সেগুলি লুকানো আছে। তারা যদি যে কোন ইসলামি বই খুলে দেখত তারা সেখানে দেখতে পেত বিশাল অস্ত্রের ভাণ্ডার।

অস্ত্রের মধ্যে বিপদ থাকে না, বিপদ থাকে সেই হাতে যে হাত অস্ত্রকে ধরে। গোটা মানবজাতি যে বিপদের সম্মুখীন, আমেরিকান সৈন্যরা তা উচ্ছেদ করতে পারবে না; যতদিন না মৃতদেহেরা সতর্ক করে এবং তারা জানতে পারে ইসলামি বিশ্বের গণহত্যাকারী অস্ত্র কোথায় লুকানো আছে। মুসলিম বিশ্বে স্কুলগুলি সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা তৈরীর জন্য দায়ী এবং যে কোন অস্ত্র কারখানার থেকে অনেক বেশী বিপজ্জনক। এই স্কুলগুলি মানুষের মনকে ধ্বংস করে দিয়েছে, এই ধ্বংস অন্য মানুষের জীবনে যে ক্ষতি করে তার থেকে বেশী ক্ষতি করে তাদের নিজেদের। সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা একটি নির্বীজ বস্তু যা কোন কিছুরই জন্ম দিতে পারে না, ফলে যারা এটা ব্যবহার করে, তাদের শত্রুদের থেকে তাদের নিজের জীবনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় অনেক বেশী।

আমি এখানে যা বলেছি, পাশ্চাত্যের কোন মানুষই তার সত্যতা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবে না, কারণ তারা মুসলিম জগতে বাস করে না। তারা কল্পনাই করতে পারে না সেই সমাজের মানুষের জীবনে নৈতিক অধঃপতনের মাত্রা কোন পর্যায়ে। এইসব সমাজের মানুষ তাদের কৃত অপরাধের জন্য নিজেকে দোষী ভাবার অনুভূতিই হারিয়ে ফেলেছে। তাদের শিশুবেলা থেকে এমন শিক্ষা দিয়ে তাদের মগজধোলাই হয়েছে যে তারা ভাবে ঈশ্বর তাদের সৃষ্টিই করেছেন দাস হওয়ার জন্য।

নামাজ পড়া, রোজা রাখা, এবং কোরআন পড়া এই কাজগুলি সম্পন্ন করেই একজন মুসলমান ভাবে সে তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে, কারণ তার দায়িত্ববোধের অনুভূতি এই নির্দেশগুলি পালনের বাইরে কখনই বিস্তৃত হয় না। সমস্ত মুসলিম দেশের শাসকরা তাদের প্রজাদের মিথ্যা বলে, লুঠ করে, হত্যা করে এবং অত্যাচার

করে। কিন্তু শুক্রবারে এবং ধর্মীয় ছুটির দিনে তারা কখনও মসজিদে যেতে এবং নামাজ পড়তে ভুল করে না। কোন মুসলমান ধর্মপ্রচারক এইসব নেতাদের আচরণকে সমালোচনা করে কখনও একটি শব্দও উচ্চারণ করে না—যদি না সেই শাসক অন্য কোন ধর্মের হয়। সাদ্দাম হুসেইন লক্ষ লক্ষ কুর্দ এবং শিয়া কে হত্যা করেছে, কিন্তু আমরা যে মুসলমানদের তার অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখেছি তারা শুধুমাত্র শিয়া।

মহম্মদ যেদিন তার নতুন ধর্ম প্রকাশ করেছিলেন সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাস যদি কেউ পড়েন, তিনি বুঝবেন সে ইতিহাস কত রক্তাক্ত। মুসলমানরা অন্যদের থেকে অনেক বেশী রক্ত ঝরিয়েছে মুসলমানদেরই। স্কুলছাত্র হিসাবে আমরা মনে করতে পারি আমরা ইতিহাস বইতে এবং ইসলামি শিক্ষার বইয়ে যুদ্ধ এবং হত্যার কাহিনী পড়েছি লুকোচুরি খেলার উৎসাহ নিয়ে। আমরা বারবার এই কথাগুলি উচ্চারণ করে আনন্দ পেতাম "তারপর সে তার তরোয়াল বার করল এবং তার মুণ্ডু কেটে ফেলল", যেমন একটা আমেরিকান শিশু একটা বার চকোলেট পেয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু এটা করে আমরা কোন ভয় অনুভব করিনি এবং এই হত্যার বৈধতা নিয়ে কখনও প্রশ্ন করিনি।

আমরা হত্যা এবং সন্ত্রাসের ভাষার সাথে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম এবং এতে আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। একজন শল্যচিকিৎসক যেমন রোগীর বুক কেটে অবাঞ্ছিত অংশ কেটে বাদ দিতে দক্ষ হন আমরা ঠিক তেমনি এ বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম। একজন সাধারণ মানুষ অন্য মানুষের বুক চিরে দিতে পারে না যদি না সে সম্পূর্ণভাবে মানবিক বিবেকবর্জিত হয় অথবা একজন শল্যচিকিৎসক হন যিনি তাঁর চিকিৎসা জ্ঞান দিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক দক্ষতা দিয়ে মানবিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন করেন। আমরা এখন আর হত্যা এবং সন্ত্রাসের কথায় নিন্দা করি না, যা আমাদের জীবনে স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এতে এতটাই দক্ষ হয়ে উঠেছি যে একজন শল্য চিকিৎসক যতটা আনন্দের সাথে তাঁর কাজ করেন আমরাও সেই আনন্দ অনুভব করি।

কল্পনা করুন একটা আমেরিকান শিশু ক্লাসে উঠে দাঁড়িয়ে শিক্ষককে বলল: "আমি এই তরবারি দিয়ে শত্রুর মাথা কেটে ফেলব"। শিক্ষক এবং অন্য ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া কি হবে? আমাদের ইসলামি সংস্কৃতিতে জীবনের সকল বিষয়ই এই মৃত্যুর দর্শনের প্রতিফলন। ২০০৫ সালে আমি সিরিয়া গিয়েছিলাম। দামাস্কাসে বাসে বসেছিলাম পাশের শহরে যাওয়ার জন্য। দেখলাম আট বছরের বেশী নয় এমন বয়সের একটি বাচ্চা ছেলে কিছু খবরের কাগজ নিয়ে যাত্রীদের কাছে বিক্রি করার জন্য বাসে উঠল। "বাগদাদে এক বীরত্বপূর্ণ আত্মঘাতী বোমা হামলায় চল্লিশজন আমেরিকান সৈন্যের মৃত্যু" সে চেঁচিয়ে বলল সকলের আগ্রহ জাগাতে। আমি তাড়াতাড়ি একটি কাগজ নিলাম এবং খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম যখন ছেলেটি লাফিয়ে নেমে ভীড়ে মিশে গেল।

আমি কাগজটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলাম কিন্তু কোথাও আমেরিকান সৈন্যের মৃত্যুর উল্লেখ দেখলাম না। আমার হতচকিত অবস্থায় একজন যাত্রীকে বলতে শুনলাম, "ক্ষুদে বেজন্মা আমাদের ঠকিয়েছে!" একটা আট বছরের বাচ্চাছেলেও তাদের মানুষের মানসিকতা খুব ভালো বোঝে এবং নিখুঁতভাবে জানে কিভাবে তাদের আবেগকে ব্যবহার করা যায়। বাগদাদে চল্লিশজন আমেরিকান সৈন্যের মৃত্যু একটা বিশাল খবর যা সিরিয়ার মানুষ একটা রুটির দামের বিনিময়ে আগ্রহের সাথে পড়বে।

সিরিয়ার সাধারণ মানুষ আজ শুধু বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। তারা বেঁচে থাকে এক ভয়ঙ্কর মানসিক অবসাদ নিয়ে, পৃথিবীর ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত এবং মনে হয় তাদের বিষয়ে সম্পর্কহীন। তবুও, চল্লিশজন আমেরিকান সৈন্যের মৃত্যু তাদের কাছে আকর্ষণের বিষয় যা তাদের নিরাসক্তিকে ভেদ করতে পারে। সিরিয়ায় শিশুরা পারিবারিক আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অতি অল্প বয়সেই তারা বাজারের পরিস্থিতি জেনে যায় এবং খুব ভালো বোঝে কিসে তাদের দেশের মানুষ আগ্রহ বোধ করবে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে একটা আট বছরের শিশুও প্রচলিত মানসিক অধঃপতনের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে সে কাগজ বিক্রির

জন্য খবর তৈরী করে। শিশুদের নৈতিক উন্নতির জন্য আরব জগতের মানুষের কোন দায়িত্বই নেই।

সিরিয় সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার আমার ভাইঝিকে গাড়ী চাপা দিয়েছিল যখন সে শহরের একটা ব্যস্ত অঞ্চলে পাগলের মত গতিতে গাড়ী চালাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে আমি তাকে দুর্ঘটনাটি সম্বন্ধে বলতে শুনেছিলাম। তিনি সমস্ত দোষ ঐ ছোট বাচ্চাটির উপর চাপালেন। তিনি বললেন মেয়েটি রাস্তা পরিস্কার আছে কি না সেটা না দেখেই স্কুল যাবার পথে রাস্তা পার হচ্ছিল। এমনকি তিনি মেয়েটির পরিবারকেও দোষারোপ করলেন যে তার বাবা-মা অবহেলা করে কিভাবে রাস্তা পার হতে হয় তা শেখায়নি।

আমি এখনও মনে করতে পারি আমাদের হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্মীরা পথ-দুর্ঘটনায় থেঁতলে যাওয়া দেহের সাথে কতটা অসম্মানের আচরণ করত। একটা ঘটনা আমি জীবনেও ভুলব না। একটি দশ বছরের মেয়েকে জরুরী বিভাগে আনা হয়েছিল যেখানে আমি ডাক্তার হিসাবে কাজ করতাম। মেয়েটি একটা পরিবারে কাজ করত, তার মালিক তাকে কাছাকাছি দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বলছিল। রাস্তা পার হওয়ার সময় একটা ময়লার ট্রাক তাকে চাপা দেয় এবং তার একট পা কাটা যায়। বাচ্চা মেয়েটি অপারেশন টেবিলেই মারা যায় এবং তার পরিবার দেহ নিয়ে যায়। ঘন্টাদুই পর আমি কিছু নোংরা ব্যাণ্ডেজ ফেলতে গিয়ে আতঙ্কে শিরে উঠি, দেখি ময়লার পাত্রে মেয়েটির একটি পা। তদন্তে জানা গেল যে আর্দালি রোগীদের অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায় সে বিবেকবর্জিতভাবে 'পা'টিকে ফেলে দেয়। তার বক্তব্য ওটা অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার কি অর্থ, ডাক্তাররা ওটা জোড়া লাগাতে পারত না।

আমার জীবনে কখনও শুনিনি বা পড়িনি যে একজন মুসলমান তার কৃতকর্মের জন্য কোন অপরাধবোধ প্রকাশ করেছে, এমনকি গল্পেও নয়। মানুষের অপরাধবোধ আসে যখন তার একটা দায়িত্ববোধ থাকে এবং সে স্বীকার করে সে ভুল করেছে। কিন্তু মুসলমানরা অভ্রান্ত: তারা মুসলমান, শুধু এই কথাটুকুই তাদের সকল

ভুলের উর্দ্ধে নিয়ে যায়। একজন মানুষের ইসলামে বিশ্বাস তার কাজ এবং দায়িত্বে প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের বাণী উচ্চারণে: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই, এবং মহম্মদ সেই ঈশ্বরের প্রেরিত দূত"। যতদিন সে এই বিশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করবে ততদিনই সে মুসলমান, এবং সে অন্যের বিরুদ্ধে এমন কোন অপরাধ করতেই পারে না যা তাকে বিচ্যুত করতে পারে। সাদ্দাম হুসেইন ইতিহাসের অন্যতম ভয়ঙ্কর অত্যাচারী, কিন্তু অধিকাংশ সুন্নী মুসলমান মনে করে তিনি শহীদ। তার অন্ত্যেষ্টিতে তারা উচ্চারণ করেছে: "স্বর্গে নিয়ে যাও, হে প্রিয় ঈশ্বর"।

একজন মানুষের প্রথম নৈতিক শিক্ষা হল "হ্যাঁ" এবং "না" এর ধারণার প্রভেদ— অর্থাৎ কোনটা গ্রহণ করতে হবে আর কোনটা বর্জন করতে হবে তা স্থির করার ক্ষমতা। মানুষ এই শিক্ষা লাভ করে তার জীবনের প্রথম বছরে, এবং এটাই তার ভিত্তি যা তার সামগ্রিক নৈতিক কাঠামোকে দাঁড় করিয়ে রাখে। এই ভিত্তির শক্তিই নির্ধারণ করে সৌধের ক্ষমতা এবং জীবনের বিরুদ্ধতাকে সহ্য করার ক্ষমতা।

একজন মুসলমান সারাজীবন অতিবাহিত করে এবং মারা যায় কখনও এই শিক্ষা গ্রহণ না করে। ইসলামি সংস্কৃতিতে "হ্যাঁ" এবং "না" এর কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। দুই বিপরীতকে এমনভাবে গুলিয়ে দেওয়া হয় যে অন্য একজনের কাছে মুসলমানদের আচরণ অবোধ্য হয়ে ওঠে। মুসলিম সংস্কৃতি এই দুই ধারণার পরিবর্তে তৃতীয় একটিকে ব্যবহার করে যা ঐ দুটিকে মিশিয়ে তাদের পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে দেয়। এই তৃতীয় ধারণাকে প্রকাশ করা হয় একটি কথায় 'ইনশাল্লাহ' (যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন)। যদি আপনি কোন মুসলমানকে প্রশ্ন করেন যার উত্তর হয় 'হ্যাঁ' বা 'না', সে উত্তর দেবে ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ নির্দিষ্টভাবে হ্যাঁ বা না বোঝায় না। এর অর্থ ঈশ্বরই এর উত্তর জানেন, এবং ঈশ্বরই সিদ্ধান্ত নেবেন। ইনশাল্লাহ, এই শব্দটি মুসলমানদের দায়িত্ব এড়াতে সাহায্য করে। তারা যে সিদ্ধান্তই নিক তার জন্য তাদের দায়ী করা যাবে না, কারণ ঈশ্বর তাদের জন্য এটা করেছেন এবং তার ফলাফল, ভাল

মন্দ যাই হোক, সেটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আপনি যদি কোন মুসলমানকে বলেন, "তুমি কি কাল দুপুরে আমাদের সাথে খাবে?" সে উত্তরে বলবে ইনশাল্লাহ। অবশ্যই সে বলছে না "হ্যাঁ, আমি আসব" বা "না, আমি আসব না"। যদি সে আসে, তাহলে ঈশ্বর তাকে আসতে দিয়েছে; আর যদি সে না আসে, তাহলে সেটাও ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারিত ঐশী কারণ, এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার কারও নেই!

আমি শেষবার যখন সিরিয়া যাই, একদিন সন্ধ্যায় আমি আমার ভাই-এর পরিবারের সাথে ছিলাম। আমার নয়-বছর-বয়সী ভাইঝি সারাহ আমাকে আমেরিকা সম্বন্ধে, বিশেষত হলিউড বিষয়ে এক ঝাঁক প্রশ্ন করে বিস্মিত করে দিল।

তুমি হুইটনি হাউস্টনকে চেন? তার সাম্প্রতিক গানটা শুনেছ? আমার নিকোল কিডম্যানকে খুব ভাল লাগে, কিন্তু টম ক্রুজের সঙ্গে ওর বিয়েটা ভাল হয়নি!"

"ব্রিটনি স্পিয়ার্সের কোন গানটা তোমার সবথেকে বেশী ভাল লাগে?"

শেষে আমি তাকে প্রশ্ন করছিলাম আর সে উত্তর দিচ্ছিল। আমি বুঝলাম আমি আমার বাড়ীটাকে বা আমার রান্নঘরের বাসনগুলিকে যতটা জানি, সে তার থেকে অনেক বেশী হলিউডকে জানে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি আমার কাছে আমেরিকায় আসছ না কেন? তাহলেই তো তুমি হলিউডে যেতে পার?

তার যেন দম বন্ধ হয়ে গেল, অন্ধকার রাতে তারার মত উজ্জ্বল চোখে বলল, "আমি যেতে পারি?"

"অবশ্যই" আমি বললাম। "আমি খুব খুশী হব এবং আমি তোমার যাতায়াতের খরচ দেব"।

সারাহ দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, "মা, আমি আমেরিকায় পিসির কাছে যেতে পারি?" তার মাকে উত্তর দেওয়ার সময় না দিয়ে সে বলল, "বোলো না ইনশাল্লাহ!"

সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল, কিন্তু, আমার কান্না পেয়েছিল! সারাহ দামাস্কাসের আমেরিকান দূতাবাসে ভিসার জন্য দরখাস্ত করেছিল কিন্তু অনুমোদন

পায়নি। সে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলেছিল, "পিসি, আমি খুব দুঃখী। ঈশ্বর চায় না আমি আমেরিকায় তোমার কাছে যাই!" এই প্রথম ঈশ্বরকে দোষারোপ করা হল আমেরিকার অপরাধের কারণে, উল্টোটা না করে।

আমার ভাইঝি, তার অল্প বয়স সত্ত্বেও, সম্পূর্ণভাবে জানত ইনশাল্লাহ মানে হ্যাঁ ও নয় না ও নয়। সে মাকে অনুরোধ করেছিল শব্দটি না বলতে, সে যেটুকু বোঝে তাতে যে অস্পষ্টতা প্রকাশ পায় তা তার মন মানতে রাজী নয়। বরং তার মা যদি ইনশাল্লাহ না বলে সরাসরি না বলত সেটাও তার কাছে বাঞ্ছনীয়।

একটু মাথা দোলানো বা মৃদু হাসি সম্মতি বোঝাতেও পারে আবার নাও পারে। যখন কোন আরব কোন চুক্তি প্রত্যাহার করে তখন সে যুক্তি দেয় প্রথমত সে কখনই সম্মত হয়নি যেহেতু হ্যাঁ বলেনি, শুধুমাত্র মৃদু হেসে ছিল বা মাথা নেড়েছিল। এই দ্ব্যর্থক অর্থ অন্যদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক খামখেয়ালী ও অনির্দিষ্ট করে তোলে, এবং মানুষের পক্ষে তাদের বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে ওঠে। যে মানুষ হ্যাঁ এবং না এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না এবং কোন বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে না, সাধারণভাবে বলা যায় তার ধারণা দিশাহীন। তাদের নৈতিক গঠন ভঙ্গুর এবং যে প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না, তেমন প্রশ্নের সম্মুখে ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। এই নৈতিক ভঙ্গুরতা আজকের মুসলমানদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করে, বর্তমান বিশ্বের সাথে যোগ রাখা তাদের পক্ষে কঠিন, অবিরত তারা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যেখানে গ্রহণ বা বর্জন স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন—"হ্যাঁ" বা "না" জানাতে হবে—স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে।

আল জাজীরাতে দ্বিতীয়বার আমার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল যখন আমি সভ্যতার সংঘর্ষ বিষয়ে আলোচনার জন্য তাদের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি মনে করেন এই সংঘর্ষ মুসলমানদের পশ্চাৎপরতা এবং আধুনিক সভ্যতার, যে সভ্যতা পাশ্চাত্যে দেখা যায়? আমি দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, আমি সেটাই বলতে চাই"। এই উত্তর আরব জগতে বিপুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যা নিয়ে একটা গোটা বই লেখা যায়।

সবথেকে কৌতূহলোদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ছিল একজন মিশরীয় আইনজীবির একটা ই-মেল, যিনি লিখেছিলেন: "যখন আমি প্রশ্নটা শুনলাম আমি এক মূহুর্তের জন্যও ভাবিনি যে আপনি এছাড়া অন্য কিছু বলবেন যে, 'না, আমি তা বলতে চাইনি, আপনি ভুল বুঝেছেন', এবং তারপরে এলোমেলো বিভিন্ন কথা বলবেন, যেমন মুসলমানরা কোন সরাসরি উত্তর দেয় না। কিন্তু আমি যখন আপনার উত্তর শুনলাম আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম, পাগলের মত ঘরময় নাচতে নাচতে চেঁচাচ্ছিলাম, 'কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ'!" আপনি মুসলিম জগতে কাউকে এমন প্রশ্ন করতে পারবেন না যার উত্তরে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় এবং উত্তরে আশা করবেন একটি সুনির্দিষ্ট "হ্যাঁ" বা "না"।

বহু বছর আগে, আমি আমেরিকাতে বাস করতে আসারও আগে, এক পশ্চিমী সাংবাদিক একটি সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল-আসাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "যদি আপনি ইজরায়েলের সাথে একটি শান্তি চুক্তি করেন, আপনার দেশ কি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে?" আসাদ বাকচাতুরী শুরু করলেন এবং কোন নির্দিষ্ট উত্তর দিলেন না। সাংবাদিক আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি কি "হ্যাঁ" বা "না" এমন উত্তর দিতে পারেন?" কিন্তু তিনি আবার বিভিন্ন কথা বলতে শুরু করলেন, শেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারিণী স্পষ্টতই বিরক্ত হয়ে অন্য প্রশ্ন করলেন। যখন মানুষ স্পষ্টভাবে "হ্যাঁ" বা "না"-এর পার্থক্য করতে পারে না, তারা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। ফলে তারা অন্য কারো সাথে সুস্থ এবং সফল সম্পর্ক রক্ষা করতে পারে না। মানুষ তার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ থাকে জিভের দ্বারা, গোড়ালির হাড় দিয়ে নয়।

মুসলিম সমাজে সম্পর্ক চালিত হয় স্বার্থ আর প্রয়োজন দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে নয়। এমন সম্পর্ক ঠিক ইনশাল্লাহ শব্দের মত দ্ব্যর্থবোধক, যা আমরা আগেই বলেছি এবং এই শব্দ আপনি মুসলিম জগতে সর্বত্র সর্বক্ষণ শুনবেন। এই সমাজে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব যা তাদের নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে চালিত

করে। যখন লোকে তাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ব্যর্থ হয় তখন ঈশ্বরের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়, বলে ‘এটা তার ইচ্ছা ছিল না’ এবং ‘তুমি ভুল বুঝেছিলে’ বলে নিজের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা দেয়। যখন বলেছিলাম ইনশাল্লাহ তখন আমি এটা বোঝাইনি যে আমি এটা করব।

দু’বছর আগে সিরিয়া গিয়ে আমি একটি ফরাসী প্রবাদের সত্যতা অনুভব করলাম: “মাছ যে জলে সাঁতার কাটে সেই জলকে সে দেখতে পায় না”। সিরিয়ার সমুদ্রে আমার জীবনের তেত্রিশ বছর সাঁতার কেটেছি কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আমি সেই জলকে দেখতে পাইনি। পনের বছর আমেরিকাবাসের পর আমি যখন ফিরলাম তখনই স্পষ্ট দেখলাম তার প্রকৃত রূপ। যদিও সেখানকার জীবনে অসন্তুষ্টি আমাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল, তবু সেই সময় আমি সম্পূর্ণভাবে বুঝিনি সেই অসন্তুষ্টির চেহারা এবং কারণ। পনের বছরের অনুপস্থিতির পর আমেরিকায় আমার অভিজ্ঞতায় সেই জলের প্রকৃত রূপ আমি দেখেছি যে জলে আমি সাঁতার কেটেছিলাম।

আমি সেই জলের গভীরে গিয়ে আমার ক্ষমতা অনুযায়ী অণুবীক্ষণের নীচে তার উপাদান পরীক্ষা করলাম। আমি যা দেখলাম তা শুধুই ব্যাকটেরিয়ার একটা উপনিবেশ যেমন আমরা মেডিকেল কলেজে মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে দেখতাম। যদিও মানুষ এই তুলনাকে না মানতে পারে, কিন্তু এটাই উপযুক্ত উদাহরণ। যে সমাজে আইনের শাসনের বদলে জঙ্গলের আইন চলে: সেখানে সবল দুর্বলকে গিলে ফেলে, এবং উভয়েই সেই স্থিতাবস্থাকে অনিবার্য ঐশ্বরিক আদেশ বলে মনে করে।

আমি এক মহিলার সাথে দেখা করলাম যে সিরিয়া ত্যাগের আগে আমার নিকট বন্ধু ছিল। সে সময়ে আমার মতই তার অর্থনৈতিক অবস্থা ঈর্ষা জাগানোর মত কিছু ছিল না। যখন আবার আমাদের দেখা হল, আমি বিস্মিত হলাম দেখে যে সে সিরিয়া সরকারের একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং তখন থেকে সোনা, রূপা যেন বৃষ্টির মত তার উপর ঝরে পড়েছে। গুজব আছে, সে ঐ পদে নিযুক্ত হয়েছে কারণ তার সাথে একজন প্রভাবশালী লোকের সন্দেহজনক সম্পর্ক আছে, যদিও সে বিবাহিতা এবং সন্তানের মা।

আমি তার বাড়ীতে গিয়েছিলাম, সে আমাকে সাদর স্বাগত জানাল। আমার জীবনে আমি এমন বিলাসিতা দেখিনি, এবং তার বাড়ীর রাজকীয়তা এবং সজ্জায় আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। সে তার ইউরোপ যাত্রার কথা বলতে শুরু করল এবং বেড়াতে গিয়ে যেসব মণি-রত্ন কিনেছে সেগুলি দেখাল। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল সিরিয়ার মানুষের করুণ দুর্দশার প্রসঙ্গ তুলতে, এবং দ্বিধাহীনভাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সামিরা, এটা কি ঠিক যে তুমি এমন বিলাসের জীবন যাপন করবে আর সিরিয়ার দশজন মানুষের ন'জন তীব্র দুর্দশায় জীবন কাটাবে?" সে কোনরকম লজ্জা বোধ না করে বলল, "কিন্তু এ তো ঈশ্বরের ইচ্ছা, ওয়াফা। একমাত্র তিনিই জানেন কেন"।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে ঈশ্বরের কি করার আছে?"

"তুমি কি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অস্বীকার করতে চাইছ, ওয়াফা? তুমি নিশ্চয়ই আমেরিকানীয় হয়ে গেছ"। তারপর সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, "তুমি কোন সুগন্ধী পছন্দ কর? আমার কাছে বিভিন্ন ধরনের অনেক সুগন্ধী আছে এবং আমি তোমাকে কয়েকটা দিতে চাই"।

আমি মজা করে বললাম, "হ্যাঁ, আমি আমেরিকানীয় হয়ে গেছি কিন্তু সামিরা, আমেরিকাতে মানুষ সুগন্ধী ব্যবহার করে না, তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের খাবার জোগাড় করে!"

ইসলামি রাষ্ট্রগুলি এই স্থবিরতার ফল ভোগ করে কারণ মুসলমানরা রোবোটের পর্যায়ে নেমে গেছে এবং পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রম পালন করে যা স্থান এবং কালের অনুপযুক্ত। এই পরিস্থিতি বাকী বিশ্বে কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি বিংশ শতাব্দীর শেষ এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত। গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে নতুন নতুন কারিগরি উদ্ভাবন যাতায়াত এবং যোগাযোগের উন্নতির মাধ্যমে পৃথিবীকে ছোট করে দিল এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে তাকে একটা ছোট গ্রামে পরিণত করে ফেলল। আমাদের পৃথিবীর আবাস যত ছোট হয়ে এল, মুসলমানরা বাইরের মানুষের সংস্পর্শে

এল, যাদের কাছে ইসলামি আইন এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ অপরিচিত। মুসলমানরা এই নতুন বাস্তবতার সাথে মানিয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়ল।

প্রায় তিরিশ বছর আগে সিরিয়া সরকার দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সাথে উত্তরে আলেপ্পো পর্যন্ত রেলরাস্তা তৈরী করেছিল। চালু হওয়ার পর ট্রেন বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিত সিরিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়ে, যেখানে বেদুইন পশুপালকরা তাদের পালিত পশুদের নিয়ে বাস করত। এর ফলে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল: এই বেদুইনরা পাথর ছুঁড়তে শুরু করল যখন ট্রেন তাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে যেত, গাড়ীর জানালার কাঁচ ভাঙত, যাত্রীরাও আক্রান্ত হত। ট্রেন না চলে যাওয়া পর্যন্ত তারা পাথর ছুঁড়তেই থাকত, তারপর পালিয়ে তাদের তাঁবুতে অদৃশ্য হয়ে যেত।

এই অবস্থা চলল বেশ কয়েক বছর ধরে, অবশেষে সিরিয়া সরকার অপরাধী বেদুইনদের খুঁজে বার করার জন্য পরিদর্শক এবং বিশেষ বাহিনী নিয়োগ করতে বাধ্য হল। পিছনে তাকিয়ে আমি যখন এই ঘটনা মনে করি তখন মনে হয়, বেদুইনরা তাদের মরুজগতে এই কিম্ভূতদর্শন যন্ত্রদানবের প্রবেশে ভয় পেয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত তাদের মরুভূমি ছিল অখণ্ড নিস্তব্ধতায় ঢাকা। ট্রেনের গর্জনকে তারা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত এলাকায় আক্রমণ এবং তাদের জীবনের উপর প্রকৃত বিপদ মনে করেছিল। সে কারণে তারা তাদের জগৎকে রক্ষার জন্য যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা একটুও না ভেবে ট্রেন ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিল।

ঠিক এই ঘটনা ঘটেছে অপরিবর্তনীয় জগতে বাস করা মুসলমানদের। যে যাযাবর জনবিরল জায়গায় (আরব উপদ্বীপের বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি) ঘুরে বেড়াত, তাকে যেন হঠাৎ তার উটের পিঠ থেকে তুলে নিয়ে প্লেনের সিটে বসিয়ে দেওয়া হল আর সে দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে প্যারিস, নিউ ইয়র্ক বা কোপেনহেগেনের রাস্তায়। বাড়ী ফিরে একদিন সকালে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল অদ্ভুতদর্শন বিশাল আকৃতির যন্ত্র মরুভূমিতে গর্ত খুঁড়ছে তেলের খোঁজে, কিছু লোকের নির্দেশে কাজ হচ্ছে যাদের চেহারা কারো সাথে বা কিছুর সাথেই মেলে না

যেমন তারা আগে দেখেছে। সেই দৃশ্য তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং তারা দেখল এটা তাদের বিশ্বাস এবং জীবনধারার উপর বিপদবিশেষ।

মুসলমানরা পৃথিবীর নতুন চেহারার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি এবং নিজের দেশে কিংবা অভিবাসী হিসাবে অন্য দেশে নতুন জীবনধারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে যা তাদের ধর্মীয় আইন এবং বিশ্বাসের সাথে মেলে না। এই নতুন অবস্থাকে গ্রহণ বা বর্জন উভয়ই তাদের তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

একদিকে পাশ্চাত্যের কারিগরি মুসলমানদের জীবনধারায় অঢেল সুখ-সুবিধা দিয়েছে, যা তারা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি, যার উপরে তারা নির্ভর করে। আবার অপরদিকে, যে শিক্ষা, ধারণা এবং ধর্মীয় আইন নিয়ে তারা বড় হয়েছে তার সাথে এই নতুন জীবনধারার কোন সম্পর্ক নেই, সামঞ্জস্যও নেই।

যে মুসলমানরা তাদের দেশের বাইরে বাস করে তাদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট। এইসব মানুষদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব এক ধরণের অবসাদ এবং অসুখী অবস্থা সৃষ্টি করে যা এক নজরে চোখে পড়বে যদি কেউ পশ্চিমে বাস করা মুসলমানদের মানসিকতার গভীরে দৃষ্টিপাত করেন। এই আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব মুসলমানদের কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করে যার উত্তর তাদের কাছে নেই। যে মানুষদের মাঝে তারা বাস করে, তাদের বিশ্বাস সেই মানুষদের উপর আস্থা রাখতে, বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে বা অধীনে কাজ করতে দেয় না; ফলে এই গ্রহণ এবং বর্জনের মাঝে তাদের জীবন যেন ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে যায়। ইসলাম স্পষ্টভাবে কোথাও কাজ করতে মুসলমানদের নিষেধ করে যেখানে তাদের মালিক কোনও অমুসলমান। পশ্চিমের জীবন মুসলমানদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত করেছে এবং তাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করেছে যা মুসলিম জগতের অভিজাতরাও কল্পনা করতে পারে না, কিন্তু সেই সাথে তাদের সন্তানদের এমন জীবনধারায় অভ্যস্ত করেছে যা তাদের ধর্মীয় আইনে গ্রহণযোগ্য নয়।

এই দ্বন্দ্ব মুসলমানদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। যখনই কারো মধ্যে আমি এই হতাশা লক্ষ্য করি আমি তার সাথে আমেরিকার জীবনধারা এবং মুসলিম এবং পশ্চিমী সমাজের তফাৎ নিয়ে আলোচনা করি। আমার এই উদ্যোগ কোন ফলের আশায় নয়, কারণ তা আমার সাধ্যের বাইরে। বরং মানুষ উদ্দীপ্ত হয় এবং আলোচনায় অংশ নেয়; যার মাধ্যমে আমি তাদের মনের গভীরে যা কিছু লুকিয়ে আছে তা মেলে ধরতে পারি। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই হতাশা তাদের নতুন সমাজের সবকিছুর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ক্রোধের জন্ম দেয়।

একবার লস এঞ্জেলেসের আরবি ভাষায় প্রকাশিত একটি কাগজের সম্পাদক আমার একটি প্রবন্ধের উত্তরে লিখেছিলেন: "আমেরিকা তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে...নৈতিকভাবে দুর্বল সমাজের জীবন তাকে অন্ধ করে ফেলেছে", এবং সেইমর্মে প্রচুর পাঠকের মত প্রকাশ করলেন, যার প্রতিটিই আমেরিকার সমাজকে নৈতিকভাবে দুর্বল এবং সেই সমাজের মেয়েদের বিক্রয়যোগ্য বলে বর্ণনা করেছে। শেষে লিখেছেন: "ওয়াফা সুলতান ঐ নারীদের গুণমুগ্ধ বলে মনে হয়"। আমার উপরে এই আক্রমণের বেশ কিছু বছর আগে সম্পাদক ভদ্রলোকের স্ত্রীর সাথে আমার দেখা হয়। তিনি বলেছিলেন যে লেবাননের গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচতে তারা আমেরিকায় পালিয়ে এসেছেন, যে যুদ্ধে তিনি তার ভাই এবং বোনকে হারিয়েছেন এবং তার স্বামী, সম্পাদক ভদ্রলোক হারিয়েছিলেন তার পরিবারের অধিকাংশকেই।

সম্ভবত পশ্চিমের বহু মানুষই জানে না লেবাননের গৃহযুদ্ধ চলেছিল সতের বছর ধরে, বহু যুবককে কেটে ফেলা হয়েছিল, বয়স্কদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল, দশ লক্ষের উপর মানুষ নিহত, গুরুতর আহত এবং গৃহহারা হয়েছিল, যে দেশে মোট জনসংখ্যা চল্লিশ লক্ষের বেশী নয়। ইতিহাসে এর থেকে কুৎসিৎ যুদ্ধ আর নেই। পরিচয়পত্র দিয়ে শিকার বাছাই হত। লেবাননে পরিচয়পত্রে শুধুমাত্র ধর্মের উল্লেখই থাকে না, সেই সঙ্গে বিশেষ গোষ্ঠী বা গোত্রের উল্লেখও থাকে। যাদের পকেটে পরিচয় পত্র নেই তাদের খুন করা হত নামের ভিত্তিতে; কারণ অধিকাংশ মুসলিম দেশের মত লেবাননেও কোন মানুষের নামই প্রকাশ করে সে কোন ধর্মের মানুষ।

সম্মানিত সম্পাদক এবং তার গর্ভবতী স্ত্রী দেশ থেকে পালিয়েছিলেন এবং আমেরিকাতে আশ্রয় চেয়েছিলেন। তার স্ত্রী স্বীকার করেছিলেন যখন তার সাথে আমার দেখা হয় তখনও পর্যন্ত তারা সরকারী অনুদানের উপর বেঁচেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন কিভাবে এখানকার বিভিন্ন আরবরা তার এবং তার পরিবারের সাথে ভীতিপ্রদ আচরণ করেছিল এবং অভিযোগ করেছিলেন আরবদের যুক্তির বিরুদ্ধে যা তারা নিজের দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল। তবুও, আমার গ্রহণ করা সমাজের পক্ষে লেখা প্রবন্ধ পড়ে; যে সমাজ আমাদের এত সুবিধা দিয়েছে, সুউচ্চ নৈতিক মানসিকতা সহ আমাদের স্বাগত জানিয়েছে এবং আমাদের সাথে ব্যবহার করেছে, তার স্বামী তাদের নীতিবোধ, প্রথা এবং ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করে তুলে ধরতে বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু সর্বদা এটাই মুসলমানদের চরিত্র, যা স্পষ্ট একটা আরবি প্রবাদে: "যদিও সে এটাকে উড়তে দেখছে, তবুও জোর দিয়ে বলবে এটা হাঁস নয়, ছাগল" অথবা অন্য কথায়: "যে দেখবে না তার মত অন্ধ আর হয় না"।

নতুন সমাজের জীবনে তারা যত দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে থাকুক, এবং এ দেশের সমাজিক আইনের সুরক্ষায় যতটা আরামদায়ক এবং স্বাধীন জীবন তারা উপভোগ করুক না কেন, তবুও তারা বলবে পশ্চিমিরা অনৈতিক, মুসলমানরা তাদের নৈতিক অভ্যাস এবং নীতিতে আবদ্ধ। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, "তাহলে মুসলমান নারীরা কেন আমেরিকার আদালতে বিবাহবিচ্ছেদ এবং সন্তানের অধিকারের জন্য আবেদন করে?" তারা বলে, "ঐ বিশেষ মহিলা একটা ব্যতিক্রম। সে সমগ্র মুসলমান নারীদের প্রতিনিধিত্ব করে না"।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম নারীরা সাধারণত তাদের স্বামীর দুর্ব্যবহার বা অত্যাচার সহ্য করে না। তারা দেশে যেমন নত হয়ে মেনে নিত তার পরিবর্তে তারা আমেরিকার আদালতে বিবাহবিচ্ছেদ চায়। তারা তাদের গ্রহণ করা সমাজের আইন ব্যবহার করে সন্তানের অধিকার পায় এবং সন্তানের জন্য খরচ দিতে স্বামীকে বাধ্য করে। কিন্তু এই মহিলাই, যদি আপনি তার গ্রহণ করা সমাজের নৈতিকতা বিষয়ে

তার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন, সে আপনাকে অন্তহীন বক্তৃতা দিয়ে যাবে আমেরিকার নৈতিকতাকে গালাগালি করে এবং মুসলমান সমাজের ইসলামি আইন ও নৈতিকতার প্রশংসা করে।

একবার লং বীচ, ক্যালিফোর্নিয়াতে গাড়ীর তেল বদলের জন্য একটা গাড়ী মেরামতের দোকানে অপেক্ষা করছিলাম। মালিক একজন প্যালেস্টিনিয় যুবক, তার কর্মচারীদের অধিকাংশ আরবি-ভাষী যুবক। আমি যখন আমার পালার জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন একটি গাড়ী এসে দাঁড়াল এবং একজন মধ্য প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্যযুক্ত লোক গাড়ী থেকে নেমে মালিককে আরবি ভাষায় অভিনন্দন জানাল এবং মালিক একটু রাগের সাথে উত্তর দিল, "এত দেরী কেন? আমরা সকাল থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি"।

লোকটি বলল, "আমি আজ সকালেই আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়েছি এবং আনুগত্যের শপথ নিয়ে এখন ফিরছি।

আমি তার দিকে তাকিয়ে আরবিতে বললাম, "অভিনন্দন!" তিনি আমার দিকে ঘৃণাভরা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি জন্য আমাকে অভিনন্দন জানালেন? আমেরিকার নাগরিকত্ব এই জুতোর সোলের থেকেও নিকৃষ্ট," বলে জুতোর দিকে দেখালেন।

আমি বিরক্তি চাপতে পারলাম না, বললাম, "কিন্তু আপনি এইমাত্র এই দেশের প্রতি আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করে এলেন, স্বইচ্ছায় এদেশের নাগরিকত্ব নিলেন!"

তিনি একটু হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বোন, আপনি কি মুসলমান?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এ ক্ষেত্রে ধর্ম কিভাবে জড়িত?" আমরা প্রায় আধঘন্টার উপরে তর্কাতর্কি করলাম এবং শেষে রাগে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ী নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলাম। এই ঘটনার পাঁচমাস পরে আমি শুনলাম ঐ ভদ্রলোকের কুড়ি বছর বয়সী ছেলে রহস্যজনক ভাবে আত্মহত্যা করেছে। তার দেহ পাওয়া গেল একটি পার্কে, পাশে পড়েছিল একটি পিস্তল যা দিয়ে সে নিজেকে গুলি করেছে। সে তার অফিসের দেরাজে বাবা-মার জন্য একটি চিঠি রেখে গেছে। আরবি-ভাষী লোকেদের

মধ্যে গুজব ছড়িয়েছিল যে ছেলেটির মৃত্যুর পিছনে তার বাবা। তিনি জোর করেছিলেন ইসলামি আইনের শিক্ষা অনুযায়ী কঠোর জীবন যাপন করতে, এবং ছেলেটি ছ'মাস আগে অবসাদে আক্রান্ত হয় নিজের হাতে মৃত্যুর আগে।

মুসলমানরা অন্য ধর্মের মানুষদের থেকে ধর্মের প্রতি আনুগত্যের গুণগত এবং মাত্রাগত দিক থেকে আলাদা। আমার কোন সন্দেহ নেই যে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছে এবং মুক্ত খোলামেলা জীবন উপভোগ করতে শুরু করেছে সে নিজের দেশে হোক বা যে দেশে তারা অভিবাসন নিয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনধারা যেমনই হোক এই মুসলমানরা ধর্মের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ। আপনি যদি তাদের মধ্যে সবথেকে খোলামেলা মানুষের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে তাদের জীবন আচরণে মূল কিছু বিষয় ইসলামের শিক্ষার বিরোধী, তারা একমুহূর্ত দ্বিধা না করে স্বীকার করবে যে তারা দোষ করছে। তারা বলবে, ভুলটা ইসলামের শিক্ষার নয়, ভুল তাদের নিজের আচরণে যা অনেকাংশে ইসলামের শিক্ষা থেকে আলাদা।

এই অন্তর্দ্বন্দের কারণে মুসলমানরা অনেক মূল্য দিয়েছে। আধুনিক জীবনধারা মানসিকভাবে তাদের দিশাহারা করে দিয়েছে এবং তাদের মনে অনুশোচনার জন্ম দিয়েছে। তাদের এই অনুশোচনার কারণ হল একদিকে তারা যে ধারায় জীবনযাপন করে তা ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে মূলগত ভাবেই সাংঘর্ষিক, এবং অপরদিকে ইসলামের শিক্ষা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে না। তারা স্বীকার করতে চায় না যে আধুনিক জীবন তারা যাপন করে সেটা ইসলামি আইনে চালিত জীবনের চেয়ে ভাল, এটাও মানতে চায় না যে ইসলামি আইনের শিক্ষা সৃষ্টিশীল, দক্ষ আধুনিক জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্যহীন। তারা জানে না কোনটা গ্রহণ করা উচিৎ এবং দু'টো বিপরীতমুখী ঘোড়ায় চেপে চলতে থাকে।

উপসাগরীয় অঞ্চলে তেল আবিস্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত মুসলমানরা আদিম জীবন যাপন করত। তারপর চোখের পলকে আধুনিক পৃথিবী তাদের তাঁবুর উপরে

ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের জগৎটাই বদলে দিল বিশাল প্রসাদ, আকাশচুম্বী বাড়ী, গাড়ী, কারিগরী দক্ষতা দিয়ে এবং অটুট নৈঃশব্দের পরিবেশকে শঙ্কিত করে তুলল। দুবাই-এর অবস্থান মরুভূমির একেবারে কেন্দ্রে যেখানে ইসলামের জন্ম। জীবনের চিহ্নহীন ঊষর মরুভূমি ছাড়া তিরিশ বছর আগে দুবাই আর কি ছিল? এবং আজ সে কি? আজ সে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র। একজনের একরাত্রি যে কোন হোটেলে শুধু থাকার খরচ সত্তর ডলার । আমি শুনেছিলাম যখন আমি একরাত্রি দুবাই হোটেলে ছিলাম তার জন্য খরচ সাতশ’ ডলার!

যখন মানুষ একরাত্রিতে প্রস্তরযুগ থেকে এরোপ্লেন, ইনটারনেটের যুগে পৌঁছায় তারা একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যায়, এবং একটা অবসাদে আক্রান্ত হয় এবং আরও মানসিক অসুখে ভোগে, বিশেষত তারা যদি প্রাণপণে তাদের পূর্বেকার শিক্ষা এবং সামাজিক পরিবেশ আঁকড়ে থাকে। মুসলমানেরা হামাগুড়ি দিতে শেখার আগে দৌড়াতে গিয়েছে এবং একটা মই-এ উঠতে চেষ্টা করেছে যার কাছেই তারা পৌঁছাইনি।

পশ্চিম জোর করে নিজেকে, তার কারিগরিকে, এবং তার সংস্কৃতিকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করেনি এবং তাদের পরিবেশকেও বুঝতে চায়নি। পশ্চিম যা দিয়েছে মুসলমানরা সচেতনভাবে তা গ্রহণ করেছে, কিন্তু মনের গভীরে অবচেতনে তা প্রত্যাখান করেছে। এই গ্রহণ এবং বর্জনের দোলাচল তাদের মনে দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

আমি সম্প্রতি কাতার গিয়েছিলাম, তেল-সম্পদে ধনী ছোট্ট একটা উপসাগরীয় দেশ, দ্রুত আর একটি দুবাই-এ পরিণত হতে চলেছে। সেখানে পথে যেতে যেতে মনে পড়বে ক্যালিফোর্নিয়ার পাম স্প্রিংস। আপনি কাতারের বাজারে মানুষকে দিনের সর্বক্ষণ কেনাকাটা করতে দেখবেন, যেন তাদের আর কিছু করার নেই, পুরুষরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোষাকে, নারীরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত বোরখায় ঢাকা। নারীটি পুরুষের কয়েক পা পিছনে, তার পিছনে চাকর যে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আছে। তারা

চলে সাঁজোয়া বাহিনীর মত পদমর্যাদা অনুযায়ী কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলায়। সর্বত্র প্রচুর কফির দোকান এবং সেগুলি থেকে লাউডস্পিকারে কোরআন তিলাওয়াত হচ্ছে। কফি খেতে খেতে আমি এই আয়াতটি শুনলাম: "এবং তিনি তোমাদের চড়বার জন্য সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর, এবং গাধা" (১৬:৮)। এই আয়াত এখনও পাঠ করা হয় যদিও সারা কাতারে একটিও গাধা বা খচ্চর নেই। মুসলমানদের অবচেতনে ঘোড়া এবং খচ্চর লড়াই করে প্লেনের সাথে যা পশ্চিমীরা নির্দয়ভাবে চাপিয়ে দিয়েছে তাদের চেতন মনের উপরে। মুসলমানরা সেই লড়াই-এর শিকার।

ঈশ্বর মুসলমানদের দিয়েছেন গাধা এবং খচ্চর আর পশ্চিমীরা দিয়েছে যাতায়াতের নতুন পদ্ধতির মালিকানা, কিন্তু তারা পশ্চিমের অবদানের মাত্রাকে স্বীকার করতে পারে না কারণ তারা মনে করে এটা ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ। চেতন মনে তারা পশ্চিমের কীর্তিকে গ্রহণ করেছে কিন্তু অবচেতনে ঈশ্বরের কীর্তিই প্রধান এবং সর্বোচ্চ মহান। মহম্মদ তার অনুসারীদের কাছে ঈশ্বরের ক্ষমতার পরিমাণ চিত্রিত করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র এই বলে যে তিনি গাধা এবং খচ্চর তাদের সেবার জন্য দিয়েছেন যাতে তারা ওদের পিঠে চড়তে পারে। তারা চিন্তা করল এ যদি ঈশ্বরের ক্ষমতার জন্য না হয় তবে গাধা এবং খচ্চর আমাদের বহন করতেই পারত না; সুতরাং তারা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করতে থাকল।

পশ্চিমী দেশগুলি যখন তাদের আধুনিক যাতায়াতের যন্ত্র দিয়ে মরুভূমিতে ঝড় তুলে দিল, মুসলমানরা গাধা এবং খচ্চরকে প্রকৃতির দয়ায় ছেড়ে দিয়ে পশ্চিনের উপহার গ্রহণ করল—সন্তুষ্টির সাথে, যদিও কখনই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নয়। আমি একজন মুসলিম মহিলাকে চিনি যিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকেন। তিনি প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং তার আত্মবিশ্বাসের জন্য খ্যাত। তিনি আমেরিকার জীবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন, দু'বার বিয়ে করেছেন এবং বিবাহ-বিচ্ছিন্না হয়েছেন এবং আমেরিকার বিচার ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে প্রাক্তন স্বামীদের থেকে আইন অনুযায়ী যা পাওয়া যায় তা পাওয়া নিশ্চিত করেছেন। আমি একবার তাকে

একটি আরব উপসাগরীয় টেলিভিশন চ্যানেলে তার সাক্ষাৎকারে দেখেছিলাম। সঞ্চালক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি মাথা ঢাকেন না কেন?”

আমার সমস্ত আশার বিপরীতে গিয়ে তিনি উত্তর দিলেন, “এই একটা বিষয়ে আমি মানসিক যন্ত্রণা বোধ করি, এবং এই চিন্তায় আমার ঘুম আসে না। আমি স্বীকার করি যে আমি আমার ধর্মবিরোধী কাজ করেছি”। তারপর তিনি যোগ করলেন , “যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজ আমাদের সত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছে”। সাদ্দাম হুসেইন মানুষ হত্যা করেছেন, গণহত্যা চালিয়েছেন, রাসায়নিক অস্ত্র দিয়ে তারই লোকেদের জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং নির্দোষ মানুষদের দীর্ঘমেয়াদে জেলে পাঠিয়েছেন। তিনি ইরাণের বিরুদ্ধে আট বছর যুদ্ধ চালিয়েছেন, কুয়েত আক্রমণ করেছেন এবং তার তেলভাণ্ডারে আগুন লাগিয়েছেন, এবং নির্বিচারে সেখানকার মানুষ হত্যা করেছেন—তবু তিনি কখনও তার কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেননি। সিংহাসনে থেকে তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন তিনিই ইরাকের ন্যায্য নেতা এবং যাদের তিনি হত্যা করেছেন তাদের মৃত্যুই প্রাপ্য। ঐ অপরাধী তার দেশের মানুষের প্রতি যে অপরাধ করেছে তার জন্য একজন সুন্নী মুসলমানও অনুতাপ প্রকাশ করেনি।

১৯৭৯তে খোমেইনির ইসলামী বিপ্লবের পরে ইরানের মোল্লারা মধ্য প্রাচ্যের অন্যতম ধনী দেশকে ধ্বংস করে ফেলেছিল এবং দেশের মানুষদের অভুক্ত থাকার পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল, তবু তারা জোরের সাথে বলে ঈশ্বর তাদের ধর্মকে রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। সুন্নী মুসলমানরা শিয়া নেতাদের সমালোচনা করে, শিয়ারা সুন্নী নেতাদের সমালোচনা করে এই কারণে নয় যে এই নেতারা কোন অপরাধ করেছে, বরং অপর গোষ্ঠীর প্রতি গোপন ক্ষোভের কারণে।

মুসলিম সংস্কৃতির ভাষায় জয় এবং পরাজয়ের ধারণা পশ্চিমের ধারণা থেকে আলাদা। শিশুকাল থেকে আমাদের শেখানো হয়েছে যদি অন্য কেউ জেতে, আমরা হারি এবং আমরা জিতি যখন অন্যে হারে। আমি স্কুলের পরীক্ষায় সব বিষয়ে পূর্ণ নম্বর পেলেও আমার মা বিশেষ খেয়াল করতেন না বরং প্রতিবেশীর মেয়ে কোন

গ্রেড পেয়েছে সেই বিষয়ে আগ্রহ দেখাতেন। আমরা একটা মহাকাশযান তৈরী করতে পারি না, কিন্তু আমার এখনও মনে আছে, আমরা কত আনন্দে নেচেছিলাম, চিৎকার করেছিলাম যখন আমেরিকার মহাকাশযান চ্যালেঞ্জার যাত্রীসহ ভেঙে পড়েছিল। সুনামীতে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান, তবু কিছু মুসলমান প্রচারক বলেছিল যে এই মহাবিপর্যয় হল অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেওয়ার ঈশ্বরের উপায়। যে অবিশ্বাসীরা ইন্দোনেশিয়ার নাইটক্লাবগুলি পতিতায় ভরে ফেলেছে, এবং সেইসঙ্গে গল্প ছড়িয়েছিল একটা মসজিদ এই বিপর্যয়ে অটুট ছিল। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু কোন ক্ষতিই নয় যতক্ষণ আমরা একটা মসজিদকে অক্ষত রাখতে পারি!

আমার এক মুসলমান বন্ধু একটা মজার গল্প বলেছিল, যা থেকে মুসলমানদের জয়-পরাজয়ের ধারণা বোঝা যায়: ঈশ্বর একদিন চলতে চলতে এক আমেরিকানকে কাঁদতে দেখলেন। ঈশ্বর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে, আমেরিকানটি বলল, 'আমার প্রতিবেশীর একটা গাড়ী আছে, আমার নেই। ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন 'আমি কি করব তুমি চাও?' আমেরিকান বলল, 'আপনি আমাকেও একটা গাড়ী দিন'। ঈশ্বর আবার চলতে চলতে এক ফরাসীকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে। ফরাসীটি বলল, 'আমার প্রতিবেশীর চ্যাম্পস এলিসে বাড়ী আছে, আমার নেই'। ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন 'আমাকে কি করতে হবে?' ফরাসী বলল, 'আপনি আমাকে ঠিক ঐ রকম একটি বাড়ী দিন'। ঈশ্বর আবার চলতে থাকলেন এবং এক আরবকে কাঁদতে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?' আরবটি বলল, 'আমার প্রতিবেশীর একটা উট আছে, আমার নেই'। যখন ঈশ্বর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন, আরব বলল, 'আমার প্রতিবেশীর উটটাকে মেরে ফেলুন!'

“নতুন” আমেরিকাতে বাস
কলিন পাওয়েল এবং
প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেইন ওবামা সম্পর্কে ভাবনা

খ্রীষ্টমাস ২০০৮, আমি আমার স্বাধীনতার বিশতম বার্ষিকী উদযাপন করেছিলাম। আমি আমেরিকায় আসার পরে দু'টো দশক চলে গেছে, কিন্তু প্রায়ই আমার মনে হয় আমি কখনই সিরিয়া ছেড়ে আসিনি, এবং আজও আমার অবচেতনে সেই যন্ত্রণা গভীরভাবে গেঁথে আছে।

আজও আমার সেই দিনটাকে মনে পড়ে, মনে হয় যেন গতকাল।

সেটা ছিল ডিসেম্বর ১৫, ১৯৮৮, রাত্রি, একটা ঝোড়ো বাতাস যেন চারিদিক থেকে দামাস্কাসকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আমেরিকান দূতাবাসে যাওয়ার জন্য রাত্রি ন'টার সময় অগোছালো শহরে আমি আমার বোনের বাড়ী থেকে বের হলাম।

আমার বোনের স্বামী সিরিয় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার, আমার ভাগ্নে তার বাবার গাড়ী নিয়ে দূতাবাস পর্যন্ত যেতে রাজী হল না, গাড়ীর নাম্বার প্লেট সেনাবাহিনীর, তার মনে হল দূতাবাস পর্যন্ত যাওয়া তার বাবার সম্মানের পক্ষে ক্ষতিকর; সে আমাকে দূতাবাস থেকে প্রায় এক মাইল আগে নামিয়ে দিল।

আমি অন্ধকারের মধ্যে ভয় এবং ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে হাঁটতে থাকলাম। আমার কোট ঝোড়ো ঠাণ্ডা হাওয়ায় সামান্যই কাজে আসছিল, কিন্তু সেই মূহুর্তে স্বাধীনতার স্বপ্ন আমার সমস্ত কষ্টের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল।

দূতাবাসের সামনে লম্বা লাইনে দাড়ালাম, আমি বোনের বাড়ী থেকে একটা লেপ এনেছিলাম, সেটি পেতে বসে দিনের আলোর অপেক্ষা করতে লাগলাম: হয়ত সকালে আমেরিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের দেখা পাওয়ার সুযোগ পাব।

সকালে গার্ড দূতাবাসের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল: "শুধুমাত্র প্রথম কুড়িজন ভিতরে আসবে!"

যখন বুঝলাম আমি আঠারো নম্বর, আমি বলে ফেললাম, "ধন্যবাদ ঈশ্বর! এখন আমেরিকা আমার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে!"

দূতাবাসের দরজায় আমার রাত্রিবাস বিফলে যায়নি।

আমার পালা এল, দূতাবাসের অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমার কাগজপত্র দেখে এবং আমার উত্তর শুনে তিনি(মহিলা) আমার পাশপোর্টে ভিসার স্ট্যাম্প মেরে দিলেন।

সেই মূহুর্তে আমার মনে হল সমস্ত পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়। খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে সেইন্ট পিটারের হাতে স্বর্গরাজ্যের চাবি থাকে, কিন্তু আমি যেখান থেকে এসেছি সে দেশের মানুষ বিশ্বাস করে পৃথিবীব্যাপী আমেরিকান দূতাবাসের অফিসারদের হাতেই থাকে সেই চাবি।

আমি যখন দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এলাম বুঝতে পারছিলাম না কোনদিকে যাব, তখন দেখি আমার বোন আমার কি হল দেখতে এসেছে, রাস্তার অপরদিকে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি নেচে উঠে তাকে পাশপোর্টটি দেখালাম, কোনদিকে না তাকিয়ে রাস্তা পার হলাম এবং একটুর জন্য গাড়ীচাপা পড়া থেকে বাঁচলাম। দূতাবাসের সামনে থাকা লোকদের একজন চেঁচিয়ে বলল, "অভিনন্দন! ভাগ্য দুবার আপনার জীবন রক্ষা করল—একবার গাড়ীচাপা পড়া থেকে উদ্ধার করে, আর একবার আপনাকে আমেরিকার ভিসা দিয়ে।

এখানে আমার জীবনের প্রতিটি মূহুর্তের সাথে আমি যেখানে ছিলাম তার তুলনা না করে পারি না। এই তুলনা আমাকে যুগপৎ খুশী এবং বিষাদময়, সাহসী এবং ব্যর্থ, আশাবাদী এবং হতাশ করে যখন বর্তমানের সমস্ত সৌন্দর্য অতীতের কুৎসিৎ রূপের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে।

কিছু মানুষের মত আমি আমেরিকাকে ভালবাসি, এবং তার প্রতি আমার ভালবাসা আমাকে তার জন্য ভাবিত করে। আমি চাই না কোন বিপদ এই দেশের নিরাপত্তা বা সৌন্দর্যকে বিঘ্নিত করুক, যে দেশ আমাকে ভয় থেকে উদ্ধার করেছে এবং ক্ষুধায় খাবার দিয়েছে।

এখানে বসবাসকালে আমি পাঁচটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচার দেখেছি। প্রথম চারটি টেলিভিশনে দেখেছি কোন একাত্মতা অনুভব না করে। সাম্প্রতিক নির্বাচনের আগে পর্যন্ত আমি আমেরিকার নির্বাচনকে একটি বিলাসিতা ভাবতাম যা আমাকে আকর্ষণ করত না। আমি যা পেয়েছি তা আমাকে মানসিক, শারীরিক, বৌদ্ধিকভাবে এবং সর্ববিষয়ে প্রয়োজনের থেকেও বেশী সন্তুষ্ট করতে যথেষ্ট। আমার জীবনের সবকিছুই এতটাই স্বপ্নের মত, মনে হত যে নিজেকে চিমটি কেটে দেখি সত্যিই এটা বাস্তব কি না।

আমার বিশ্বাস ছিল, যে কোন প্রসিডেন্ট—ডেমোক্রেটিক বা রিপাবলিকান—যিনিই ক্ষমতায় থাকুন, আমেরিকার ক্ষমতা তার থেকে অনেক বেশী। আমেরিকা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম, আইনের শাসন, একটি নৈতিক ক্ষমতা—এক বিশাল অস্তিত্ব যার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। আমি বিশ্বাস করতাম যিনিই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হোন, তিনি হবেন মহান, দল নির্বিশেষে, এবং তিনি এই মহান জাতিকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন।

যদিও প্রার্থীদের নীতি আলদা হতে পারে, আমি একটা অদ্ভুত আশ্বস্ততা অনুভব করি যে, তাদের প্রত্যেকেই এদেশের জন্য তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দেবেন, এটা অসম্ভব যে আমেরিকা এমন মানুষ জন্ম দেবে যে এতবড় উঁচু পদে বসে নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ করবে। এই কারণে আমি কোন প্রার্থী জয়ী হওয়ার উপযুক্ত সে বিষয়ে

মাথা ঘামাইনি। আমার কাছে এটা যেন টস করা এবং হেড বা টেইল ব্যাপারে আমি উদাসীন।

আমার কাছে আমেরিকা ছিল—আজও আছে—ভোর পাঁচটায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে সকালের কফির জন্য নির্ভয়ে কফিশপে যাওয়া। কেউ আমাকে দেখে ফেলবে এবং অবৈধ আচরণের দোষ দেবে, এই ভয় থাকবে না।

আমার কাছে আমেরিকা মানে প্রতিবেশীকে "সুপ্রভাত" বলা এবং তার সঙ্গে দু'এক মূহুর্ত কথা বলা, তার সাথে রাত কাটানোর অভিযোগে অভিযুক্ত না হয়ে।

আমার কাছে আমেরিকা মানে আমার মেয়ে বাড়ী ফিরে বলবে সে তার ছেলেবন্ধুর সাথে লাঞ্চ করেছে, পরিবারের সম্মানহানির জন্য তাকে কেউ মারবে না।

আমেরিকা মানে আমি আমার পছন্দমত পোষাক পরতে পারি, খেতে পারি, যেখানে খুশী যেতে পারি, কেউ সে ব্যাপারে মাথা গলাবে না।

আমেরিকা মানে আমার পুরানো জুতোর মধ্য থেকে গোড়ালি উঁকি দেওয়ার আগে নতুন জুতো কিনতে পারি এবং শিশুপুত্রকে একসপ্তাহ দুধ থেকে বঞ্চিত না করে নতুন পোষাক কিনতে পারি।

আমেরিকা মানে কোন সরকারী অফিসে ফোন করে ভদ্র গলায় শোনা: "সুপ্রভাত, আমি জেসিকা, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

আমেরিকা মানে আমি সার্বজনীন শৌচালয়ে যেতে পারি, সেখানে জল, সাবান, কাগজের তোয়ালে সব আছে এবং আমাকে অন্যের ফেলে যাওয়া নোংরার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে না।

আমেরিকা মানে অপরিচিতের কাছ থেকে মৃদু হাসি উপহার পাওয়া শুধুমাত্র দৃষ্টি মিলে যাওয়ার কারণে।

আমেরিকা মানে সুন্দর পার্কে পরিবার নিয়ে দিন কাটানো যেখানে মাছি কামড়াবে না অথবা চারিদিকে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে বসতে হবে না।

আমেরিকা মানে কোন অচেনা লোক দুর্ঘটনাক্রমে হোঁচট খেয়ে আমার উপর পড়ে গেলে সে বলে: "আমি দুঃখিত, ক্ষমা চাইছি!"

আমেরিকা মানে আমি কোন প্রার্থনাস্থলে যেতে পারি এবং ধর্মীয় বাণী শুনতে পারি, যেখানে অন্য কোন ধর্মের প্রতি গালাগালি শুনতে হয় না।

আমেরিকা মানে কেউ আমার দরজায় ঘা দিলে আমি খুলব কি খুলব না ভাবতে পারি কোনরকম জীবনের ভয় না করে।

আমেরিকা মানে আমি কোন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারি, যার সাথে আমার কোন বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে, সে আরবি মিশ্রিত ভাঙা ইংরাজীতে হতে পারে, এবং—খুব সম্ভব—আমি জিতব।

আমেরিকা মানে আমি আরবি মিশ্রিত ইংরাজী বলতে পারি, লোকে শুনে কোনরকম বিদ্রূপ বা ভান না করে বলে, "আপনি বেশ ভালো ইংরাজী বলেন!"

আমেরিকা হল এমন যেখানে আমার ছেলে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর এক সপ্তাহের মধ্যে হিয়ারিং এইড পায়, নয় বছর সিরিয়াতে কালা হয়ে থাকার পরে আবার শুনতে পায়।

আমেরিকা মানে যে রাস্তার ধারে আমরা বাস করি সেখানে আরও ন'টা দেশের মানুষ বাস করে এবং আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে সবাই যখন আমাদের বাড়ীর সামনে মিলিত হই, সবাই তার দেশের জাতীয় খাবার নিয়ে আসে যেন সবাই তার স্বাদ নিতে পারে।

আমেরিকা মানে আমি আমার মত করে বাঁচতে পারি এবং কেউ আমাকে আমার রং, লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক মত বা আমার দেশ দিয়ে বিচার করবে না, বরং আমার মূল্যায়ন করবে আমার কাজ এবং ব্যক্তিত্ব দিয়ে।

আমেরিকা, সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার স্বাধীনতা।

অতীতে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, এবং এই বই পড়ার পরে আরও অনেকেই জিজ্ঞাসা করবে: "তুমি আমেরিকার খারাপ দিকগুলি দেখ না কেন?" হয়ত আমি অন্ধ, কিন্তু আমি আমেরিকার কোন খারাপ দিক দেখতে পাই না। আমার ভাবনা বুঝতে হলে, অবশ্যই, আপনাকে একজন নারী হতে হবে যে সিরিয়া অথবা অন্য কোন মুসলিম দেশে তিরিশ বছর বাস করেছে। এই কারণে আমি কখনও

রাজনীতিতে মাথা গলাইনি, এখনও পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আমার কাছে মনে হয় একটি বৌদ্ধিক বিলাসিতা যার জন্য আমি কোন প্রয়োজন বোধ করি না। যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনপর্ব আসে, আমার বিশ্বাস আগে যা ছিল এখনও তাই: আমেরিকার যে মানুষ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারে সে একজন প্রকৃত আমেরিকান আর একজন প্রকৃত আমেরিকানের থেকে আমেরিকার ভয়ের কিছু থাকতে পারে না। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর ঘটনা আমার চিন্তায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং আমি প্রভাবিত। এ ঘটনা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে, আমেরিকা ইসলামকে কতটুকু বোঝে এবং তাকে ভুল বোঝার সম্ভাব্য ফল কি হতে পারে।

সাম্প্রতিক নির্বাচনকে ঘিরে ঘটনাবলী এই দেশের জন্য আমার আশঙ্কা এবং উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে, যে দেশকে আমি অন্তর থেকে ভালবাসি সেই ভালবাসাও আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ওবামার মুসলিম পশ্চাৎপট। সবাই জানে তার বাবা একজন মুসলমান, তার বাল্যকালের কিছু অংশ কেটেছে মুসলিম দেশে এবং কিছুকাল তিনি মুসলিম স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। আমাকে সেটা ভাবাইনি: প্রেসিডেন্ট ওবামার আশ্বাসবাণী যে তিনি একজন খ্রীষ্টান, এটাই আমার সমস্ত সন্দেহ দূর করতে যথেষ্ট, তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, কোন আমেরিকান যিনি প্রসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারেন তিনি আমার আস্থার যোগ্য আমেরিকান—এবং আমার এ বিশ্বাস আজও অটুট।

আমার মতে, ওবামার অভিশাপ হচ্ছে তার নামের মধ্য অংশ: হুসেইন। কেন? ইসলামবিদরা, যারা ইসলামের সত্য রূপ জানে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের ঐশী উদ্দেশ্য হল একদিন তারা গোটা পৃথিবী দখল করবে, তারা মনে করে ওবামা স্বর্গ-প্রেরিত একটা ইঙ্গিত, তারা যে স্বপ্নের জন্য বাঁচে তা বাস্তবায়িত হতে আর দেরী নেই। তারা অবিরত এমন কিছু খোঁজে যা তাদের মনে হয় ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত, এবং সেই সব জিনিস পড়ে যা হয়ত একজন আমেরিকানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না।

একবার একটা আরবি ওয়েবসাইটে একটা খবর দেখলাম যে আমেরিকান অভিনেত্রী হ্যাল বেরী(Halle Berry) তার কন্যার আরবি নাম রেখেছেন 'নাহলা'(মৌমাছি)। তারপর আমি এই খবরের উপর পাঠকদের মন্তব্যগুলি পড়লাম। বিশ্বাস করুন বা না করুন, বেশ কিছু পাঠক অত্যন্ত উল্লসিত, কারণ তারা মনে করে ঘটনাটি ঈশ্বরের একটি ইঙ্গিত যে ইসলাম আমেরিকাতে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, কারণ নাহলা শব্দটি কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামবিদরা ওবামা মুসলিম কি না সে বিষয়ে খুব বেশী আগ্রহী নয়: আমেরিকান প্রেসিডেন্ট একটি মুসলিম নাম ব্যবহার করেন যেমন হুসেইন, এটাই যথেষ্ট তাদের মনে করাতে যে ইসলাম আমেরিকাতে অগ্রসর হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই হোয়াইট হাউসে অনুপ্রবেশ করেছে।

প্রতিদিন আমার ইনবক্সে বন্যার মত ই-মেইল আসত যার বেশীর ভাগই ওবামা সম্পর্কিত গুজবে ভরা। যার মধ্যে ডেমোক্রেটিক প্রার্থীর মুসলিম প্রেক্ষিত বিষয়ে কিছু আমেরিকানের ভয় প্রকাশ পেত। আমি সেগুলি পড়তাম এবং আমি গোপন করব না যে তারা আমাকে সতর্ক থাকতে বলত, যদিও তারা আমার বিশ্বাসকে বদলাতে পারেনি। আমার আমেরিকা সম্বন্ধে আদৌ কোন ভয় ছিল না এবং প্রচার চলাকালে ওবামার জয় বিষয়েও কোন সন্দেহ ছিল না। তার বিষয়ে আমি নির্বাচন চলার সময় সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ছিলাম এবং এখনও আছি। আমার আমেরিকার জন্য ভয় ছিল যে ওবামার জয় ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে নতুন জীবন দেবে কারণ তার নামের মধ্য অংশ তেমনটাই ভাবাবে যারা ইসলামী দেশগুলি থেকে নজর রাখছে। তবুও আমি সেইদিন পর্যন্ত নিশ্চিত ছিলাম যেদিন এন.বি.সি.(NBC)-র 'মিট দি প্রেস' (Meet the press) অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট কলিন পাওয়েলের সাক্ষাৎকার দেখলাম।

আমার কাছে সেই সাক্ষাৎকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবিশেষ। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম মি. পাওয়েলের একটি মন্তব্যে যার সাথে বর্তমান বিষয়ের কোন যোগ নেই। ম্যাককেইন (McCain) নির্বাচনী প্রচারে অভিযোগ তুলছেন ওবামা একজন মুসলিম, এই বক্তব্যে মি. পাওয়েল অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন,

“যদি তাই হয় তাতে কি?” সেই মূহুর্তে আমার মনে হল সমস্ত ঘরটা যেন ঘুরছে, চেয়ারটা চেপে ধরলাম পাছে পড়ে যাই। এই মন্তব্য যেন আমার ক্ষতে লবণ ছিটিয়ে দিল এবং মনে প্রশ্ন এল: যদি কলিন পাওয়েল না জানে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মুসলমান হওয়ার অর্থ কি তাহলে কে জানে? যে মানুষ একসময় আমেরিকার সেক্রেটারী অব ষ্টেট পদে ছিলেন তিনি বোঝেন না আমেরিকা একজন মুসলমানকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচন করলে কত বড় ভুল হবে, যদিও এই দেশটাই ইসলামি সন্ত্রাসবাদের এত বড় শিকার এবং তার জন্য প্রচুর মূল্য দিয়েছে। সেই মূহুর্তের আগে পর্যন্ত আমি ভাবতাম মি. পাওয়েল আমেরিকার রাজনীতিতে বিশাল মহীরূহ। আমার কাছে তিনি ছিলেন আমেরিকান ঈগল। কিন্তু সেই মূহুর্তে, দুঃখের সাথে দেখলাম ঈগল তার সুউচ্চ পাহাড়চূড়া থেকে পড়ে গেল এবং গড়াতে গড়াতে একটা ছোট্ট পাখির মত আমার সামনে পড়ল। আর সেই সাথে আমার অনেক বিশ্বাসও গড়িয়ে পড়ে গেল।

আমি জানি যে মি. পাওয়েল, আমেরিকার নৈতিক আদর্শে বড় হয়েছেন এবং সেটা অবলম্বন করেই বাঁচেন, মানুষকে ধর্ম দিয়ে বিচার করেন না এবং সেটা তার অধিকার। কিন্তু তার এই অধিকার নেই যে তিনি অজ্ঞ থাকবেন বা উপেক্ষা করবেন ইসলাম শুধুমাত্র একটা ধর্ম নয়: এটা একটা রাজনৈতিক মতবাদ যা নিজেকে অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়, এবং আমাদেরকে আণুবীক্ষণিক চোখ দিয়ে কোন মুসলমানকে বিচার করতে হবে যিনি এমন একটি সংবেদনশীল ও চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে উঠতে যাচ্ছেন।

আমি চাই না কেউ মনে করুক, আমি যে কথা বলছি তা মুসলিম-বিরোধী মানসিকতা থেকে বলছি। অন্য যে কোনও ধর্মীয় গোষ্টীর মত মুসলমানরাও ভাল বা খারাপ হতে পারে, তাদের মধ্যে যারা সবথেকে ভাল, তারা তাদের ধর্মের শিক্ষানুযায়ী চলে না, হয় তারা তার সাথে পরিচিত নয় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে পেরিয়ে গেছে। কিন্তু একজন মুসলমান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার অর্থ কি তা বুঝতে হলে, ইসলামের ইতিহাসকে গভীরভাবে জানতে হবে—আরবের ইতিহাস, যা আমার

ইতিহাস—যা একজন মুসলমান নেতার ইতিহাস এবং তার কার্যাবলীর উপর নজর দেওয়া প্রয়োজন।

যে প্রথম এবং স্বাভাবিক মুসলিম নেতাকে আমরা দেখেছি, তিনি মহম্মদ, ইসলামের নবী। মি. পাওয়েল যদি মহম্মদের জীবনী পড়তেন যেমনভাবে আরবি সাহিত্যে বর্ণিত আছে এবং আমি যেমনভাবে স্কুলে পড়েছি, তিনি মৃতবৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন আমাদের ধর্মীয় পাঠ্যবইতে গর্বের সাথে পড়েছিলাম কিভাবে মহম্মদ বনি কুরাইজা গোষ্ঠীর আটশ' ইহুদীর শিরচ্ছেদ করেছিলেন একরাত্রে, তারপর তাদের স্ত্রী এবং শিশুদের বন্দী করেন এবং সেইরাত্রেই ইহুদী মহিলা সাফিয়ার সাথে কাটান যার স্বামী, পিতা এবং ভাইকে তিনি সবেমাত্র খুন করেছেন। মহম্মদের যেসব অপরাধের কথা আরবি সাহিত্যে লেখা আছে তার তুলনায় এটা সমুদ্রে একবিন্দু জলের মত। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, মি. পাওয়েল বোধ হয় কখনও কোনও ভয়ঙ্কর শত্রুর মুখোমুখি হননি বা তার নিরাপত্তা বিপদের মুখে পড়েনি। একবার আমেরিকানরা যদি বোঝে যে কোরআন আদেশ করে মহম্মদ হলেন আদর্শ যাকে মুসলমান পুরুষরা অনুকরণ করতে বাধ্য, তবেই তারা অনুভব করবে যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে একজন মুসলমান একটা অতি ভয়ানক ব্যাপার।

আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে পরিমান খরচ করেছে তার একটা সামান্য অংশ যদি আরবি সাহিত্য থেকে ইসলামি ঔদ্ধত্য এবং ইতিহাসের সার্বিক অনুবাদ করতে ব্যয় করত, লক্ষ লক্ষ ডলার বাঁচাতে পারত—অজস্র রক্তপাত এবং সময় অপচয়ের কথা বাদই দিলাম। আমেরিকা কখনই এই যুদ্ধ জিততে পারবে না যতক্ষণ না আমেরিকানরা কোন বিকৃতি বা মিথ্যা ছাড়া আরবি সাহিত্য থেকে ইসলাম বিষয়ে পড়বে, অক্ষরে অক্ষরে। এই বিষয়ে পড়াশোনার ফলে তারা তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং বুঝবে তারা কেমন শত্রুর মুখোমুখি। সেই অনুবাদের পাঠকদের একজন যদি কলিন পাওয়েল হন এবং দেখেন কি পরিমান ঘৃণা এবং হিংস্রতা সেখানে আছে, তিনি হয়ত নিজের ঠোঁট কামড়াবেন এবং নিজেকেই বলবেন:

“আমি আমার শত্রুর প্রকৃত চেহারাটা জানতাম না এবং এটা আমার সবথেকে বড় ব্যর্থতা।

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে আমেরিকার একজন জেনারেলের, যার নাম আমার মনে নেই, একটি সাংবাদিক সম্মেলন দেখেছিলাম। সভা চলাকালে তিনি বললেন যে তিনি দুবার কোরআন পড়েছেন, একজন সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “পড়ার পরে আপনি কি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন?” উত্তর দেওয়ার আগে তিনি এক মূহুর্ত মাথা নিচু করে রইলেন, তারপর বললেন, “আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে”। এইখানে আমি জিজ্ঞাসা করি, “মি. পাওয়েল আপনি কেন উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের এবং যে দেশকে আপনি ভালবাসেন তাকে রক্ষা করছেন না?”

প্রসিডেন্ট ওবামা ঘোষণা করেছেন যে তিনি মুসলিম নন এবং আমি তাকে বিশ্বাস করি; কিন্তু যদি তিনি মুসলিম হতেন তাহলে বিষয়টি অন্যরকম হত। আমি এবং অন্য সমস্ত দেশভক্ত আমেরিকানকে অন্যভাবে ভাবতে হত। ইসলামের শিক্ষায় ‘তাকিয়া’-র (আক্ষরিক অর্থে সাবধানতা, বিচক্ষণতা) প্রথা আছে যা মুসলমানদের অনুমতি দেয় সত্য অনুভূতি এবং লালিত বিশ্বাসকে গোপন করতে যখন তারা দেখে তাদের চারপাশে অমুসলিমরা তাদের থেকে বেশী শক্তিশালী, অথচ একই সময়ে তাদের মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গোপনে কাজ করতে থাকে, যাতে উপযুক্ত সময়ে তারা আক্রমণ করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, সমস্ত মুসলিম এই নীতিতে বিশ্বাস করে না বা সেই অনুযায়ী কাজ করে না, কিন্তু যন্ত্রনাক্ত সত্য এই যে পশ্চিমকে নিজেকেই রক্ষা করতে হবে এবং প্রত্যেক মুসলমানকে আণুবীক্ষণিক চোখে বিচার করতে হবে, বিশেষত যারা পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী দেশের নেতৃত্বের পদপ্রার্থী।

কোন মানুষই একই সাথে প্রকৃত মুসলমান এবং প্রকৃত আমেরিকান হতে পারে না। ইসলাম একই সাথে ধর্ম এবং রাষ্ট্র, এবং প্রকৃত মুসলমান হতে আপনাকে অবশ্যই ইসলামে বিশ্বাস রাখতে হবে ধর্ম এবং রাষ্ট্র হিসাবে। একজন প্রকৃত মুসলমান সংবিধানকে স্বীকার করে না এবং সেই সংবিধানের অধীনে তার বাস

করার ইচ্ছা সংবিধানের পরিবর্তে ইসলামি শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা অনিবার্য পদক্ষেপ মাত্র।

কোরআন বলে: "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের বন্ধু হবে সে তাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্যায়কারীদের পথপ্রদর্শন করেন না(৫:৫১)। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী একজন মুসলমান কি ইহুদী খ্রীষ্টানদের উপর আস্থা রাখতে পারবে যদি সে বিশ্বাস করে তারা তার বন্ধু বা রক্ষক হওয়ার উপযুক্ত নয়? এই প্রশ্ন আমি কলিন পাওয়েলের কাছে রাখছি এবং যখন আমি তার কাছ থেকে উত্তর পাব তখন আমি আশ্বস্ত বোধ করব যে আমেরিকা নিরাপদ হাতেই আছে।

নভেম্বর ৪, ২০০৮ কঠিন লড়াই-এর পর আমেরিকার মানুষ মি. বারাক ওবামাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করল। সেই দিনই আমার কন্যা ফারাহ তীব্র প্রসব যন্ত্রণায় কঠিন লড়াই করছিল, আমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেই আমি ছুটে হাসপাতালে গেলাম। প্রসূতি ঘরে আমি সারাদিন বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলাম, এবং মনে হচ্ছিল যেন সেই রাত্রি অনেক দীর্ঘ, আমি আমার মেয়ের পাশে তার হাত ধরে বসে রইলাম যাতে কষ্টের মধ্যেও একটু আশ্বস্ত হয়।

পরদিন সকালে, নভেম্বর ৫, আমার প্রথম নাতনি জ্যাজলিন জন্মাল আর তার কান্নার স্বর মিশে যাচ্ছিল আমার মেয়ের ঘরের টেলিভিশনে মি. ওবামার স্বরের সাথে। সেই মূহুর্তের উত্তেজনায় সংবাদ পরিবেশনকারীর মন্তব্য "এ ঘটনা শুধু আমেরিকাতেই ঘটা সম্ভব" আমার মনে প্রেসিডেন্টের সমস্ত বক্তৃতা জুড়ে রয়ে গেল। এটাই সত্য। একমাত্র আমেরিকাতেই সংখ্যলঘু গোষ্ঠীর একজন মানুষ সংখ্যাগুরুর দ্বারা নির্বাচিত হতে পারে। এবং একমাত্র আমেরিকাতেই মিশ্র প্রজাতির মেয়ে হয়ে জন্মিয়ে নতুন নাগরিকত্ব পেতে পারে যা তার উৎস থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। আমেরিকা স্বপ্নের দেশ—তার থেকেও বেশী, এটাই একমাত্র দেশ যেখানে সকল স্বপ্নই সত্য হওয়া সম্ভব।

আমি যেন এখনই শুনতে পাই চল্লিশ বছর পরে আমেরিকান টেলিভিশনের ঘোষক সারা পৃথিবীকে জানাচ্ছে: "ওয়াফা সুলতানের নাতনি জ্যাজলিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন"।

কে জানে? কেউ স্বপ্ন দেখতেই পারে, পারে না?

এবং হয়ত সেই বছরেই সিরিয়ার মিনারচূড়া থেকে মুয়াজ্জিন ঘোষণা করবে, "ওয়াফা সুলতানের চেষ্টা সাফল্যের মুকুট পরেছে, এবং এক নতুন ঈশ্বর জন্ম নিয়েছে: "যে ঈশ্বর ভালবাসে"।

ততদিন পর্যন্ত, আমি আশা করব, প্রার্থনা করব, যুদ্ধ করব, আর হ্যাঁ, একটুখানি স্বপ্নও দেখব।

সমাপ্ত
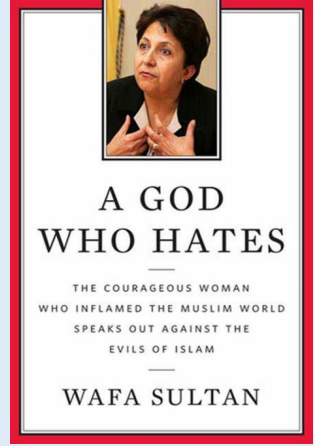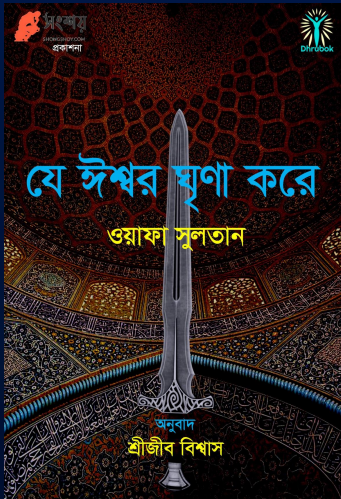
ওয়াফা সুলতান তাঁর নিরীক্ষাধর্মী চোখ দিয়ে তাঁর মাতৃভূমি সিরিয়াকে যেমন দেখেছেন তারই অবিকল প্রতিফলন এই বই। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই একথা বলা যায় সকল ইসলামি দেশের চিত্রও সিরিয়ারই অনুরূপ। অর্থাৎ এই হানাহানির প্রকৃত উৎস ইসলাম অনুসারী মানুষ নয়, ইসলাম নিজেই সেই উৎস। ওয়াফা সুলতান বিভিন্ন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে সেই ঘটনার কারণ হিসেবে শনাক্ত করেছেন ইসলামকে।

একটি সংশয় ইবুক

www.shongshoy.com

সংগ্রহ করুন আজই